অবনীন্দ্র রচনাবলী

৪

অবনীন্দ্র রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

প্রকাশ ভবন

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট

pathagar.net

pathagar.net

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞপ্তি

অবনীন্দ্র রচনাবলীর এই চতুর্থ খণ্ডে সংগৃহীত হল বড়োদের জন্য লেখা অবনীন্দ্রনাথের গল্পগুলি। অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডেও সংযোজিত হল সাময়িক পত্রে ছড়িয়ে থাকা তাঁর কয়েকটি অগ্রন্থিত লেখা।

সংকলনের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী মিনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্খ ঘোষ। ছবি ও ব্লকের জন্য আমরা রবীন্দ্রভারতী সমিতি, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট এবং শ্রীশুভ মুখোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ, দুষ্প্রাপ্য একটি বই দেখতে দিয়ে বাধিত করেছেন শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন।

এ-খণ্ডেরও প্রকাশ অনেক বিলম্বিত হল। গ্রাহক এবং উৎসুক পাঠকদের কাছে এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

সূচীপত্র

Book No 386
Date 14.6.2005

চিত্রসূচী

pathagar.net

পথে বিপথে

অ. ৪-১

pathagar.net

মোহিনী

ফেরি-স্টীমারে অবিনের সঙ্গে অনেক বছরের পর দেখা হতেই সে আমাকে একেবারে একখানা ছবি দেখিয়ে বললে, 'দেখতে পাচ্ছ?' তোমার-আমার মতো হলে প্রথম প্রশ্ন হত, 'তুমি কে হে?' বা, 'তোমাকে তো চিনলেম না।' কিন্তু অবিন, সে কোনোদিনই আমাদের মতো সাধারণ-একটা-কিছু ছিল না; সুতরাং সে আমাকে না চিনলেও, সে যে অবিন, এটার প্রমাণ পেতে আমার একটুও দেরি হল না। ছবিটার সবটা দেখলেম অন্ধকার; কেবল নীচে একটা পিতলের ফলকে বড়ো বড়ো করে লেখা ছিল 'মোহিনী'। আমি সেইটে দেখিয়ে বললেম, 'মোহিনী বুঝি?'

অবিন খানিকটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'পেলে না। তবে শোনো।' বলেই আমাকে টেনে মাঝের বেঞ্চে বসালে। তখন শীতের সকাল; কুয়াশা ঠেলে জাহাজখানা খুব আস্তে আস্তে জল কেটে চলেছে। অবিন শুরু করলে—

'কলকাতায় আমাদের বাসাবাড়িখানা অনেকদিনের। এখন সেটা আমাদের বসতবাড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালে কর্তারা সে-বাসাটা কেবল গঙ্গাস্নান আর কালীঘাট করবার জন্যেই বানিয়েছিলেন। খুবই পুরোনো সেই বাসাবাড়ির ঘরগুলো; ঝাড়-লণ্ঠন, কৌচ-কেদারা, ওয়াটার-পেন্টিং, অয়েল-পেন্টিং, বড়ো বড়ো আয়না এবং সোনার ঝালর-দেওয়া মখমলের ভারী ভারী পর্দা দিয়ে যতদূর সম্ভব জাঁকালো এবং মানুষের প্রতিদিন বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে কর্তারা সাজিয়ে দিয়েছিলেন। আমাকে সেকালের সেই ধুলোয় ভরা, পুরোনো মদের ছোপ-ধরা, সাবেকি আতরের

গন্ধ-মাখানো, এই-সব ফার্নিচার তখন কতক বিক্রি করে, কতক ঝেড়ে ঝুড়ে মেরামত করে, আর কতক-বা একেবারে ফেলে দিয়ে বাড়িখানাকে একালের বসবাসের মতো করে নিতে হচ্ছিল। আমি এখনো যেমন, তখনো অবিবাহিত। সেই সময় একদিন এই ছবিটা আমার হাতে পড়ল। খানিকটা কালো-অন্ধকারের রঙ লেপা : কেবলমাত্র দুটি সুন্দর চোখ, তাও অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে চেয়ে থাকলে তবে দেখা যেত।'

জাহাজ এসে কাশীপুরের জেটিতে লাগল। একদল থার্ড ক্লাসযাত্রী মাড়োয়ারী নেমে গেল, এবং তার চেয়ে আরো বড়ো একদল কলের কুলি, মিলের চীনে মিস্ত্রি উঠে এল। অবিন ডেকের এ ধার থেকে ও ধারে একবার পায়চারি করে নিয়ে ফিরে এসে বললে—

'এই ছবিটা রাবিস বলে নিশ্চয়ই বউবাজারে পুরোনো জিনিসের সঙ্গে চালান যেত, কিন্তু যে ঘরের দেয়ালে এটা খাটানো ছিল, সেই ঘরটার ইতিহাসটা বেশ একটু রকমওয়ারি রকমের ছিল বলেই সে ঘরটায় আমি কোনো অদল-বদল ঘটতে দিই নি। আমাদের যিনি ছোটোকর্তা তাঁরই সেটা বৈঠকখানা। এই ছোটোকর্তাই আমাদের সেকালের শেষ-ঐশ্বর্যের বাতিগুলো দিনের বেলায় ঝাড়ে-লণ্ঠনে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছেন ; এবং নিজের হাতের হীরের আংটির বড়ো বড়ো আঁচড়ে বিলিতি আয়নাগুলোকে, সেই-সব দিনকে রাত, রাতকে দিন করবার ইতিহাসের সন-তারিখ এবং নামের তালিকায় ভরে দিয়ে গেছেন। এই কর্তার বাবুগিরির কীর্তিকলাপের গল্প ছেলেবেলায় আরব্য-উপন্যাসের মতোই আমার কাছে লাগত ; এবং বড়ো হয়ে যখন আমি এই ঘরের চাবি খুললেম, তখন গোলাপি আতর মাখানো পুরোনো কিংখাবের গন্ধ-ভরা একটা অন্ধকারের মধ্যে এই ছবির দুটি কালো চোখ আমার দিকে এমনি একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে রইল যে, সে ঘরটায় কোনো অদল-বদল করতে আমার সাহস হল না। কিন্তু, সে ঘরটাকে তালা-বন্ধ করে

ফেলে রাখতেও আমার ইচ্ছে ছিল না। বাড়ির মধ্যে সেই ঘরটা সব চেয়ে আরামের, একেবারে ফুল-বাগানের ধারেই। দক্ষিণের হাওয়া এবং পুবের আলোর দিকে সম্পূর্ণ খোলা ঘরখানি! আমি সেইখানেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খাস-মজলিস—সেকালের মতো নয় একালের ক্লাব-রুমের ধরনে—গড়ে তুললেম। আমরা সেই সাবেক-কালের নাচঘরটায় বসে চা-চুরুটের সঙ্গে পলিটিক্স, সোসিওলজি, থিওলজি এবং জার্মান-ওয়ারের চর্চায় ঘোরতর তর্কযুদ্ধে যখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ এক-একদিন এই ছবিখানার দিকে আমার চোখ পড়লেই, সেকালের বিলাসিতার সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে বিলাতি কেতায় আমাদের এই একালের মজলিস এত কুশ্রী বোধ হত, দুই কালের ব্যবধানটা এমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত যে, আমাদের তর্ক আর অধিক দূর অগ্রসর হত না। আমাদের মনে হত, এ ঘরের স্বামী যিনি, তাঁর অবর্তমানে অনাহূত আমরা একদল এখানে অনধিকার প্রবেশ করে গোলমাল বাধিয়েছি; এখনি যেন বাবুর খানসামা এসে আমাদের এখান থেকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দেবে। মনের এই সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ও-ঘরখানার মধ্যে আড্ডা জমিয়ে তোলা অসম্ভব দেখে আমার বন্ধুরা বলতে লাগল, 'ওহে অবিন, তোমার ভাই, ওই মোহিনীকে এখান থেকে না নড়ালে চলছে না; ওর ওই ভূতুড়ে-রকমের চাহনিটায় আমাদের এখানে স্থির হয়ে থাকতে দেবে না দেখছি।' কিন্তু, বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষে হল না; মোহিনী যেখানকার সেইখানেই রইলেন; বন্ধুরা একে একে সরে পড়তে থাকলেন। এই সময় আমার মনে হত, একালটা যেন একটা খোলসের মতো আস্তে আস্তে আমার চারি দিক থেকে খসে যাচ্ছে, আর আমার নিজ মূর্তিটা পুরোনো খাপ থেকে ছোরার মতো ক্রমে বেরিয়ে আসছে। আমার মধ্যে যে-সেকালটা ছিল সে যেন দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠছে; বুঝছি, আমার রক্তের সঙ্গে সেকালের বিলাসিতার গোলাপি আতর এসে মিশছে, আমার দুই চোখের কোণে উদ্দাম বাসনার অগ্নিশিখা কাজলের রেখা টেনে দিচ্ছে! এই

pathagar.net

সময় আমি এক-একদিন এই ছবিখানার দিকে চেয়ে চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছি। ওই ছবির অন্ধকার ঠেলে ওপারে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে, ওই কালোর মাঝখানে যে সুন্দর চোখ তারই আলোকশিখায় নিজেকে পতঙ্গের মতো পুড়িয়ে মারবার জন্যে, আমার দেহ মন আবেগে থর থর করে কাঁপত! আমার মনের ওই তিমিরাভিসার বন্ধুরা পাগলামির প্রথম লক্ষণ বলে ধার্য করে নিয়ে আমাকে সাবধান করলেন, উপহাস করলেন, নানাপ্রকারে উত্ত্যক্ত করে ভয় দেখিয়ে শেষে আমার ভরসা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গমন করলেন—যেখানে চায়ের এবং চুরুটের আড্ডা ভালো জমতে পারে।

'আমি একলা ঘরে; আর আমার মনের শিয়রে অন্ধকারের পর্দার ওপারে—মোহিনী! যবনিকা তখনো সরে নি, চাঁদ তখনো ওঠে নি। এ সেই-সব দিনের কথা, হৃদয়তন্ত্রীতে যখন মিনতির সুর অন্ধকারে লুটিয়ে পড়ে বিনয় করছে, 'এসো এসো, দেখা দাও।' একখানা ছবি, তাও আবার প্রায় ষোলো-আনাই ঝাপসা, সে যে এমন করে মনকে টানতে পারে এটা আমার নিজেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল, বন্ধুদের কথা তো দূরে থাক্। বললে বিশ্বাস করবে না, তখন বসন্তকালে ফুলের গন্ধ যদি আসত আমার মনে হত, ওই ছবিখানার মধ্যে যে আছে তারই যেন মাথা-ঘসার সুবাস পাচ্ছি। হাফেজ যে সজীব ছবিটি দেখে দেওয়ানা হয়েছিলেন, তার চেয়ে পাটের অন্দরে লুকিয়ে ছিল যে-মোহিনী সে যে কম জীবন্ত, কম সুন্দরী, তা তো আমার মনে হত না। নীল ঘেরাটোপ-দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামা পাখি! তার সুর আমি শুনতে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়। কেবল চোখে দেখা, আর দুই বাহুর মধ্যে, বুকের মধ্যে এসে ধরা দেওয়া বাকি।'

pathagar.net

এতটা বলে অবিন হঠাৎ চুপ করলে। তখন আধখানা নদীর

উপর থেকে কুয়াশা সরে গিয়ে জলের গায়ে সকালের আকাশ থেকে বেলফুলের মতো সাদা আলো এসে পড়েছে, আর আধখানা নদীর বুকে ভোরের অন্ধকার টলটল করছে, এরই মাঝে তুই ডিঙায় তুই জেলে কালোর আলোর বুকে জাল ফেলে চুপ করে বসে রয়েছে দেখছি। আমাদের জাহাজ থেকে একটা ঢেউ গড়িয়ে গিয়ে ডিঙা তুখানাকে খুব একটা দোলা দিয়ে চলে গেল। অবিন শুরু করলে—

'শুনেছিলাম তান্ত্রিক সাধকেরা নাকি মন্ত্রবলে জড়ে জীবন দিতে, অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলতে পারেন। আমি আমার মোহিনীকে মন্ত্র-বলে কাছে, একেবারে আমার চোখের সম্মুখে, টেনে আনবার জন্য এমন এক সাধকের সন্ধান করছি, সেই সময় আমার এক আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা তার সঙ্গে কথায় কথায় মোহিনীর ছবিটা যে কেমন করে আমাকে পেয়ে বসেছে সেই ইতিহাস উঠল। বন্ধু আগা-গোড়া ব্যাপারটা আমার মুখে শুনে বললেন, 'তোমার দশা সেই গ্রীসদেশের ভাস্করটার সঙ্গে মিলছে দেখছি!' আমি বললেম, 'তার সামনে তো তবু তার মোহিনী প্রাণটুকু ছাড়া আর-সমস্তটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ; কিন্তু আমার মোহিনী যে অবগুণ্ঠনের আড়ালেই রহে গেছে হে! এর উপায় কিছু বাৎলাতে পারো?' বন্ধু আমার উপায় বাৎলে, বাড়ি গিয়ে এক শিশি আরক আমাকে দিয়ে পাঠালেন। সেকালটা যদিও আমাকে বারো-আনা গ্রাস করেছিল, তবু মনের এক কোণে একালের বিজ্ঞানটার উপরে একটু যে শ্রদ্ধা তা তখনো দূর হয় নি। আমি বন্ধুবরের কথামত ঘড়ি ধরে, হিসাব করে সেই আরকটা সমস্ত মোহিনীর ছবিখানায় ঢেলে দিলেম। সে আরকটার এমন তীব্র গন্ধ যে আমায় যেন মাতালের মতো বিহ্বল করে তুললে। তার পর কখন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছি, তা মনে নেই। একটুকু মাত্র জানি যে, আরক ঢালবার পরে মোহিনীর ছবিখানা ধোঁয়ায় ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে, আর আমি ভাবছি, এইবার মেঘ কাটল।

'এক মাস পরে কঠিন রোগশয্যা থেকে শেষে নিষ্কৃতি পেয়ে আর একবার ছবিখানার দিকে চেয়ে দেখলেম, সেটার উপর থেকে সেই

চাহনিটা সরে গেছে ; কেবল তার নামটা আঁটা রয়েছে, সোনালী ফলকে, বড়ো বড়ো অক্ষরে !'

তখন শিবতলার ঘাটে জাহাজ লেগেছে, আমি তাড়াতাড়ি অবিনকে নমস্কার করে নেমে চলেছি, এমন সময় সে সজোরে আমার হাতে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল, 'ওহে আর্টিস্ট, মোছে নি হে ভয় নেই। ছবিখানা পটের গভীর থেকে গভীরতর অংশে গিয়েই আমার অন্তর থেকে অন্তরতম স্থানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'

pathagar.net

অস্থি

হঠাৎ সে-কদিন জাহাজের ডেকে, কেবিনে, পন্‌টুনে এবং টিকিট-ঘরে বাদল-পোকার ঝাঁকের মতো কেন এত সি. আই. ডি'র আবির্ভাব হল এবং কেনই বা দেখতে দেখতে একদিন তারা গা-ঢাকা দিয়ে এ তল্লাট ছেড়ে গেল, তা বলা শক্ত। কিন্তু. তারা অদৃশ্য হবার অনেকদিন পর পর্যন্ত জলে স্থলে আকাশে, জাহাজের ডেকের তক্তাগুলোর ফাটলে ফাটলে, বসবার বেঞ্চগুলোর তলায় তলায়, এমন-কি, স্টিমারের চিমনীর কালো ধোঁয়ার আড়ালে পর্যন্ত কতকগুলো যমদূতের মতো আল্‌ফা-বেটার উপসর্গের ছড়াছড়ি দেখছিলাম, সেটা আমি বেশ বলতে পারি। বড়োবাজার থেকে সাতটা-পঞ্চাশের স্টিমারের ফার্স্ট ক্লাসের সব আগের ত্বটো বেঞ্চির কোণে নষ্টামি, ভাঁড়ামি, গাঁজাখুরি গল্প, যাত্রা, গান, কবীর এবং তুলসীদাসের পদাবলী দিয়ে আমরা দিব্যি একটি কুঁড়েমির নীড় বেঁধে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা আরামে কাটাচ্ছিলেম; উপসর্গের উৎপাতে যখন আমাদের সে নীড় ভাঙো-ভাঙো—গানও জমছে না, গল্পও প্রায় বন্ধ—ঠিক সেই সময় একটা লোক, তার চক্‌চকে কালো ইরানি টুপি, টুপির চেয়ে কালো ঝোলা দাড়ি, মোচড়ানো গোঁপ, চামড়ার পুস্তিন আর সোনা-বাঁধা গেঁটে বাঁশের মোটা লাঠিটা নিয়ে হাজির হল এবং ঠিক তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্টিমার-কোম্পানি আমাদের আগের জাহাজখানা বদলে, আকাশের দিকে নাক-তোলা, ঘুপ্‌সি এবং অতিরিক্ত-রকম কম-চওড়া ও অধিক-লম্বা স্টিমার বড়োবাজারের ঘাটে এনে হাজির করলে। তখন আমি সে লোকটাকে শেমুষি বলে স্থির করে নিতে এতটুকু দেরি করলেম না, যদিও অবিন তাকে গিরগিটির চেয়ে উচ্চপদ দিতে মোটেই রাজি হয় নি।

pathagar.net

এই জাহাজখানায় চড়ে আনাগোনা করছি বটে কিন্তু এখানার সবই আমাদের অপরিচিত খট্‌মটে ঠেকছে। এটার বয়লারগুলো কেল্লার বুরুজের মতো লোহার চাদরে ঢাকা ; এটার খালাসি থেকে সারেঙ-সুগনী সবাই যেন গোরাদের চুরুটের এবং মদের একটা উৎকট গন্ধ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের সুবিধে অসুবিধের দিকে তাদের দৃষ্টিই নেই। আর মকরের শুঁড়ের মতো আগা-তোলা সেই ফার্স্ট ক্লাসের ঘুপ্‌সি ডেক—সেখানে বসে গঙ্গাও দেখা যায় না আকাশের নীলও চোখে পড়ে না, মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা হাঙরের পেটের ভিতর বসে চলেছি—তার উপর সেখানে অবিনের ওই পুস্তিন-পরা মানুষটি! আমরা কটি ঝোড়ো-কাকের মতো নিজের নিজের ডানায় মুখ লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছি, এমন সময় কেল্লার একটা খুব বড়ো ইংরেজ, জার্নেল কি কার্নেল হবে, ঝাপ্পা-ঝোপ্পা ইউনিফারমের উপরে পালক-দেওয়া টুপি এবং থোপ্‌না-বাঁধা তলোয়ার ঝুলিয়ে জাহাজে উঠেই সেই লোকটাকে দেখে বললে, 'হ্যালো, তুমি যে এখানে?'

লোকটা অতি বিশুদ্ধ ইংরেজিতে উত্তর করলে, 'আমি এখানে, কেননা আমার যাবার আর কোথাও বাকি নেই। এই জাহাজখানা আমি পোর্ট কমিশনারদের বেচে ফেলেছি কিন্তু এর মায়াটা এখনো কাটাতে পারি নি, তাই এটায় চড়ে দুই-সন্ধ্যা বেড়াই। এখানা এক বছর গার্ডেনরীচের ওই দিকে আমার বাড়ির কাছ দিয়েই ডায়মণ্ডহারবারে যাওয়া আসা করছিল, এ দিকের একখানা জাহাজ বে-কল হওয়ায় এরা এটাকে এখানে এনেছে। জাহাজের সঙ্গে আমিও দক্ষিণ থেকে উত্তরে, ব্রিজের ও পার থেকে এ পারে এসে পড়েছি ; তোমার সঙ্গে দেখা হল, সুখী হলেম।'

তখন কাশীপুরের গন্‌ফাউণ্ডারির ঘাটে এসে জাহাজ ভিড়েছে, সাহেব সেই লোকটাকে টাইম কী জিজ্ঞাসা করলে। সে জেব থেকে একটা প্রকাণ্ড ম্যাকেব-ওয়াচ বার করে বললে, 'আটটা পঞ্চাশ।' ঘড়িটা আগাগোড়া হীরেয় মোড়া এবং তার চেনটা

pathagar.net

সমস্তটা পান্না আর চুনি—গাঁথা। সকালের আলো সে ত্নটোর উপরে পড়ে বিদ্যুতের মতো ঝক্ করে উঠল! সাহেব গুডমর্নিং বলে কাশীপুরে নেমে গেল। সেই লোকটা অন্যমনস্ক ভাবে সেই ঘড়ি আর চেন দুই আঙুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে আপনার মনে বিড়-বিড় করে কী বকতে লাগল।

কারো কাছে কিছু নতুন দেখলে অবিন সেটাকে অন্তত ঘণ্টা-খানেকের জন্য কেড়ে না নিয়ে থাকতে পারে না জানতেম; কিন্তু সে আজ যে এমনটা করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। সাহেব নেমে যেতেই অবিন হঠাৎ সেই লোকটার হাত থেকে ঘড়ি মায়-চেন ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে দিয়ে গট হয়ে বসল; আমার মনে হল, যেন একটা আগুনের সাপ অবিনের বুকের পকেটে গিয়ে লুকুল। লোকটা কী মনে করছে এই ভেবে আমার দুই কান লাল হয়ে উঠেছে; অবিন কিন্তু দেখি, চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে। আর সেই লোকটা একটু নড়ল না, চড়ল না, অবিনের দিকে ফিরেও দেখলে না, উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে যেমন ছিল তেমনি রইল; আর দেখলেম, তার দুটো আঙুল ঘড়ি-চেনটা নিয়ে যেমন ঘুরছিল এখনো তেমনি আস্তে আস্তে শূন্যে ঘুরছে। কড়া কথা, মিষ্টি কথা, মিনতি এবং বিনতি সব যখন হার মেনেছে, তখন আমি অবিনকে বললেম, 'তোমার সঙ্গে এই পর্যন্ত।' বলেই আমি তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসলেম। কতক্ষণ এমন কাটল মনে নেই। একটি সাদা পাখি ঢেউয়ের উপর, পদ্ম থেকে ছেঁড়া পাপড়িটির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে, আমি সেই দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময় অবিন আমার পিঠে একটা মস্ত থাবড়া বসিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললে, 'ওহে, পকেট থেকে চেনটা কোথায় পড়ল দেখেছ?'

সাপে ছোবলালে যেমন, আমি তেমনি চমকে উঠলেম; দেখলেম, ভয়ে অবিনের মুখ সাদা হয়ে গেছে। আমার দুই চোখ চকিতের মতো ডেকটার এক ধার থেকে আর-এক ধার যেন ঝেঁটিয়ে

Pathagar.net

নিলে। শিরিস-কাগজ-করা সেগুন-কাঠের সরু তক্তাগুলো এবং পিচ-ঢালা তাদের জোড়ের সেলাইগুলো এমন অতিরিক্ত স্পষ্ট হয়ে কোনোদিন আমার দৃষ্টিতে পড়ে নি। অবিনও তার পায়ের কাছে জমা-করা জাহাজের মোটা কাছিটা যেন আন্‌মনে পা দোলাতে দোলাতে একটুখানি সরিয়ে দেখলে এবং বুক থেকে হঠাৎ-খসে-পড়া গোলাপ ফুলটা কুড়োবার অছিলায় বেঞ্চের তলাটাও একবার বেশ করে হাত বুলিয়ে নিলে বটে কিন্তু কোথাও সেই ঘড়ি বা তার সাপ-খেলানো চেনের লেজুড়ের ডগাটি পর্যন্ত নেই। এ দিকে দেখছি, কুঠিঘাটার পনটুনে, মৌমাছির ঝাঁকের মতো লোক জাহাজটা ধরবার অপেক্ষায়। আর-একটু পরে লোকের পায়ের তলায় অবিনের এই মহামূল্য বিপদ গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে, এটা ভেবে আমার লজ্জাও যেমন হচ্ছে, তেমনি আর-একটু পরেই অবিনকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিতে পারব, ভেবে খানিকটা ফূর্তি এবং সাহসও হচ্ছে। এমন সময় সেই লোকটা বেশ ধীরে-সুস্থে বেঞ্চি থেকে উঠে বরাবর থার্ড ক্লাসে ইঞ্জিন-ঘরের ধারে লালপাগড়ি একজন রিভার-পুলিসের জমাদারের সঙ্গে কে জানে খানিকটা কী ফুস্‌-ফাস্‌ করে আবার আস্তে আস্তে নিজের জায়গা এসে দখল করলে। কুঠিঘাটায় তখন লোক উঠতে শুরু হয়েছে। পাহারা-ওয়ালা-সাহেব ফার্স্ট ক্লাসে আসবার রাস্তাটা আগলে দাঁড়িয়ে জাহাজের একজন ছোকরা টিকিট-কালেক্টারের সঙ্গে ফিস্‌-ফাস্‌ করে কী যে বলাবলি করতে লাগল তা শুনতে পেলেম না ; অবিনও চোখ বুজে কী ভাবতে লাগল তা আমি জানি না ; কিন্তু আমি আমার দুই পকেটে হাত গুঁজে বুটজুতোর সুকতলা থেকে মাথার উপরে টুপি-ঢাকা ব্রহ্মতেলো পর্যন্ত একটা শীত-শীত অনুভব করতে লাগলেম। জাহাজ পুরো-দমে কলকাতার দিকে চলেছে, তার সমস্তটা একটা রুদ্ধ আবেগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে ; যেন সে আমাদের যত শীঘ্র পারে বড়োবাজারের পনটুনে হাজির করলে বাঁচে—সেখানে নিকেলের বোতাম-আঁটা কালো কোর্তা গায়ে

pathagar.net

সাহেব-কন্‌স্টেবল কটা চোখের স্থির দৃষ্টিটা নিয়ে প্রতীক্ষা করে রয়েছে। এমন সময় অবিন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'দেখুন তো আপনার ঘড়িতে কটা।' সমস্ত পৃথিবী ক্ষণকালের জন্য চলা-বলা বন্ধ করে আমার দুই চোখের চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে সেই লোকটার দিকে যেন চেয়ে দেখলে। লোকটা তার জেব থেকে সেই হীরের ঘড়ি মায়-চেন হারানিধির মতো অবিনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, 'দশটা বিশ হল।' ঝমাঝম্ বাদলা হঠাৎ কেটে সূর্য উঠলে যেমন সব পাখিগুলো একসঙ্গে ডেকে ওঠে, তেমনি জাহাজের যাত্রীদের কোলাহল, কলের হুস্-হাস্, জলের কল্-কল্, সমস্ত একসঙ্গে এসে আমার মনের মধ্যে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। অবিন যে কখন্ উঠে সেই লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে আহিরীটোলায় নেমে গেল তা আমি দেখতেও পেলেম না।

আমাদের কুঁড়েমির বাসাটা ভেঙে গেছে। অবিন আর আসে না; যদিও কোনোদিন আসে তো ঘড়ি ধরে বাড়ি ফেরে। অবিনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নবীন এবং প্রবীণের দল একে একে গা-ঢাকা হল; পড়ে রইলেম কেবল আমি—নবীন ও প্রবীণ দুই দলেরই অবশেষ, উলটে-পড়া মদের পেয়ালায় তলানি একটি ফোঁটা।

ইয়ার্কির শেষ-নাড়িচ্ছেদ বুড়ো গোলকবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ করে আমি আমার সেই আগেকার জাহাজে আজকের সকালে ঠিক সেই আগেকারই মতো একলাটি এসে বসেছি। এতদিন যেন শীতে একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে আগুন-তাতে বাস করছিলেম, হঠাৎ আজ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখছি, বসন্তকাল জলে স্থলে ঢেউ দিয়ে বইছে। মন-ভোলানো ফাগুনের হাওয়া, বসন্তবাউরির সুবে-ওঠা কচি ডানার মতো হলদে রোদ এখনো শীতে কাঁপছে। আমি তারই দিকে চেয়ে একলাটি আমার সেই আগেকার জায়গায় চুপ করে বসে বসে দেখছি—সব নৌকোয় ফুটো-ফাটা নতুন-পুরাতন-

নির্বিশেষে পালগুলোতে আজ নতুন দখিনে হাওয়া বেধেছে, নদীর বুকে যৌবনের জোয়ার তুফান তুলেছে, জলের ফেনা যেন ফুলের সাদা সাজ! বাইরের এই শোভার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে, আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আছি, এমন সময় একটা প্রাণখোলা পরিষ্কার বাতাস নদীর এক আঁজ্‌লা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটায় আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভিজিয়ে সমস্ত ডেকটা একবার জলের ছড়া দিয়ে দিয়ে ধুয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলাপফুলের খোস্‌বো চারি দিকে ছড়িয়ে সেই হাঙরমুখো স্টিমারের লোকটি বাসন্তী রঙের একখানা রুমালে মুখ মুছতে মুছতে দেখা দিলেন। লোকটির চেহারা যে এত সুন্দর ইতিপূর্বে তা আমার চোখেই পড়ে নি। আজ গোলাপি সাটিনের সদ্‌রি, বাসন্তী রঙের ফিন্‌ফিনে ঢাকাই মসলিনের বুটিদার চাপকান, তার উপরে চিকনের কাজ-করা হাল্কা টুপিটি প'রে মূর্তিমান বসন্তের মতো তাঁকে দেখতে হয়েছে। সিংহের মতো সরু কোমর আর দরাজ বুক নিয়ে লোকটি আমার পাশেই এসে বসলেন! আমি তাঁকে একটা সেলাম না দিয়ে থাকতে পারলেম না। তিনি একটুখানি হেসে আমার দিকে একবার ঘাড় নিচু করে চাইলেন। সেই সময় তাঁর চোখ দুটো দেখলেম যেন একটা স্বপ্নের জাল দিয়ে ঢাকা! এমন চোখ আমি কারু দেখি নি; এ যেন আমার দিকে চেয়ে দেখছে বটে, দেখছে নাও বটে! তখন সেই আচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টি, সেই বাসন্তী কাপড়ের আভা, আর সেই রুমালে-ঢালা গোলাপ-ফুলের রঙ আমাকে এমন বিহ্বল করেছে যে আমার মনে পড়ে না তাঁকে আমি কোনো প্রশ্ন করেছিলেম কি না। তিনি যেন আমার প্রশ্নেরই জবাবে বললেন, 'তবে শুনুন—

'আমার বংশে কেউ কখনো স্বপ্ন দেখত না। এটা শুনে আপনি আশ্চর্য হবেন না। পাঁজরের যে হাড়খানায় স্বপ্নের বাসা, সেই হাড়টা হাফেজের মতো কোনো মহাকবির অভিশাপে আমাদের আদি-পুরুষের বুক থেকে খসে প'ড়েছিল, সেই থেকে বংশানুক্রমে আমরা ভয়ংকর-রকম কাজের মানুষ হয়ে জন্মাতে লাগলেম। বুকের

ওই হাড়, যেটাকে স্বপ্ন এসে বাঁশির মতো ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে তোলে, সেটা আর আমাদের কারুর মধ্যে গজাতে পেল না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে-দক্ষতার একটা সীলমোহর বুকে নিয়েই যেন আমাদের বংশের সব ছেলেগুলো ভূমিষ্ঠ হত এবং আমাদের মধ্যে কোনো ছেলের বুকে যদি কখনো ওই হাড়ের বাঁশির অঙ্কুরমাত্র আছে এরূপ সন্দেহ হত, তবে হাকিম এবং বুজ্‌রুগ ডেকে সেই শিশু-বুকে একটা তপ্ত লোহার শলা চালিয়ে স্বপ্নের অঙ্কুর দগ্ধ করে দিতে আমাদের কেউ কোনোদিন ইতস্তত করেন নি, যদিও স্বপ্নের সন্দেহে অনেক সময় শিশু-প্রাণগুলি পুড়ে ছাই হতে বিলম্ব হয় নি। আমাদের যারা কেউ নয়, তারা এজন্যে হাহাকার করত, এবং এর জন্যে আমাদের বংশে অনেক মায়েরও বুক ফাটত সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনো পিতার হাতে একনিমিষের জন্য কাজে একটুও শৈথিল্য এসেছে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। পুরুষানুক্রমে কাজ থেকে রস টেনে নিয়ে আমাদের বুকের হাড়গুলো বাজ-ধরবার শিকের মতো সরু, কালো এবং নিরেট হয়ে উঠেছিল।

এই বংশের শেষ সন্তান, আমি যখন ভূমিষ্ঠ হলেম তার ছ মাস পূর্বে পিতা আমার স্বর্গারোহণ করেছেন এবং আমায় প্রসব করে মা আমার কঠিন রোগশয্যায় শুলেন, কাজেই আমার বুকের ভিতরে স্বপ্নের বাঁশি যদি থাকে সেটা নিয়ে আমি বেড়ে উঠতে কোনো বাধাই পেলাম না। শুকনো ডালের শেষ-পল্লবের মতো আমি, আমার মধ্যে দিয়ে হয়তো এই অভিশপ্ত বংশের অসংখ্য বিফল স্বপ্নগুলো শেষ ফুলটির মতো একদিন ফুটে উঠতেও পারে, এই ভেবে মা আমার এক-একদিন রোগশয্যার কাছে আমাকে ডেকে তাঁর শীর্ণ হাতখানা আমার বুকের উপর আস্তে আস্তে বুলিয়ে দেখতেন। সে-সময় তাঁর দুই চোখ রোগের কালিমার মাঝে এমন একটা উৎকট আশঙ্কা নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকত যে আমি ভয়ে এক-একদিন কেঁদে ফেলতুম। মা আমার চোখে জল দেখে আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমায় ছেড়ে দিতেন। আমাদের

pathagar.net

বংশে কেউ কোনোদিন চোখের জল ফেলে নি, সেটাকে তাঁরা স্বপ্নের অঙ্কুরের মতো সম্পূর্ণ অকেজো বলেই গণ্য করতেন।

'মা দুঃসাধ্য রোগে বিকল; কাজেই সেই অল্পবয়স থেকেই আমি কাজের মানুষ হয়ে উঠলুম। কাজের চাপনে আমার সমস্ত বুকটা যখন কালের চাপে পাটের গাঁটের মতো নিরেট শক্ত হয়ে ওঠবার জোগাড়, যে-সময় কাজের মধ্যে আমি এমন একটু অবসর পাচ্ছি নে যে রোগা মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে একটুও সময় নষ্ট করি, যখন মা আমার অসময়ে হঠাৎ মরে অসমাপ্ত কাজের কোনো ব্যাঘাত না ঘটান এই প্রার্থনাটা আমার মনে নিত্য জাগছে সেই সময় পাটের বাজারে একটা বিষম দাঁও-প্যাঁচের মাঝখানে মায়ের আসন্ন মৃত্যুর খবরটা আমার অফিস-ঘরে এসে পৌঁছল। বলা বাহুল্য, সেখান থেকে আমার কাজ অসমাপ্ত রেখে তখন নড়বার সাধ্য ছিল না। যে-সাহেবের সঙ্গে সেদিন দেখা, তিনি তখন আমাদের ডাক্তার ছিলেন। আমি একখান চিরকুটে আমার কাজ সেরে আসা পর্যন্ত তাঁকে মায়ের খবরদারি করতে লিখে পাঠিয়ে কাজে মন দিলেম। আর-কেউ হলে সব কাজ ফেলে মুমূর্ষু মায়ের কাছে ছুটে যেত কিন্তু আমি জানতুম, আমি সেই নিরেট বাঁশের শেষ কঞ্চি, বাঁশি হয়ে বাজা যার পক্ষে অসম্ভব।

'কাজ চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে প্রায় দশটা হল এবং বাড়ি এসে কাপড় ছেড়ে জলযোগ করে নিতে আরো খানিকটা সময় অতীত হল। আমি যখন মায়ের ঘরে গেলেম তখন রাত গভীর হয়েছে। মাকে যে জীবন্ত দেখতে পেলেম সেজন্য আনন্দ হল না; তিনি যে আমার কাজ সারা হবার মাঝেই সরে গিয়ে কোনো অসুবিধা ঘটান নি, সেটাতেই আমার আনন্দ। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে বললেন, 'ওই বাক্সটা এখানে আন্।' বাক্সটা তাঁর সমুখে ধরে দিতেই তিনি কী-একটা বার করে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, তুই কখনো স্বপ্ন দেখিস ?'

'বাক্সটার ভিতর আমি দেখলেম শূন্য। আমার মনে হল

pathagar.net

মায়ের কথার কী উত্তর দেব সেইটে শোনবার জন্যে সেই লোহার বাক্সটা যেন হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি হোঃ হোঃ করে হেসে বললেম, 'কোনো পুরুষে স্বপ্ন কাকে বলে জানি নি।' আমার মনে হল, আমার কথা শুনে মায়ের বুকে ওঠা-পড়া হঠাৎ বন্ধ হল, তার পর আস্তে আস্তে তাঁর ডান হাতের মুঠো সজোরে কী যেন আঁকড়ে ধরলে।

'তার পর যা ঘটল সেটার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেম না। একটা ঝড় যেন প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিয়ে আমার ভিতরে জমাট-বাঁধা কাজকে হঠাৎ ঠেলে বার করে দিলে। আমার পাঁজরের সমস্ত হাড়গুলো তল্‌তা বাঁশের বাঁশির মতো করুণ সুরে সহসা বেজে উঠল। আর, আমার সেই মরা মায়ের ডান হাত আস্তে আস্তে তাঁর নিজের বুকের উপর থেকে উঠে ক্রমে ক্রমে আমার বুকের উপরে এসে আস্তে আস্তে আপনার মুঠো খুললে। আর ভিতর রয়েছে দেখলেম, 'আব্‌দ্‌আল্লা' লেখা আমার অভিশপ্ত অতি-পুরাতন পূর্বপুরুষের বুকের হাড়। তার গায়ে সাত-আটটা ছোটো ছোটো ফুটো। সেইদিন সব-প্রথম লোকে আমাদের বাড়ি থেকে কান্নার করুণ সুর শুনতে পেয়েছিল। আর সেইদিন আমি প্রথম জানতে পারলেম, আমার বুকের ভিতরে সব হাড়গুলো বাঁশির মতো ফাঁপা ও ফুটো, কাজ দিয়ে সেগুলো বোজানো ছিল মাত্র—'

গঙ্গার একটা জলের ঝাপটা হঠাৎ স্টিমারের ডেক ডিঙিয়ে আমাকে ঠাণ্ডা জলের ছিটেয় একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। আমি হঠাৎ চমকে উঠে চারি দিক চেয়ে দেখলেম, একটি গোলাপ-ফুল আমার পাশে পড়ে আছে; কিন্তু, সে লোকটার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। তার পরদিন অবিনের সঙ্গে দেখা হতে সে বললে, 'ওহে কাল কি তুমি স্বপ্নে ভোর ছিলে? পাশের স্টিমার থেকে গোলাপফুলটা তোমার গায়ে ছুঁড়ে মারলেম, তাতেও তোমার চেতন্য হল না। অবাক্!'

pathagar.net

আজ অবিনের গুরুর কাছে সে আমাকে নিয়ে যাবে। শুনেছি, তিনি মহা সাধুপুরুষ এবং জাতিস্মর। আমি সেদিন আমার গেরুয়া মলিদার ওভারকোটটার। উপরে আজ-কালের স্বামীজির ধরনে পাগড়িটা বেঁধে, পকেটে কবীরের পুঁথিখানা নিয়ে, জাহাজে গিয়ে চড়লেম। নাকে সোনার চশমা এবং হাতে রুপো-বাঁধা শুয়োরের দাঁতের ছড়ি আর পায়ে ফ্লানেলের পেণ্টালুনের নীচে ব্রাউন-লেদার বুটটায় আমাকে ফকির কি ফিকিরবাজ পুলিসের সি. আই. ডি. অথবা আর-কিছু দেখাচ্ছিল তা আমি ঠিক বলতে পারি নে; তবে, আমার মনের ভিতর সেদিন যে একটু গেরুয়ার আভা পড়েছিল, এবং আমি গান-বাজনা না করে খুব গম্ভীর হয়ে বসে থাকায় জাহাজের তাবৎ যাত্রী আমার দিকেই যে থেকে থেকে কটাক্ষপাত করছে, এটা আমি বেশ বুঝছিলেম। বুড়ো গোলকবাবু সেদিন খবরের কাগজটা চশমার অতটা কাছে নিয়ে কেন যে অমন মনঃ-সংযোগ দিয়ে জুটের বাজার-দরের কলম্‌টা আগাগোড়া মুখস্থ করছিলেন, সেটা জানতে আমায় অধিক কষ্ট পেতে হয় নি।

যাই হোক, অন্যদিনের মতো সেদিনও নিয়মিত উত্তরপাড়ায় এসে জাহাজ ভিড়ল। অবিনে-আমাতে সেখানে নেমে পড়ে থার্ড এবং ফোর্থ এই দুই ক্লাসের মাঝামাঝি গড়নের ছক্কড় গাড়িতে ধুলো এবং ঝাঁকানি খেতে খেতে আধক্রোশ-টাক গিয়ে রাজাদের একটা বাগান-বাড়ির ফটকের সামনে গাড়ি ঘোড়া, মায় গাড়োয়ান এবং আমরা দুজনে, খানার ভিতরে উলটে পড়লেম। একখানা মোটর গাড়ি একরাশ ধুলো আর খানিক পেট্রোলের বিকট গন্ধ আমাদের

নাক-চোখের উপরে ছড়িয়ে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। অবিন সেই পলায়িত মোটরের চলন্ত ধুলোর মধ্যে আরো গোটাকতক ইংরেজি গালাগাল মিশিয়ে দিয়ে আমাকে চাকাভাঙা গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বার করে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিলে। আমার চশমার একখানা কাঁচ গেছে ভেঙে, পাগড়িটা গেছে খুলে, এবং শুয়োরের দাঁতটা খসে গিয়ে আমার লাঠিটা হয়ে পড়েছে ফোগ্‌লা। অবিন আমার চেহারা দেখে হো-হো করে হেসে উঠল। আমি গায়ের ধুলো যথাসম্ভব ঝেড়ে-ঝুড়ে অবিনের দিকে চেয়ে দেখলাম, সে যেমন ফিট্-ফাট্ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তেমনি আছে; তার কালো কোটের একটি ভাঁজও এদিক-ওদিক হয় নি এবং তার বুকের মাঝে ফুটন্ত গোলাপফুলটি থেকে একটি পাপড়িও ঝরে পড়ে নি। অবিন লম্বায় চওড়ায় আমার চেয়ে বেশি বৈ কম হবে না, অথচ এই ছক্কড় গাড়িটার খাঁচাকল থেকে কী করে এমন সাফ বেরিয়ে গেল তা জানি নে; কিন্তু তাকে দেখে আমার হিংসে হয়েছিল সত্যি বলছি। ধুলোমাখা গেরুয়া-পাগড়ি ঝেড়ে-ঝুড়ে সামলে নিলেম বটে কিন্তু বাড়িতে আয়নায় দেখে দেখে যেমন চোস্ত করে সেটাকে বেঁধেছিলেম তেমনটা আর হল না; ব্রহ্মতেলোর মাঝখান থেকে কাপড়ের ফুঁপিটা সাপের ফণার মতো আর উদ্যত হয়ে রইল না, বাঁ-কানের উপরে লট্‌কে পড়ল; এবং এই আকস্মিক দশা-বিপর্যয়ে দেহটা অনেকখানি ধুলো মেখে নিলেও, মন তার নিজের গেরুয়া রঙটুকু আর বজায় রাখতে পারলে না। অবিনের সঙ্গে এই সেই রাজার বাড়িতে সাধুদর্শনে যখন প্রবেশ করলেম তখন মন আমার সম্পূর্ণ অসাধু এবং অধীর।

রঙ-ওঠা লোহার শিক-দেওয়া একটা ফটকের মাঝ দিয়ে ইটের খাদ্‌রি-করা চওড়া একটা রাস্তা খানিক সোজা গিয়ে বেড়ির মতো ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে টালি-বসানো একটা বারান্দার চার ধাপ সিঁড়ির নীচে গিয়ে শেষ হয়েছে; রাস্তাটায় এক কালে লাল সুরকি ঢালা ছিল, এখন সেগুলো উড়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় সবুজ শেওলার

ছোপ ধরেছে। রাস্তার ধারে ধারে পুরোনো গোটাকতক পাটা-ঝাউ এবং এখানে-ওখানে মাটির পরী রাখবার গোটা-দুচ্চার ইঁটের পিলপে। পরীগুলোর মাটির দেহ বারো-আনা ক্ষয়ে গিয়ে ভিতরের শিকগুলো বেরিয়ে পড়েছে। বাগানটা বাড়ির পিছন পর্যন্ত ঘুরে গিয়ে, একটা টানা রেলিঙের ভিতর দিয়ে যেখানে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে সেইখানে একসার শুকনো গাঁদাফুলের গাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। সিঁড়ির দু ধারে সিংহী বসবার দুটো বড়ো চাতাল। একটার উপর থেকে সিংহী অনেক কাল পালিয়েছে—সেখানে একটা ছেঁড়া মাদুর রোদে শুকোচ্ছে; আর-একটা চাতালে পোড়ামাটির মুখ খিঁচিয়ে এখনো এক পশুরাজ ভোম্বলদাস তার খসে-পড়া ল্যাজের সরু শিকটা আকাশের দিকে খাড়া করে থাবাহীন এক পা শূন্যে উঁচিয়ে বসে আছে।

আমরা সিঁড়ির ক'টা ধাপ পেরিয়ে মোটা মোটা তিনটে থাম-দেওয়া বারান্দা পেরিয়ে এক বড়ো ঘরে ঢুকলেম। ঘরটা খুব লম্বা, মাঝে বাঘ-থাবা পুরোনো মেহগ্নি-কাঠের মস্ত একটা গোল টেবিল অনেকখানি ধুলো আর খুব জমকালো একটা চিনে-মাটির ফুলদান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলদানটার একটা হাতল আর খানিকটা কানা ভাঙা; আর তার গায়ে বড়ো বড়ো গোলাপফুল, প্রজাপতি আঁকা। ঘরের ঝাড় ক'টা ময়লা গেলাপ দিয়ে মোড়া—আগে লাল, এখন কালো সালু-মোড়া শিকে ঝুলছে। ঘরের সবুজ খড়-খড়ি ছিল; এখন ফিকে হতে হতে দাঁড়িয়েছে প্রায় গঙ্গামৃত্তিকার রঙ। ঘরের পাশের দেয়ালগুলোতে একটা করে আয়না, একটা মেমের ছবি—ছবির কোনোটার কাপড়-পরা, কোনোটা নয়। মাঝের দুই বড়ো দেয়ালে এক দিকে একটা বড়ো ঘড়ি; আর-এক দিকে চওড়া গিল্টির ফ্রেমে বাঁধা, জরির তাজ মাথায়, এক সুপুরুষের চেহারা—মনে হচ্ছে, যেন সামনের দেয়ালে সেই অনেক দিনের বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ঘড়ির কাঁটা দুটোর দিকে তিনি চেয়ে আছেন।

pathagar.net

অবিন ঘরে ঢুকেই বাঁকা-পায়া গোল-পিঠ পাঁচরঙা ফুল-কাটা ছিট-মোড়া একখানা চৌকিতে ধপাস করে বসে পড়ল। দুজনে প্রায় এক কোয়াটার বসে আছি; অবিনের মুখে কথাই নেই। আমরা কেন যে এখানে এসেছি সেটা যেন অবিন ভুলেই গেছে। আমি বেগতিক দেখে—একটা উড়ে ঘরের এক টেরে, যেখানে খানিক রোদ এসে পড়েছে, একটা সিগারেটের মরচে-ধরা টিনের কৌটো থেকে দোক্তার পাতা একটা একটা বার করে রোদে মেলিয়ে দিচ্ছিল—সেই-খানে আস্তে আস্তে গিয়ে বললেম, 'সাধু কোথায় রে?' উড়েটা ঘাড় না উঠিয়েই, সাধু এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করে আবার নিজের কাজে মন দিলে। আমি আবার বললেম, 'ওরে, সাধু কোথায়? তাঁকে একবার খবর দে-না!'

দাসো একবার পানের দাগ-ধরা লাল ঠোঁট দুটো কুঁচকে বললে 'সাধু? আমিই তো সাধু!'

আমার আর রাগ বরদাস্ত হল না; আমি আমার ভাঙা ছড়ি-গাছটার বাকি অংশটা তার পিঠেই আজ ভেঙে যাব বলে উঁচিয়েছি আর অবিন ডাকলে, 'ওহে, এ দিকে।' ফিরে দেখি যাঁকে দেখবার, জন্যে আসা তিনি দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হবামাত্র তিনি একটুখানি হেসে কবীরের এই পরশটা সুর করে আউড়ে নিলেন—

'মন ন রঙ্গায়ে, রঙ্গায়ে যোগী কাপ্‌ড়া।'

আমার পকেটে কবীরের পুঁথি, এটা ইনি নিশ্চয় জেনেছেন; আর, কথাগুলো আমাকেই বলা হল, এই ভেবে আমি একটু বিস্মিত একটু ভীত, আর একটু লজ্জিত হয়েই তাঁর পায়ে প্রণাম করলেম। তিনি হো-হো করে হেসে উঠে বললেন 'ওহে অবিন, তোমার বন্ধু যবনের পায়ের ধুলো নিয়ে ফেললেন, এটা তো ভালো হল না!'

ইনি যবন! বিস্ময়ে আমি যেন অভিভূত হয়ে অবিনের দিকে চাইলেম। মনে একটু যে ঘৃণার উদয় না হয়েছিল তা নয়। অবিনটা তার পাতলা ঠোঁট খুব চেপে এবং বড়ো বড়ো চোখে প্রকাণ্ড একটা

pathagar.net

কৌতুকের নিঃশব্দ হাসি নিয়ে আমার মুখে চেয়ে রইল। আমার তার উপর ভারি রাগ হচ্ছিল ; সে যদি আগে বলত তো যবনের পদধূলি—কথাটা মনে আসবামাত্রই সাধু একেবারে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন—

'কোই রহীম কোই রাম বখানৈ, কোই কহে আদেস,
নানা ভেষ বনায়ে সবৈ মিল ঢুঁর ফিরে চঁহু দেশ।'

আমার বেশটার উপরে এই ঠেস—সেটা যিনি করলেন তিনিও যে ভেকধারী কেউ নন, এটা তাঁর সাদা সিল্কের পাঞ্জাবির উপরে কাশ্মীরি শাল এবং তার নিচে লুঙ্গি-ফ্যাশানে পরা নূতন ধোয়া থান ধুতি দেখে কিছুতেই আমি ভাবতে পারলেম না। এমন সাধু আমি অনেক দেখেছি এবং সময়ে সময়ে তাদের পাল্লায় পড়ে অনেক ঠেকেও শিখেছি। আমি একটু চেঁচিয়েই অবিনকে বললেম, 'চলো হে, জাহাজ আবার না ছেড়ে দেয়! সাধুদর্শন হল ; চলো এখন গঙ্গাস্নান করে বাড়ি যাই।'

অবিনের যিনি গুরু, তিনি এতক্ষণে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'এই এতক্ষণে আপনি আমায় যথার্থ চিনেছেন। আসুন, একটু চা আর গোটা দুই মুরগির ডিম না খাইয়ে আপনাদের ছাড়া হচ্ছে না।'

বলা বাহুল্য, যবনের পদধূলিতে ঘৃণা থাকলেও, যবনপালিত পক্ষীজাতির উপরে আমার কোনো আক্রোশ ছিল না। জেলের জল শাস্ত্র-মতে অগ্রাহ্য বলে জেলের মাছও যে বাদ দেব এমন মূর্খ আমি ছিলেম না ; বা জেলখানার ছত্রিশ-জাতের গায়ের বাতাস মনুর মতে নিষিদ্ধ হলেও জেলের তেল অথবা সেই তেলে ভাজা শহরের ছত্রিশ-জাতের পদধুলি-মাখানো গরম ফুলুরি যে অনাদরের সামগ্রী এটা স্বীকার করতে আমি একেবারেই নারাজ ছিলেম। তার পর সদ্য-ধোপ-দেওয়া সাদা চাদরে ঢাকা টেবিলে যখন অতিবিশুদ্ধ তামার কোষা কমণ্ডলু তাম্রকুণ্ডতে টাটকা-পাড়া মুরগির সাদা ডিম, এবং তার চেয়েও পরিষ্কার এবং সাদা পাঁউরুটি, ঘরের গোরুর দুধ,

লিপটনের চা-পানি—কলের জলের, গঙ্গাজলের নয়—এসে উপস্থিত, তখন অবিনের গুরুকে সাধুবাদ দিতে একটুও আমায় ইতস্তত করতে হল না।

ফকিরটির ভিতরে ফক্‌রেমি কোথাও ছিল না। দেখলেম, তাঁর হাতের চিমটেয় তিনি তিনটে পাখির খাঁচা ঝুলিয়েছেন এবং তাঁর গেরুয়া-বসনটা টুকরো টুকরো করে কেটে তিনি বানিয়েছেন খাঁচার ঢাকা; পৈতের সুতোয় তিনি বানিয়েছেন ঘুড়ি ওড়াবার সরু লক; লক্ষ্মীর ঘটটা উলটে তিনি সরস্বতীর বীণার তুম্বি বানিয়ে নিয়েছেন। বৈরেগিদের যা-কিছু ভণ্ডামি, ও গোঁড়ামির যত-কিছু আসবার, সবগুলোকে তিনি এমন এক-একটা অদ্ভুত কাজে লাগিয়েছেন যে সেগুলোর দুর্দশা দেখে দুঃখ না হয়ে, হাসি পাবেই পাবে। মনু-সংহিতায়, বাইবেলে, কোরানে যেগুলো শুদ্ধ, সেগুলো বিরুদ্ধকাজে খাটিয়ে তিনি আপনার চারি দিকে এমন একটা হাস্যরসের এবং অদ্ভুত রসের অবতারণা করে রেখেছেন যে, মন সেখানে এসে দুঃসাহসে ভরে না উঠে যায় না। আমার মনে হল, যেন বাইরের একটা পরিষ্কার বাতাস জোর করে আমার বুকের কপাট দুখানা খুলে দিয়ে গেল। এর পর যখন সেই সাধুপুরুষের দিকে চাইলেম তখন তাঁকে গুরু এবং বন্ধু এই দুই ছাড়া আমি আর-কিছু মনে করতে পারলেম না। আমি গুনগুন করে গাইতে লাগলুম—

'আরে ইন্ দুহু রাহ না পাঈ,
হিঁনদুকী হিংদবাঈ দেখী, তুর্কণকী তুর্কাঈ।'

হঠাৎ হাতের কাছ থেকে বীণাটা তুলে নিয়ে বন্ধু আমার, গুরু আমার, তিনি গানের শেষ চরণ দুটো পূর্ণ করে দিলেন—

'কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো কৌন রাহ হবৈ যাঈ।'

তার পর তাঁর সঙ্গে কবির লড়াই চলল। আমি গাই, তিনি জবাব দেন। কিন্তু আমার তেমন সুস্বরও ছিল না, আর বাজাতে তেমন দক্ষতা জন্মজন্মান্তরেও লাভ করব কিনা তাও জানি নে।

সে-বেলার স্টিমার অনেকক্ষণ ঘাট পেরিয়ে আমার ঠিকানায়

যাত্রী নিয়ে পৌঁছে গেছে। তখন তিনি বীণা রেখে বললেন, 'চলো, এখন স্নান করে কিছু খাওয়া যাক।'

আমি গঙ্গার দিকে চাইতেই তিনি বললেন, 'না, ওখানে নয়, আমার সঙ্গে এসো।'

এইটে তাঁর স্নানের ঘর। সাদা পাথরে মোড়া যেন একটা চাঁদের আলোর গহ্বরে এসে ঢুকলেম। মাঝে স্ফটিকের চেয়ে পরিষ্কার গোলাপজলের ফোয়ারা! কী বিপুল শুভ্রতার ঘাটে মহাপুরুষের সঙ্গে স্নানে নামলেম! যখন আমি এই কথা ভাবছি তখন একটা দাসী—তেমন সুন্দরী আমি কখনো দেখি নি—সোনার একটা পাখির খাঁচা এনে বন্ধুর হাতে দিয়ে গেল। পাখির গা'টা বাউলদের শততালি কাঁথাখানার মতো নানা রঙে বিচিত্র। পাখিটা খাঁচার তলায় বসে ধুঁকছে। আর তার রোগা পালক-ওঠা গলাটা থেকে গোপীযন্ত্রের শব্দের মতো গুব্ গুব্ একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে। বন্ধু সেই মুমূর্ষু পাখিটিকে খাঁচা থেকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে আচ্ছা করে গোলাপজলের ফোয়ারায় চুবিয়ে দাসীর হাতে একখানা সাদা রুমালের উপর বসিয়ে দিলেন। পাখির ডানা-দুখানা সেই সাদা রুমাল ঢেকে পাঁচ মিশিলি বদ রঙ-মাখানো বিশ্রী দুটো হাতের মতো ছড়িয়ে রইল। নির্জীব পাখিটার হলদে দুটো চোয়াল বেয়ে লোহার কষের মতো পাতলা গেরুয়া রক্ত সেই রুমালখানার সাদা রঙ মলিন করে দিচ্ছে, আর মূর্তিমন্ত নিষ্ঠুরতার মতো আমাদের বন্ধু দুটো জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে সেই দিকে চেয়ে আছেন—এ দৃশ্যটা আমার কল্পনারও অতীত। আমার অন্তর-বাহির একটা বীভৎস বিস্ময়ে সেই লোকটার সঙ্গে আরো বেশি করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার উৎকট আকাঙ্ক্ষায় টল্‌মল্ করে উঠল। এই দেখলেম একে মহাপুরুষ, আবার এই দেখছি ঘোর নৃশংস, মৃত্যুর মতো নির্মম।

এ রহস্যের ব্যূহভেদ একমাত্র অবিনই করতে পারবে জেনে আমি তার শরণাপন্ন হলেম। কিন্তু সে আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে বললে, 'আমি পারব না; ইচ্ছা হয় তুমি ওঁকে শুধোও।'

pathagar.net

আমার আর ভোজনে সুখ হল না, শয়নে শান্তি এল না। মহাপুরুষ উপাদেয় রকমেই আমাদের পান ভোজন ও শয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবিনটা দিব্যি সেগুলো উপভোগ করলে এবং বেলা চারটের সময় ফিরতি স্টিমার ধরবার জন্য ঠিক সময়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আমার এ স্থানটা থেকে কিছুতেই নড়তে ইচ্ছা ছিল না। এবার আমি অবিনের ঠিক পালটা জবাব দিলেম, 'আমি যাব না; তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও।'

কত আশ্চর্য ব্যাপার চোখের উপরে ঘটে গেল, তাতে অবিনের কৌতূহল জাগে নি; কিন্তু ওই-যে বলেছি 'যাবনা', অমনি তার মনে একটু 'কেন' জাগল এবং দেখতে দেখতে সেটা একটা বিরাট কৌতূহলে পরিণত হল। সে ছড়িগাছটা আর ওভারকোটটা খুলে রেখে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে শুধোল, 'নিমন্ত্রণ পেয়েছো নাকি?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললেম, 'হুঁ।'

অবিনের কৌতূহলের আবেগ দেখে হাসি পাচ্ছিল। সে একেবারে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে, 'এইখানে তুমি রাত কাটাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছ? এ কি সম্ভব!'

'অসম্ভব কেনই বা হবে?'

অবিন বোধ হয় আমার মুখ দেখে কতকটা এঁচেছিল আমি তাকে ভোগা দিচ্ছি। সে এবার জোরের সঙ্গে বললে, 'অসম্ভব। কেননা, আমার পক্ষে সেটা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি!'

বলেই অবিন ওভারকোট পিঠে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি সেই মহাপুরুষ ঘরে এসে বললেন, 'যা এতদিন অসম্ভব ছিল, আজ তা সম্ভব হোক; কী বলেন?'

আমাদের আর দুবার করে অনুরোধ করতে হল না। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যখন তাঁর দিকে চেয়ে দেখলেম তখন তাঁর হাতে হাতির দাঁতের রঙ একটা পাখি দেখলেম। সেটা পায়রা কি ঘুঘু কিছু বোঝা গেল না। আর, তাঁর পাশে যেন পাথরে-গড়া একটি সুন্দর ছেলে।

pathagar.net

আজ পূর্ণচন্দ্র আকাশের নীলের উপরে সাদা আলোর একটা জাল বিস্তার করে দেখা দিয়েছেন। এমন পরিষ্কার ধব্‌ ধবে রাত আমি দেখি নি। তার মাঝে একটা শ্বেত-পাথরের মন্দিরে আমরা এসে বসেছি। অবিনের পরনে তার সেই নেভি-ব্লু চায়না-কোট, আমার সেই গেরুয়া অলস্টর, আর তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা সাজ। তাঁর মাথার চুল যে এত সাদা তা পূর্বে আমার চোখে পড়ে নি। যেন সাদা ফেনার মধ্যে তাঁর সুন্দর মুখ শ্বেতপদ্মের মতো দেখা যাচ্ছে। আজ কী সাদার মধ্যেই এসে আমরা ডুব দিলুম। মেঘ যখন তার সমস্ত জল ছড়িয়ে দিয়ে হালকা হয়ে উঠেছে, এ তেমনি সাদা। হিমালয়পর্বতের শিখরের তুষার যখন তার সমস্ত তরলতার সমাহার করে শুভ্র কঠিন হয়ে উঠেছে, এ তেমনি সাদা। এরই মাঝে তিনি আস্তে আস্তে তাঁর ইতিহাস শুরু করলেন—

'পূর্বজন্মে যাগযজ্ঞ দানসাগর শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণভোজন ও কুমারীদানে সর্বস্ব লুটিয়ে দেবার পুণ্যে আমি তিন ত্রিশে নব্বই লক্ষ বৎসর বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক আর শিবলোকে বাস করে শেষে অমরাবতীতে ইন্দ্রত্বপদ দখল করে বসলেম। সে বারো হাজার বৎসর নন্দনবনে চিরযৌবন নিয়ে কী আনন্দ, কী বিলাসের মধ্যেই যে বাস করছিলেম তা বর্ণনাতীত। তোমরা এখানে মোগল-বাদশাহের বাবুগিরির যে-সব গল্প পড়ে অবাক হয়ে যাও সেখানকার তুলনায় সেগুলো কী তুচ্ছ! সেখানে বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, অবসাদ নেই, মনের বাগানে চিরবসন্তের ফুলগুলো সৌন্দর্যের সুখের লালসার মত্ততার অফুরন্ত পেয়ালার মতো রসে চিরদিন ভরপুর রয়েছে। অতৃপ্তির শিখা সেখানে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো দিনরাত জ্বলছে। স্বর্গের সেই ক'টা দিন আমার ভোগের অনলে উর্বশী রম্ভা তিলোত্তমাকে আহুতি দিয়ে প্রায় স্বর্গবাস শেষ করে এনেছি, সেই সময়ে ইন্দ্রানীর উপরে আমার লোলুপ দৃষ্টি পড়ল। আমার কাছে অপ্রাপ্য তখন কিছুই ছিল না। আমার শেষ-পুণ্যফল একটা বিরাট

pathagar.net

অজগরের মতো উত্তপ্ত নিশ্বাসে আকর্ষণ করে শেষে একদিন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীকে আমার দুই বাহুর মধ্যে এনে উপস্থিত করলে।

'সেই রাত্রি—সেই সুনীল আকাশের বাসর-ঘরে প্রমোদের বীণার ঝংকারে নারীর ক্রন্দন, সতীর নিশ্বাসের করুণ সুর, ডুবে গেল, অশ্রুত রইল! সেই আমার স্বর্গবাসের শেষ প্রমোদরজনী, আমার চিরযৌবনের উত্তেজনার মদিরা পূর্ণমাত্রায় আমি পান করলেম। আর সেই রাত্রিপ্রভাতে ইন্দ্রদেবের অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে বারো হাজার বৎসরের শ্রান্তি আর অবসাদ প্রথম এসে আমাকে আক্রমণ করলে।

'ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র থেকে আপনাকে রক্ষা করবার আর-কোনো উপায় ছিল না। আমি গিয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেম। তিনি আমাকে একগাছা হরিনামের মালা দিয়ে বললেন, "তুমি নিজের কর্মফলেই স্বর্গে এসেছিলে এবং তারই ফলে আবার পৃথিবীতে চলেছ : হরিনাম করো, আবার এখানে তোমার স্থান হবে।"

'স্বর্গ যে কী ভয়ংকর স্থান তা আমার জানতে বাকি ছিল না। অমর-অতৃপ্তিতে আমার আর লোভ ছিল না। আমি বিষ্ণুকে নমস্কার করে ব্রহ্মার কাছে এলেম।

'তিনি তাঁর মানসপুত্রদের লেখা খানকতক সংহিতা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এতে যেমন বিধান লেখা হয়েছে সেইমতো যথাবিধানে পৃথিবীতে গিয়ে তুমি প্রায়শ্চিত্ত করো, স্বর্গ আবার তোমার করতলে আসবে।"

'আমি সেখান থেকেও হতাশ হয়ে দেবাদিদেবের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমস্ত নিবেদন করলেম। তিনি বললেন, "তুমি কারো কথা শুনো না, স্বর্গলাভের সহজ উপায় আমার হাতে আছে। এই এক-টিপ সিদ্ধি মুখে ফেলে দাও, তোমাকে আর স্বর্গের ফটক পেরিয়ে বেশি দূর যেতে হবে না, আমার দূতেরা ঝুঁটি ধরে এখানে তোমায় ফিরিয়ে আনবে।"

'আমি তখন জগৎ-জননীর পা জড়িয়ে ধরলেম। মা আমাকে

pathagar.net

কৃপা করে তিন রঙের তিনটি কপোত দেখিয়ে বললেন, "পৃথিবীতে এই তিনজন তোমার বন্ধু থাকবে। এদের চিনে নিয়ো, তবেই জীবন তোমার শান্তিতে কাটবে। না হলে আবার এই স্বর্গবাস আর এই স্বর্গবাসের লাঞ্ছনা তোমার অদৃষ্টে ঘটবে নিশ্চয়।"

'আমি বিষ্ণুর জপমালা, ব্রহ্মার ঘেরণ্ডসংহিতা আর শিবের সিদ্ধির পুঁটলি টেনে ফেলে দিয়ে সেই কপোত তিনটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেম। একটি নীল, একটি গেরুয়া, একটি সাদা। দেখতে দেখতে সপ্তস্বর্গ রামধনুকের রঙের মতো আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। আমি এইখানে নেমে এলেম। সেই তিনটি কপোতই হচ্ছেন—'

অবিন অমনি ফস্ করে বলে উঠল, 'বস্ গুরুজি, আর না। গল্পের ভিতর মোরালিটি ও নীতিকথা এসে মিশছে। রক্ষে করুন। এই নীল-কোট আমি, আপনার যৌবনের ইয়ার, আমিই হচ্ছি সেই নীল কপোত। মাঝে ভূদণ্ডের মতো এই গেরুয়া কপোত আমার বন্ধু—এ আপনার দাঁড়ে বসে ছোলা খেলে এবং আপনার গোলাপজলের ফোয়ারার পিচ্‌কিরিতে এর ভিতরের ও বাইরের বৈরাগ্য গেরুয়া-রক্ত বমন করে স্বর্গলাভও করলে। তবে এখন আপনার পাশে শিশুবেশে যে সাদা কপোত দেখা দিয়েছেন ওঁকে নিয়েই আপনি শান্তিতে থাকুন, আমাদের আর নীতিকথা বলে দগ্ধাবেন না।'

শাণিত ছোরার উপরে আলো পড়লে যেমন হয়, মহাপুরুষের চোখদুটো অবিনের এই ধৃষ্টতায় ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে উঠল। তিনি আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠে কোমর থেকে সাপের মতো বাঁকা এক-খানা ছোরা বের করে অবিনের দিকে এগিয়ে চললেন। আমি চিৎকার করে অবিনকে সাবধান করতে যাব, কিন্তু কণ্ঠ সরল না, সেই ছেলেটা এসে আমার গলা এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে! সেই সাদা পাখিটা ঝট্‌পট্ করে ডানা ঝাপটে মাথার চারি দিকে ঘুরে

বেড়াচ্ছে আর অবিন তার দুই ঘুষো বাগিয়ে সেই মহাপুরুষের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কেবলই বলছে, 'গল্পে নীতিকথা অসহ্য।'

তার পর হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলো আর শব্দের মাঝে মহাপুরুষ অন্তর্ধান করলেন। আমি চমকে উঠে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে দেখলেম, জাহাজের ডেকে শুয়ে আছি ; অবিন আমার মুখে কেবলই জলের ঝাপটা দিচ্ছে : আমি যেন একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠছি। মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটা ভিজে পটি লাগানো।

এই সময় আমাদের এক উকিল সহযাত্রী অবিনকে প্রশ্ন করলেন, 'গাড়িটা যে মোটরের ধাক্কায় উলটে গেল আপনি তার নম্বরটা নিলেন না কেন ? এঁর মাথায় যে-রকম চোট লেগেছে তাতে নালিশ চলত।'

pathagar.net
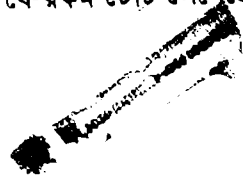
টুপি

আমাদের এ লাইনের দুখানা জাহাজের হঠাৎ সশরীরে বসোরা-লোক প্রাপ্ত হবার কারণ যে চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে কি মুখুয্যে মশায়দের পদধূলি নয়, সেটা নিশ্চয়। আজন্ম ত্রিসন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের পদরেণু মেখে, গঙ্গাজলে নিয়ত ডুবে থেকে ও গঙ্গার বাতাস সেবা করেও জাহাজ দুখানা, মায় তাদের পুরানো তক্তার ঘুণ ও বেঞ্চি-গুলোর ছারপোকা-সুদ্ধ গোলোকে না গিয়ে কেন যে বরাবর বসোরার গোলাপবাগে হাজির হয়, এর সঙ্গে অবিনের বুকের মাঝে বারোমেসে গোলাপফুলের খসে-পড়া পাপড়িগুলোর কোমল স্পর্শের কোনো যোগাযোগ আছে কি না, সেটা আবিষ্কার করতে আমি যখন খুবই ব্যস্ত, সেই সময় একদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটার স্টিমারে পাশের বেঞ্চে একটু জায়গা কোনোরকমে দখল করে চলেছি একটু হাওয়া খেয়ে আসবার আশায়। কিন্তু, দুরদৃষ্ট—এক জাহাজ বটে, কিন্তু তাতে লোক উঠেছেন প্রায় তিন জাহাজ! তার উপর খালাসি আছেন, সারেঙ আছেন, সাহেব আছেন, সাহেবের বেতে-ছাওয়া চৌকি আছেন, আর আছেন সমস্ত পুলিশ-কোর্টটি! ন স্থানং তিলধারণং! এর উপরেও বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো কোনো গৃহিণীর ফরমাস-দেওয়া আপিসের-ফেরতা-মার্কেটের ফুলকপি, শনির ভাগাদামত সা ও লা কোম্পানির গ্রীন সিল ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সব অনবরত এসে পড়তে বিলম্ব করছে না।

এই সময় অবিনকে আহিরিটোলার ঘাটে তার বাঁয়া-তবলা, গোবিন্দ চাকর আর আলবোলা নিয়ে লাল-কাপড়ে-বাঁধা বিশ্ব-

সংগীতের মোটা পুঁথি বগলে জাহাজ ধরতে দেখে, মন আমার 'হা হতোস্মি' বলে মূর্ছিত হয়ে যে পড়ে এমন-একটু স্থানও পেলে না। দাবাবোড়ের আটঘাট-বাঁধা রাজার মতো বেচারা কিস্তিমাতের অপেক্ষা করেই রইল।

বোঝাই কিস্তি আমাদের ঘাট ছেড়ে গঙ্গার মাঝ দিয়ে উত্তরমুখে আস্তে আস্তে চলছে। আশপাশের মানুষের মাথাগুলো এত কাছে এবং এত বড়ো করে দেখতে পাচ্ছি যে দূরের জিনিস, তীরের ও নীরের, কিছু আজ আর চোখেই পড়ছে না। এই মাথামুণ্ডুর উপরে কেবল দেখছি প্রকাণ্ড খোট্টাই টুপির মতো আধখানা সূর্য—যেন লাল সাটিন কেটে দর্জি সেটা এইমাত্র বানিয়ে সব মাথাগুলোতে ফিট করে নিতে চাচ্ছে।

টুপির রহস্যে মনটা আমার যখন বেশ মগ্ন হয়েছে সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে অবিন আমায় ডাকলে, 'ওহে, এ দিকে এসো।' সঙ্গে সঙ্গে অবিনের হাত এসে ছোঁ মেরে আমাকে একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের প্রথম বেঞ্চি থেকে লাস্ট ক্লাসের শেষ বেঞ্চিতে এনে উপস্থিত করলে।

চামড়ার স্ট্র্যাপে বাঁধা হোল্ড-অল থেকে চটকানো কাপড়ের স্যুটটার মতো মানুষের ওই চাপন থেকে অবিন যখন আমাকে টেনে এনে বাইরে ফেললে তখন কী যে সোয়াস্তি পেলুম! আঃ! জাহাজের এই অংশটা ফার্স্ট ক্লাস থেকে বরাবর গড়িয়ে এসে, একেবারে গঙ্গার জল আর দক্ষিণের হাওয়ার মধ্যে ডুব দিয়েছে। এখানে ভদ্রয়ানার চাপ এক আনাও নেই; খোলা বুক, খালি পা নিয়ে এখানে কাজ থেকে খালাস-পাওয়া যত খালাসি সূর্যাস্তের আলোর মধ্যে নিজেদের মজলিস সারিগানের সুরে জমিয়ে তুলেছে।

সে একটি ছোকরা—হয়তো ঠিক ছোকরা বলতে যতটা বোঝায় বয়সটা তার চেয়ে বেশি হলেও হতে পারে—কিন্তু মুখচোখ তার এখনো কাঁচা। জগতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শেষ করে দিয়ে

বিজ্ঞ হয়ে বসবার এখনো তার দেরি আছে, সেটা বুঝলুম, এবং তার মুখে এই গানটা আমার ভারি অদ্ভুত ঠেকল—

উত্তর থিকে অ্যালো বঁধু ভাঙা লায়ের গুণ টানা,
আমার বঁধু দাঁড়িয়ে আছে পুন্নিমের ওই চাঁদখানা।
বঁধুমুখের হাসি ছাখলে নয়ানজলে ভাসি,
বঁধুর কথা রসে-ভরা ঠিক যেন চিনির পানা!

কলাই-করা ডেক্চির বাঁয়া-তবলার তালে-তালে মাথা দোলাতে-দোলাতে ওই বঁধু, চাঁদ, চিনির পানা, নয়ানজল এবং উত্তর থেকে গুণ টেনে ভগ্নতরীর আসার মধ্যে সারবস্তু কিছু উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় অবিনের মাথার কালো টুপিটা উড়ে ডেকের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বেঞ্চির তলা হয়ে জাহাজ টপকে একেবারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জোগাড় করলে। অবিন তাকে মাথায় চড়ালেও টুপিটা ছিল নিতান্ত আমারই, সুতরাং আমি যখন তাকে অপমৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্যে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছি সেই সময় পিছনে হোঃ হোঃ হাসির রব শুনে ফিরে দেখলেম, সেই খালাসি ছোকরা তার দু পাটি দাঁত বের করে হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে—আমারই দিকে চেয়ে। আমার তখন রাগ করবার মোটেই অবসর ছিল না। নগদ সাড়ে সাত টাকা মূল্যের হোসেন বক্সের দোকানের নতুন টুপিটা জলে যাওয়া থেকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে আমি নিশ্চিত হয়ে অবিনের পাশে এসে বসেছি, সেই সময় সেই ছোকরা খালাসি আমাকে এসে সেলাম করে বললে—

'হুজুর, বেয়াদবি মাপ করবেন। মাথা থেকে টুপি খসে পড়লে আমি বড়ো খুশি হই। ওটা জলে গেলে আমি আরো খুশি হতুম। টুপি নিয়ে আমি অনেক ভোগ ভুগেছি। ছেলেবেলায় আমার বাপ আমাকে কখনো টুপি করতে দেন নি। তিনি বলতেন, লণ্ঠনের

উপর গোলাপ ঢাকা দিলেও যা, মানুষের মাথায় টুপি চাপালেও তা —আলো পাওয়া শক্ত হয়। টোপকে মাছ যেমন এড়িয়ে চলে, ছেলেবেলা থেকে, কী দেশী কী বিদেশী, সব টোপিকে তেমনি ভয় করে কেবলমাত্র খোদার-দেওয়া টুপিটা নিয়ে আমি বড়ো হতে লাগলুম। সেই সময়ে আমার বাপ একদিন যে কালো টোপি মাথায় পৃথিবীতে এসেছিলেন তার কালো রঙ. ধোয়া কাপড়ের মতো, এই গঙ্গাজলের ফেনার মতো, পুন্নিমার ওই চাঁদের জোছনার মতো সাদা করে নিয়ে খোদাতালার দরবারে হাজরি দিতে চলে গেলেন।

'মা তো ছিলেন না, বাপও গেলেন, এক ছেলে আমাকে অগাধ বিষয়ের মালিক রেখে। কিন্তু, বেশিদিন আমাকে অনাথ থাকতে হল না। অনেক জুটল, এ গরীবের মা-বাপ হয়ে বসবার লোক অনেক জুটল। এত জুটল যে তাদের ভিড়ে আমার সদর ও অন্দর ভরতি হয়ে শেষে আমার মালখানা তোশাখানা আস্তাবল পর্যন্ত সরগরম গুলজার হতেও বাকি রইল না। আমার মাথা খালি দেখে বাপও কোনোদিন সেটাকে টুপি ঢাকা দিতে ব্যস্ত হন নি, এবং মাও কখনো দুঃখ পান নি। কিন্তু, এরা আমার মাথায় টুপি না দেখে একেবারে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে আমার খালি মাথার পর্দা রাখবার জন্যে উঠেপড়ে লেগে গেল এবং মৌলবি সাহেবরা যতদিন-না বিচ্‌মিল্লা বলে জাঁকালো একটা খুব উঁচু টুপি আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেলেন ততদিন এরা কিছুতেই ঠাণ্ডা হয় না। টুপিটা বাইরে খুব জমকালো, জরি-জরাবতের কাজ, আর ভিতরটায় গাধার চামড়ার গদি লাগানো। তারা এমন চমৎকার করে সে টুপিটা বানিয়েছিল যে, টুপি পরা কোনোদিন অভ্যাস না থাকলেও সেটা পরতে আমার কোনো কষ্টই হল না।

'নতুন গোঁফ উঠতে আরম্ভ হলে যেমন সময়ে অসময়ে সেটাতে তা না দিয়ে থাকা যায় না, তেমনি এই টুপিটাকে যখন-তখন মাথায় দিয়ে আমি বেড়াই। টুপির গুণে আমার মুখ দেখতে দেখতে বুড়োদের মতো গম্ভীর, আমার কথাবার্তা চালচলন খুব পাকা আর

pathagar.net

মাথার সামনের চুল উঠে গিয়ে কপালটা আমার খুবই চক্‌চকে ও চওড়া হয়ে উঠল। ওই টুপিটা দেখলেই রাস্তার লোকেরা আমাকে খুব বুদ্ধিমন্ত শ্রীমন্ত এবং আরো কত কী বলে দু হাতে সেলাম ঠুকতে লাগল, আর তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের ঘটকালি নিয়ে দুবেলা মহল-ভরা আমার মা-বাপেদের পায়ে তেল দেবার জন্যে হাজির হতে লাগল।

'এতগুলো মাথা একত্র হয়ে আমার বিয়েটা কী রকম সর্বগ্রাসী ধুমধামের সঙ্গে যে দিয়েছিল তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন। এতগুলো শ্বশুর-শাশুড়ির মন জুগিয়ে চলতে আমার স্ত্রীর সে কী যমযন্ত্রণা! বিয়ের হিসেবের খাতা চুকতে না চুকতে বেচারা প্রাণত্যাগ করলে। আর, সাতরাজার ধনে ধনী আমাকে মাথার টুপি ভিক্ষের ঝুলির মতো করে বোগ্‌দাদের রাস্তায় রাস্তায়, মাদ্রাসা থেকে মাদ্রাসায়, উমেদারি করে ফিরতে হল। টুপিকে আমার কেউ অনাদর করলে না বটে, কিন্তু টুপি যার মাথায় বাসা বেঁধেছিল সেই টাকার মতো একটি গোল টাক-ওয়ালা মানুষটিকে দেখলেম কেউ খাতিরেও আনতে চাইলে না সেই দুঃখের দিনে।

'কতকাল টুপি-পরার এই ফল—অনেক তদবিরের এই টাক—একে আবার সেই টুপিতে ঢেকে বোগ্‌দাদ ছেড়ে আমি বসোরার দিকে রওনা হলেম। যদি কেউ না জোটে তবে টুপির একটা দোকান খুলে দেশসুদ্ধকে টুপি পরিয়ে তবে ছাড়ব। অবিশ্যি, এ বুদ্ধিটা বোগ্‌দাদে থাকতে থাকতে আমার মাথায় জোগালে হত ভালো। কিন্তু কে জানে, ওই টুপির গুণে কিম্বা যে লম্বাকান জানোয়ারের চামড়া দিয়ে সেটা আস্তর করা ছিল তারই গুণে, বুদ্ধিটা যখন আমার মাথায় এল তখন বোগ্‌দাদ থেকে অনেক দূরে বসোরায় এসে পৌঁচেছি। এখানে কেউ টুপি মাথায় দেয় না। গোলাপ ফুলের পাপড়ির গোড়ে মালা গেঁথে তারা পাগড়ির মতো কিম্বা আপনাদের ওই শিবঠাকুরের সাপের মতো কেবল মাথায় জড়িয়ে রাখে। বোগদাদে আমার মতো সুপুরুষ কমই ছিল; এখানে

দেখলেম আমার মতো সুপুরুষকে কেউ বিয়েই করতে রাজি হয় না। তার উপর মাথার মাঝে ছিল সেই টাকা-প্রমাণ টাকটি। সেখানে কেউ টুপি পরে না, সেখানে সর্বদা টুপি দিয়ে টাক ঢেকে যে কী আতঙ্কে আর অসোয়াস্তিতে দিন কাটাতে লাগলেম তা কেমন করে জানাব। আমার কেবলই মনে হত, বসোরার এই গোলাপফুলের খোস্‌বোতে ভরা জোর বাতাসে যেদিন আমার এ টুপিটা উড়ে যাবে, সেদিন গাধার রোঁয়ার আস্তরের আওতায় টাক-পড়া মাথাটা আমি কোন্‌খানে গিয়ে লুকোব। বসোরায় যেমন গোলাপফুল তেমনি গোলাপি ঠোঁটের মধুর হাসিও অনেক—সেই হাসির তুফানের ঝাপটা থেকে টাক বাঁচাতে আমাকে কী ভোগই না ভুগতে হচ্ছিল। টুপিটা আমার মাথার কুরুনি পোকার মতো; তাকে টেনে ফেলতে পারা শক্ত, তাকে রাখলেও যন্ত্রণার অন্ত নেই।

এই সময় যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা—আমি প্রেমে পড়লেম। আসকের আগুন যদি মগজেই জ্বলত তবে সেটাকে টুপি চাপা দিয়ে সহজেই নেবাতে পারতেম। কিন্তু, সে যে খোদার নিজের হাতে জ্বালা বাতি, টুপি দিয়ে তাকে নেবানো চলে এমন জায়গায় তিনি তাকে রাখেন নি। তুনিয়াকে রোশনাই দিতে সে-বাতি তিনি জ্বালিয়েছেন বুকের মাঝখানে প্রাণের সঙ্গে এক-শামাদানে। সেই বাতির আলোয় যাকে আমি ভালোবাসলেম তাকে কী সুন্দরই না দেখলেম। যদিও সে বসোরার গোলাপবাগের খুব ছোটো ফুল বৈ বড়ো ফুল ছিল না। সেইদিন আমি সর্বপ্রথম খোদাতালার কাছে হাত পেতে ভিক্ষে চাইলুম—আমার ছেলেবেলাকার সেই কাঁকড়া-চুল খালি মাথা। হাসবেন না, বাবু। সবাই চায় খোদার কাছে বড়ো হতে; আমি বললেম, 'আমায় ছোটো করো।' তুনিয়া ছিষ্টি হয়ে এমন ভিক্ষে শুধু কি আমিই চেয়েছি? কত লোক চেয়েছে, পেয়েছে, এখনো চাচ্ছে, দেখুন না—,

আমি সেই ছোকরার কথায় নদীর পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখলেম, পৃথিবীর মাথার উপর থেকে সেই লাল মখমলের বড়ো টুপিটা সরে

pathagar.net

গেছে, দিগন্তের শিয়রে কালো মেঘ এসে লেগেছে, আর নদীর পুবপারে চাঁদনী রাতের নতুন জ্যোৎস্না—তারই তলায় গাছের আড়ালে একটি মন্দিরের ঘাটে বাঁশিতে সাহানার সুর বাজছে।

সেই নতুন রাতের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে জাহাজ এসে বড়োবাজারের ঘাটে লাগল। আমি অভ্যেসমত অবিনের কাছ থেকে আমার টুপিটা চাইতেই সে অবাক হয়ে বললে, 'সে কী। তোমার পাশেই তো সেটা ছিল।'

জাহাজ থেকে অনেকগুলো টুপিওয়ালা নেমে গেল, কেবল আমরা দুই বন্ধুতে নামলেম খালিমাথা। তার পরদিন সে জাহাজখানাও বসোরায় চলে গেল। গল্পের শেষটা শোনবার ইচ্ছা থাকলেও সে ছোকরার আর দেখা পেলুম না।

pathagar.net

দোশালা

শালখানা দেখতে সচরাচর যেমন হয়, একখানা জরদ কালো সবুজ আর লাল রঙের চারবাগ। কিন্তু সেখানি প'রে স্টীমারের ফার্স্ট ক্লাসের বেঞ্চিতে এসে যে বসল তার চেহারাটা মোটেই সেই কাশ্মীরি শালের উপযুক্ত ছিল না—খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁপ, মাথাটা কিটকিটে ময়লা পাগড়িতে ঢাকা, গালের হাড়দুটো উঁচু, আর তারই কোটরে শুকনো আঙুরের-রঙ দুটো বিশ্রী চোখ। অবিনের দস্তুর, নতুন লোক দেখলে সে তার দিকে খানিক কটমট করে না তাকিয়ে থাকতে পারে না। সেদিনও বেঞ্চিখানার সামনে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচেক সেই লোকটাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে তবে অবিন আস্তে আস্তে আমার পাশে এসে বসল। তার পর এ-ঘাটে ও-ঘাটে সে-ঘাটে ভিড়তে ভিড়তে, জাহাজ লোকে লোকে ভর্তি হতে হতে, যখন আমাদের ঘাটে এসে পৌছল, সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোক অবিনকে বলে উঠলেন, 'আপনার শালখানা এখনি হাওয়ায় উড়ে গঙ্গায় পড়বে, ওখানাকে একটু সাবধানে রাখুন।'

আমরা দুজনে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম, সেই চার-রঙা চারবাগ শালের রুমালটা জাহাজের রেলিঙ থেকে ঝুলছে, সে মানুষ নেই!

শালখানা যার, সে নিশ্চয় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে নি। সুতরাং আমরা দুই বন্ধুতে নিশ্চিত মনে হাত-ধরাধরি করে আহিরিটোলার ঘাটে নেমে গাড়িতে উঠেছি এমন সময় এক ছোকরা খালাসি 'বাবু, শাল আপনার' বলেই তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা

গলিয়ে সেই শালখানা অবিনের কোলের উপর ফেলে দিয়ে চট্ করে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। আমি গাড়ি থামিয়ে সেই খালাসিকে ডাকতে যাই, অবিন বললে, 'থাক-না, কাল ফিরিয়ে দিলেই চলবে।'

বন্ধুবান্ধবের টুপি ইত্যাদির মতো টুকিটাকি জিনিস হলে আমার আপত্তি ছিল না ; কেননা সেগুলো অবিন প্রায় ধার নেয় এবং আজ বাদে কাল, নয় তো পরশু, সুদসুদ্ধ সেগুলো ফিরিয়ে দিতে কিছুমাত্র দেরি করে না। কিন্তু, এই শালখানা যার সে যে অবিনকে সেখানা বখশিশ কিম্বা একরাত্রের মতো ভাড়া দেবার মতলবে স্টিমার পর্যন্ত তাড়া করে আসে নি, সেটা ঠিক, এবং সে যে পুলিশে খবর না দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে সেটাও সম্ভব নয়। কাজেই পোর্ট-কমিশনারের হারানো-মালের আপিস-ঘরের দিকেই গাড়িটা চালাতে আমি অবিনকে বিশেষ করে অনুরোধ করলেম। কিন্তু সব বৃথা! বাঘের থাবা শিকারের উপর যেমন, তেমনি অবিনের মুঠো সেই শালখানার একটা কোণ সেই-যে চেপে রইল, আহিরিটোলার বাড়িতে পৌঁছানো পর্যন্ত সে-মুঠো আর কিছুতেই শিথিল হল না।

তার পর ঘরে ঢুকে অবিন যখন সেই শালখানা মেঝের উপরে বিছিয়ে দিলে তখন দেখলেম, কী আশ্চর্য সোনা-রুপো-রেশমের তার দিয়েই সেটা বোনা। স্টিমারে শালখানার সবটা আমার চোখে পড়ে নি। এখন বাতির আলোতে যেন একখানা নন্দনকানন আমাদের চোখের সম্মুখে এসে উদয় হল। এরই উলটো পিঠে দেখলেম বোনা রয়েছে—বীণা-হাতে এক কালো কুৎসিত ঝাঁকড়াচুল ডাইনি-বুড়ি। পরের জিনিসকে ঠিক লোষ্ট্র ভেবে নিয়ে সেটার উপরে সম্পূর্ণ নির্লোভ হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা সেটা পরখ করবার কারণ কোনোদিন আমার কাছে উপস্থিত হয় নি, কিন্তু কারিগরের হাতের অপূর্ব সৃষ্টিগুলোর উপরে আমার যে-প্রাণের টান সেটা যে অবিনের হাত থেকে এই অমূল্য শালখানা ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে না-চাচ্ছিল তা নয়।

pathagar.net

কিন্তু, অবিনকে আমি চিনতেম। কাজেই শালখানা তাকে খুব সাবধানে রাখতে আর পুলিশ-হাঙ্গামার পূর্বেই যদি সম্ভব হয় সেটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে বিশেষ করে বলে আমি বাড়ি এলেম। তার পর দুদিন আমি জাহাজে যাওয়া কামাই দিলেম। না-যাওয়ার কারণ নানা। তার মধ্যে প্রধান কারণ লালপাগড়ি আর স্টিমারের উপরে সেই শাল-হাতে অবিনের একটা অবর্ণনীয় রূপ কল্পনা।

তৃতীয় দিনের সকালে সাতটা-দশের স্টিমার আমাকে একলা নিয়ে বড়োবাজার ছেড়ে আহিরিটোলার দিকে চলেছে। সকালের রোদে ভাঁটার জল আর জলের ধারে অনেক দূর পর্যন্ত ভিজে কাদা মাজা কাঁসার মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। তারই উপরে অনেকগুলো মানুষ কালো-কালো আবলুস কাঠের পুতুলের মতো দেখছি। ঘাটের ধারে পাঁচিলে-ঘেরা শ্মশানের মধ্যে থেকে খানিকটা সাদা ধোঁয়া আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠছে। এরই উপরে দেখতে পাচ্ছি, লাল-সাদা-ডোরা-টানা তেতালা একটা বাড়ির চিলের ছাদে মাটির এক মহাদেব পিতলের ত্রিশূল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে, আর ঠিক তারই পিছনে আলোর গায়ে একটি মসজিদের তিনটে গম্বুজ—অপরাজিতা ফুলের মতো নীলবর্ণ।

আহিরিটোলার ঘাটের যে-কোণটিতে রোজ অবিন দাঁড়িয়ে থাকে সেই কোণটায়, দূর থেকে তার বিশাল বুকের মাঝে চির-বসন্তের সিগ্‌নেলের আলোর মতো বড়ো লাল-গোলাপফুলটার সন্ধানে আমার চোখ আজ দৌড়ে গিয়ে দেখছে, অবিনের জায়গায় একটা রবাব-কাঁধে একজন পেশোয়ারী—কালো লুঙ্গি, ঢিলে কোর্তা, বড়ো পাগড়ি, কটা দাড়ি, কোঁকড়ানো চুল নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

একটা বয়া প্রদক্ষিণ করে স্টিমার উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখে ঘুরে

pathagar.net

তবে আজ আহিরিটোলার ঘাটে ভিড়ল। অবিনকে না দেখে, সেদিনের সেই শালখানাই যে তার এদ্দিনের ছুটি এবং কামাই দুয়েরই কারণ, এবং পুলিস-কোর্টেই যে তাকে আটটার মধ্যে খেয়ে হাজির দিতে হচ্ছে, এটা আমি একরকম স্থির করেই নিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে একলা কবীরের পুঁথির সঙ্গে দু ঘণ্টা কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসলেম। ঘাট ছেড়ে জাহাজ আর-একবার একটা গাধাবোটের রগ ঘেঁষে পাট-বোঝাই একখানা কিস্তিকে সজোরে ধাক্কা মেরে বাগবাজারের লোহার পোল ডাইনে রেখে সোজা কাশীপুরের দিকে চলল।

খড়-বোঝাই খোলাগুলো আদিম যুগের লোমশ কতকগুলো উভচর জন্তুর মতো ডাঙার খুব কাছাকাছি কাদাজলে নিজেদের অনেকখানি ডুবিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাঙার উপরে মালগাড়ির সার যেন আর-একটা শক্ত খোলায় মোড়া বিকটাকার গুটিপোকার মতো আস্তে আস্তে চলছে। দূর থেকে কাশীপুরের জেটিটা দেখতে পাচ্ছি। সেখানে অবিন দাঁড়িয়ে—জলের নীলের উপরে, সোজা বিশাল স্থির, নিবাতনিষ্কম্পমিব। তার কাঁধ থেকে সেই শালখানা নানারঙের ফুলের একটা মস্ত গোছার মতো ঝুলে পড়েছে সুন্দর ভঙ্গিতে। আমি গুনগুন করে শুরু করেছি—

'হুয়া জব ইশ্ক মস্তানা
কহেঁ সব লোগ দিওয়ানা।'

রবাবটায় একটা মস্ত ঝংকার দিয়ে পিছন থেকে সেই পেশোয়ারীটা হঠাৎ আমার পাশে এসে বসল—

'জিসে লাগি সোঈ জানা
কহেসে দর্দক্যা মানা।'

পন্‌টুন থেকে অবিন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আগাসাহেব, কাবুলি গীত ফরমাইয়ে, নেহি তো দোশালা ছোড়েগা নেহি।'

এর পরেই জাহাজ ঘাটে ভিড়তেই অবিন ঝুপ করে সেই শালখানা আমায় ছুঁড়ে দিয়ে স্টিমারে উঠে এল। আগাসাহেব

pathagar.net

তাকে একটা মস্ত সেলামবাজি করে রবাবের সঙ্গে একটা কাবুলি গান আরম্ভ করলে—

'স্নমিওসী পমঙ্গল স্নমিওসী
পদম্‌কেনা পমঙ্গল স্নমিওসী-ঈ-ঈ—'

সুরও যেমন, কথাও তেমনি বিদ্‌ঘুটে। 'পমঙ্গল' 'পমঙ্গল' যেন মশার ঝাঁকের মতো কানের কাছে কেবলই ভন্‌ভন্‌ করছে আর মাঝে মাঝে 'স্নমিওসী' সেগুলোকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্য এই যে, অবিন বেশ মশগুল হয়ে এই ভন্‌ভনানির মাঝে সুখে বসে রয়েছে। কানে কম্ফর্‌টার এবং তার উপর সাতপুরু চাদর জড়িয়ে একটি রোগা ছেলে—এই কম্ফর্‌টার ছাড়াবার জন্যে আমি তাকে রোজ ধমকাতে ছাড়ি নে, কিন্তু আজ তাকে দিব্য হাস্যমুখে সামনের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে আমার কী হিংসেই না হচ্ছিল! শ্রবণের দরজায় আগল টেনে ছোকরা আজ কী সুখেই আছে সুর-বেসুর সবার থেকে দূরে! নিবিড় নীরবতার অন্দরে আপনাকে ডুবিয়ে রাখবার আমার প্রার্থনাটা বোধ হয় বিনা-তারের টেলিগ্রাফের মতো মা গঙ্গার কাছে পৌঁছে থাকবে, তাই রবাবের সুরটা বালির ঘাটে পৌঁছবার কিছু আগেই একটা তার-কাটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হল কাবুলি গানের মাথায় যেন বজ্রাঘাত করে। অমনি হুস্‌ করে একটা হাওয়ায় চারি দিক থেকে শোনা গেল, 'বস্‌!'

অবিন একটা মিলিটারি-রকম সেলাম দিয়ে আগাসাহেবকে বললে, 'তাগা তো টুটা। অব্‌?'

'অব্‌ শুনিয়ে' বলেই আগাসাহেব আরম্ভ করলেন পোস্তু উর্দু আর হিন্দি ভাষার খিচুড়ি একটা আজগুবি গাঁজাখুরি গল্প—সেই শালখানার আদ্যন্ত কাহিনী। গল্পটা খুব গুরুপাক করেই আগাসাহেব আমাদের উপহার দিলেন, ভাষায় পেঁয়াজ রসুন আর হিঙ তিনেরই বুকনি দিয়ে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, অবিন গল্পটার খুব তারিফ করলেও আমি সেটা থেকে বড়ো-কিছু রস গ্রহণ করতে পারলেম না। মাথা তখনো আমার কাবুলির সেই বেসুরো গান আর

রবাবের ঝন্‌ঝনানিতে বিগড়ে ছিল; সুতরাং গল্পের সঙ্গে গল্পকর্তাকেও জাহান্নামে পাঠাতে আমি কিছুমাত্র ইতস্তত করলেম না, কিন্তু মনে মনে। কারণ কাবুলি-মাত্রেরই যেটা চিরসহচর, মোটা সেই লাঠি, তার সামনে মুখ ফুটে কিছু বলা একেবারেই আমার মতবিরুদ্ধ।

সকালের গঙ্গার পরিষ্কার পটখানির উপর হিজিবিজির মতো এই লোকটার গল্প আর গান। সেটা শেষ করে সে যখন কটা দাড়ির আড়াল থেকে বত্রিশটি দাঁত বের করে বললে 'বাবু, শাল দেও, অব্ হাম চলে', তখন অবিন খুশির সঙ্গে তাকে সত্যিই সে শালখানা দিয়ে দেয় দেখে আমি আর রাগ সামলাতে পারলেম না। ঝাঁ করে অবিনের হাত থেকে শালখানা টেনে নিয়ে বললেম, 'তুমি কেমন হে! কার শাল তুমি কাকে দাও? কোথাকার একটা জোচ্চোর মিথ্যে বকর-বকর করে ফাঁকি দিয়ে এই দামী শালটা নিয়ে যাবে, এ হতেই পারে না।'

অবিন আমার ব্যবহার দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল। কাবুলিটা হুংকার দিয়ে বলে উঠল, 'ক্যা বাবু, হাম জুয়াচোর হ্যায়?'

আমার রাগ তখন সপ্তমে, সুতরাং গলাটাও সেই সুরে বললে, 'যেন কাবুলের আমীর রে! যাঃ যাঃ! আর শাল পরতে হবে না! এটা আমার শাল হ্যায়! জানতা এখনি তোম্‌কো পুলিসকা হাতে জিম্মে করে দেগা!'

রাগের মাথায় বিদ্যাসাগরী বাংলা একেবারে হারিয়ে ফেলে গড়গড় করে চলতি বাংলাতে আমি তাকে যাচ্ছেতাই বলে গেলেম। কে জানে, চলতি ভাষার অ্যাক্‌সেন্টের জোরেই হোক বা বালির ঘাটে লালপাগড়ির জীবন্ত অ্যাক্‌সেন্টটাকে দেখেই হোক, কাবুলিটা তার গেলাপ-মোড়া রবাবটাকে কাঁধে তুলে চোঁ চোঁ চম্পট দিলে— সোজা পন্‌টুন বেয়ে লেলুয়ার মুখে। আমি তখন খুব গম্ভীর হয়ে শালটা নিজের কাঁধে ফেলে আপনার জায়গায় স্থির হয়ে বসলেম। গঙ্গার বাতাসে রাগ ঠাণ্ডা হতে আমার বেশিক্ষণ লাগল না।

pathagar.net

অবিন দেখলেম, দুই চোখ নিমীলিত করে সম্পূর্ণ ধ্যানস্থ। গাল খেয়ে কাবুলিটা আমায় যদি খুনও করে যেত তবু তার চোখ খুলত কি না সন্দেহ। এমনি খুব চেপে দুই চোখ বন্ধ করে সে পৃথিবীর গণ্ডগোল থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে চলেছে সেটা আমি বেশ জানি এবং সে এই চোখ যখন খুলবে তখন যে ধমকের অগ্নিবাণটা আমার উপরেই প্রথম পড়বে তাও আমি জানতেম। আমি আর তিলার্ধ বিলম্ব না করে শালখানি আস্তে আস্তে তার পাশে রেখে পাশ কাটিয়ে একটু দূরে বসলেম ; যেন প্রথম চোখ খুলেই শালখানাকে অবিন দেখতে পায়—পোড়ে তো শালখানাই পুড়ুক, আমি কেন মরি। যা ভেবেছিলাম তাই। শালখানা চোখে পড়তেই অবিন সেটাকে সজোরে গঙ্গার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বসন্তের ফুলে-ফুলে-বিছানো ফুলশয্যার চাদরখানার মতো সেই অপূর্ব শালটি উড়তে উড়তে গিয়ে জলে পড়ল দিগ্‌বিদিক যেন আলো করে।

আমি বললেম, 'ওহে করলে কী?'

'পরের জিনিস লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করলেম, যার জিনিস তাকে জোচ্চোর বলে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে নিজের পকেটে সেটা না পুরে।'

বলেই অবিন আমার দিকে কট্‌কট্ করে চেয়ে রইল। আমি এতক্ষণে বুঝলেম, শালখানা কাবুলিকে নিয়ে যেতে বাধা না দিলে জুয়াচুরির কলঙ্কটা কাবুলি পর্যন্তই থাকত, আমার গায়ে গড়িয়ে লাগত না। অবিন পুলিস কাবুলি এবং বাটপাড়ির কলঙ্ক তিনটে থেকে বেঁচে গেল ; ধরা পড়লুম আমি, জয়মিত্রের ঘাটটার ঠিক আড়পারে।

তার পর থেকে বসন্তের হাওয়ায় আমি রবারের ছেঁড়া তারের টংকার শুনতে পাচ্ছি, আর সেই শালের উলটো-পিঠে-লেখা ডাইনি-বুড়ির কাঁচা-পাকা চুলের ঢেউটাই গঙ্গার নির্মল স্রোতকে ঘোলা

pathagar.net

করে দিয়েছে দেখছি। পাকা ধানের সোনায়, কচি ঘাসের সবুজে, দিনের উদয়-অস্তের রক্তে, রাত্রির ঘুমের অন্ধকারে ছোপানো চার-বাগ শালখানা ফুলের ভেলাখানির মতো ভাসতে ভাসতে আর-কোনোদিন যদি নতুন করে আমার চোখে পড়ে তবে আবার তার কথাটা তুলব। না হলে এই পর্যন্ত।

pathagar.net

মাতু

আজকের সকালটা একেবারে কুয়াশায় ঢাকা। এমন কুয়াশা এ শীতে একদিনও হয় নি। জল স্থল আকাশ দুধে-গোলা আলোর মধ্যে ডুবে রয়েছে ; যেদিকে দেখি মনে হচ্ছে, যেন নাকের সামনে প্রকাণ্ড একখানা ঘষা কাঁচ ঝুলছে। জাহাজের সব বেঞ্চিগুলো শিশিরে ভিজে উঠেছে ; কোথাও একটু বসবার স্থান নেই। সাতটা-পঞ্চাশে জাহাজ ছাড়বার কথা, আটটা-পঁচিশ হয়ে গেল তবু আজ সহযাত্রী কারো দেখা নেই। জাহাজের সারেঙ কান-ঢাকা টুপি, পশমের পাঁচরঙা গলাবন্ধ আর লক্ষ্ণৌছিটের ময়লা একখানা বালা-পোশ জড়িয়ে একটা মেছুনির ঝুড়ি থেকে বেছে বেছে ভালো মাছগুলি লাল রঙের একটা বালতিতে নিজের জন্যে তুলছে। জাহাজ আজ ঘুমন্ত হাঁস ; যেন ডানার ভিতর মুখ গুঁজে জলের ধারটিতে স্থির হয়ে রয়েছে। আমি ওভারকোটের কলারটা দুই কানের উপরে বেশ করে টেনে দিয়ে বসে রয়েছি। বাদলার দিনে স্কুলের খালি বেঞ্চখানায় বসে যেমন, ঠিক তেমনি আজ মনে হচ্ছে, গাড়ি পাই তো বাড়ি পালাই। এমন সময় সামনের কুয়াশার ভিতর থেকে শুনলুম কচি গলায় কে ডাকলে, 'মা !'

বড়োবাজারের এই ঘাটটা—যেখানে সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যাস্তের অনেক পরেও কর্মকোলাহলের বিরাম নেই, সেখানে আজ সব জাহাজগুলো ভেঁপু থামিয়ে কুয়াশার ভিতরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কী রকম নিঝুম তা বুঝতেই পারছ। এরই মধ্যে কচি গলার সেই 'মা' শব্দ, সে যে আমার অন্তরের অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছল তা কি আর বলতে হবে। আমি যেন ঘুম থেকে

চমকে উঠে সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম—ঠিক আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের ডেকের দিকে মুখ করে দুখানা বড়ো বড়ো দোতলা জাহাজ দুটো প্রকাণ্ড গোল-বারান্দা নিয়ে কুয়াশা ঠেলে আধখানা বার হয়েছে। একটা বারান্দার নীচে বড়ো বড়ো ইংরিজি কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে 'মাতু', আর-একটায় 'কুয়িস্তান'। শেসের জাহাজ-খানায় লোক দেখলেম না; কিন্তু মাতু বলে যে জাহাজ তার ওই বারান্দার নীচে যেখানে জাহাজের রান্নাঘর সেখানে দেখছি, ঝকঝকে কতকগুলো তামার ডেকচির কাছে বসে নীল-পাজামা-পরা একটা ছোকরা খালাসি রঙকরা একটা পাখির খাঁচা বেশ করে জল দিয়ে ধুচ্ছে। ঠাণ্ডা জলের ছিটে যতবার পরছে ততবারই খাঁচার পাখি সে 'মা' 'মা' বলে চিৎকার করে উঠছে, আর সেই ছোকরা খালাসি তাকে কথ্য এবং অকথ্য ভাষায় গাল পেড়ে চলেছে।

পাখি পোষবার শখ আমার চিরদিনই আছে, তার উপর পড়া-পাখি। আমি একেবারে আমাদের ডেকের নাকের ডগায় গিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের আর পাখির রঙ্গটা দেখে নিচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে অবিন আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে বললে, 'পাখিটা ভালো করে দেখবে তো আমার সঙ্গে এসো।'

আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে অবিন আমাকে আবার বললে, 'এই ঠাণ্ডায় কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ? আমাদের এ জাহাজ সাড়ে-নটার আগে ঘাট ছেড়ে নড়ছে না। চলো, ওই জাহাজখানার বুড়ো মালেকের সঙ্গে বেশ আলাপ আছে, সেখানে বসে বেশ আরামে তামাক খাওয়া যাবে আর গল্পগুজবও হবে। মীরসাহেব লোক বেশ। আলাপ করে খুশি হবে। আর ওই 'মাতু' জাহাজখানার মতো অমন জাঁকালো জাহাজ আর নেই, আগাগোড়া গিল্‌টি আর আয়না দিয়ে মোড়া। ওর ক্যাবিনগুলো দেখবার জিনিস।'

আমি অবিনের সঙ্গে আর-একটা প্রকাণ্ড জেটি আর পাটের গোডাউন পেরিয়ে মাতু জাহাজে গিয়ে উঠলুম। জাহাজ তো নয়, যেন একটা প্রকাণ্ড বাড়ি জলে ভাসছে। এক-একটা ডেক যেন

pathagar.net

এক-একটা কন্‌গ্রেসের প্যাণ্ডাল, এ দিক থেকে ও দিকে নজর চলে না। পিতলের চাদর আর রবার-সিট দিয়ে মোড়া দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে, আমার দৈত্যপুরীর সাতমহলের মতো। সোনা আর স্ফটিকে মোড়া সেই জাহাজের ক্যাবিনগুলো একে-একে দেখে বেড়াচ্ছি, এমন সময় এক খালাসি এসে বললে, 'মীর-সাহেব আপনাদের ছেলাম দিয়েছেন।'

আমি অবিনের সঙ্গে মীরসাহেবের খাস-কামরায় গিয়ে দেখলেম, এক বুড়ো নাখোদা নেওয়ারের এক খাটিয়ায় বসে তামাক টানছেন; পাশে এক-ডাবা পানের খিলি। তাঁর পিছনে খোলা জানলার কাঁচের ভিতর দিয়ে পাটের গোডাউনের টিনের ছাদের একটা আবছায়া দেখা যাচ্ছে। দস্তুরমত আদর-আপ্যায়নের পর মীরসাহেব অবিনের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'এবার অনেকদিন পরে এ অঞ্চলে এলেম। সেই দু বছর পূর্বে আপনার সঙ্গে দেখা, আর আজ এই।'

অবিন আমাকে দেখিয়ে বললে, 'এই বন্ধুটিকে আপনার কাছে নিয়ে এলেম। এঁর বড়ো পাখির শখ; এঁর জন্যে সিঙাপুর থেকে এবার একটা কাকাতুয়া এনে দিতে হবে। যা হোক, এবার আপনার সফরের গল্পটা বলুন।'

বলেই অবিন খপ্‌ করে মীরসাহেবের বিনা অনুমতিতে ডাবা থেকে এক-থাবা পান তুলে নিয়ে দুটো নিজের গালে আর গোটা-চারেক আমার হাতে গুঁজে দিয়ে চোখ বুজে সোজা হয়ে বেশ জমিয়ে বসল। আমি পান-ক'টা হাতে নিয়ে ইতস্তত করছি দেখে মীরসাহেব বললেন, 'পান খান, না হলে গল্প জমবে না।'

বলেই মীরসাহেব শুরু করলেন—

'এ দিকে সিঙাপুর-হংকং, ও দিকে সেকেন্দ্রা আর কুস্‌তুন্‌তুনিয়া এইটুকুর মধ্যে কত ঘাটেই না আমার জাহাজ ভিড়ল। দিনে-রাতে সুদিনে-দুর্দিনে আলোতে-অন্ধকারে এই পঁচাশি বৎসর কত নদীতেই

pathagar.net

না পারি দিলুম, কত দরিয়াই না পার হলুম! কিন্তু, এই ভাগীরথী, এ আমার মনকে কেমন যে টানে তা আমি বোঝাতে পারব না। এই গঙ্গাতীরেই আমার জন্ম, আর এই বাংলার মাটিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমার কবর এই মাটিতে কি দরিয়ার অগাধ জলের নীচে খোদাতালা ঠিক করেছেন, তা তিনিই বলতে পারেন। কিন্তু আমার মন চায় যে, এই নদীর ধারে যেন আমার শেষ যাত্রার জাহাজখানা এসে ভেড়ে। কাল বোশেখির ঝড়ের আগে আগে তুফান ঠেলে যখনি যেখানে আমি জাহাজ চালিয়েছি তখনি এই নদীতীরের ছবি, একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় সবুজ শেওলায়-ছাওয়া আমার নিজের কবরের ছবিটি, আমার মনে জেগেছে। ঘরের ছবিটি আমার বাংলাদেশের সঙ্গে গাঁথা নেই। এখানেই আমাদের ঘরবারি ছিল কিন্তু সে কেমন ছিল, নদীর এ পারে ছিল কী ও পারে, তা আমার কিছু মনে পড়ে না। ঘরে আমার কেই-বা ছিল—ভাইবোন কাউকে মনে নেই। কেবল মনে আছে মাকে। অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে তাঁর রূপ, আর কিছু না। এইটুকু আমার খুব ছেলেবেলার স্মৃতি, বোধ হয় যখন মায়ের কোলে মানুষ হচ্ছিলেম তখনকার।

'এর পর থেকে ঘটনাগুলো অনেকটা স্পষ্ট করে আমি দেখতে পাই। তখন আমার বয়স কত বলতে পারি নে, গঙ্গার উপরে কতকগুলো কালো-কালো ডিঙি ছড়িয়ে পড়েছে, আমি তীরের উপরে বসে 'মা' 'মা' বলে চিৎকার করে কাঁদছি। পরনে আমার একটুকরো কাপড় নেই; মুঠোর মধ্যে আমার দুটো টাকা। টাকা-দুটো রেলের টিকিট কেনবার জন্যে—এটুকু আমার বেশ মনে আছে। তার পর এক সন্ন্যাসী—তার মাথায় জটা, গায়ে ছাই, কটা-কটা দাড়িগোঁফ—সে আমাকে এসে বললে, 'বেটা রোতা কাহে?' আমি তাকে কেঁদে বললেম, 'আমাকে মায়ের কাছে দিয়ে এসো, আমি দিল্লি যাব।' সন্ন্যাসী একটু হেসে আমার কাছে টাকা আছে কিনা শুধোলেন। আমি তাঁর হাতে আমার

pathagar.net

টাকা-দুটো দিয়ে দিলেম, আর তাঁর হাত ধরে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকলেম। তার পর কী হল মনে পড়ে না। আমার জীবনের ঘটনাগুলোর মধ্যে আর-কোথাও ফাঁক নেই—এইটুকু ছাড়া।

'এর পরে একদিন নতুন কাপড় পরে, দিল্লি যাব বলে লোটা-কম্বল পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা টিনের ছাদের নীচে কাঠগড়া-দেওয়া একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমরা চারি দিকে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেবুড়ো, আরো কত লোক; কেউ বসে, কেউ আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘরখানার দুটো লোহার থামের মাঝ দিয়ে গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছে। এমন সময় ঠিক এমনি একখানা বড়ো জাহাজ এসে সেই ঘরখানার গায়েই লাগল। সেটা এত বড়ো যে, মনে হল না যে জলে আছে। একটা সাহেব এসে আমাদের সবার হাত-পা বুক-পিঠ টিপে টুপে দেখে বড়ো একখানা কাগজে কী লিখে দিয়ে গেল, আর অমনি কাঠগড়ার দরজা দিয়ে হুড়হুড় করে লোক গোরুর পালের মতো জাহাজে গিয়ে উঠল। সন্ন্যাসী আমার পিঠ-চাপড়ে বললে, 'যা, বেটা, দিল্লি!' বলেই আমার হাত ধরে জাহাজে উঠিয়ে দিলে। আমি জাহাজে উঠেই ফিরে দেখলেম সন্ন্যাসী ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেছে। দিল্লি যাবার উৎসাহে আমার মন এতক্ষণ আনন্দে দুলছিল. সন্ন্যাসীকে লুকোতে দেখে হঠাৎ যেন আমার ভিতরটা একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। কতক্ষণ এমন ছিলেম বলতে পারি নে, হঠাৎ একসময় জলে হুস্‌হুস্‌ শব্দ শুনে চমকে দেখি জাহাজ চলছে; আলো-অন্ধকারে জলের উপরটা যেন বোরা সাপের পিঠের মতো দেখাচ্ছে। একটা সাদা টুপি ও খয়েরি কোর্ট-পরা কালো সাহেব এসে আমাকে জাহাজের এক দিকে টেনে বসিয়ে দিলে। সেখানে একদল মেয়েমানুষ আমাকে দেখে হঠাৎ চিৎকার করে বুক চাপড়ে, কেউ বেটার নাম করে, কেউ 'বাপ' বলে, কেউ 'ভাই রে' বলে কাঁদতে

লাগল। সাহেব তাদের এক ধমক দিয়ে চলে গেল। সেই-সব সহযাত্রীর কথায়-বার্তায় জানলেম, এখানা কুলির জাহাজ। কিন্তু তখন আমি এত ছোটো যে কুলি কাকে বলে বুঝতেম না। সেই নদীর জল, আকাশের আলো, দূরে দূরে তীরের বন, বালির চড়ার উপরে সূর্যের উদয়-অস্ত দেখতে দেখতে ক'দিন আমার আনন্দে কেটে গেল।

'তার পর চা-বাগানের ইতিহাস। সেখানে মানুষের মেরুদণ্ড মানুষ হয়েও কেমন করে যে তিলে তিলে মুচড়ে মুচড়ে ভাঙে তা দেখেছি; মানুষের উত্তপ্ত রক্ত চাবুকের চোটে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে কী করে যে মানুষ ভারবাহী জীবের মতো মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে পরের বোঝা টানতে টানতে শেষে একদিন তপ্ত বালির উপরে মুখ গুঁজড়ে, বুক ফেটে মরে—তাও দেখেছি; কিন্তু তবু ঘর মনে হলে এই চা-বাগানের ছবিটাই আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে। এখানে দুঃখও অনেক, সুখও অশেষ। মায়ের সন্ধানে এখানে এসে, শিশুকালে মাকে না দেখে আমার কী যে কান্না প্রাণের ভিতর গুমরে উঠেছিল তা বোঝানো যায় না। আবার যেদিন এক-একদল ছেলেহারা মা আনারসের কাঁটাগাছের বেড়ার আড়ালে তাদের কাদামাখা রোগা হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দুপুরের রোদে পোড়া মাটির উপরে চোখের জল ফেলত, যখন কোনো-কোনো দিন রাঙা শাড়ি, গালার চুড়িপরা ছোটো এক-একটা কালো মেয়ে চায়ের পাতা ছেঁড়বার সময় হঠাৎ আমার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'ভাই' বলে আমার গলা জড়িয়ে ধরত, তখনকার সুখ—সে তো বর্ণনা করা যায় না! তার পর, বসন্ত-কালে যখন ফুলে ফুলে, পাখির গানে, সোনার রোদে, সবুজ পাতায় বাগানে চারি দিকের বন ভরে উঠেছে, তখন কাজের অবসরে যখন এক-একবার চেয়ে দেখেছি তখনই যে আমার মাকে না দেখে আমি থাকতে পারি নি। ষাট বছরের মধ্যে আমার শরীর-মন এক-দিনের জন্যে অবসন্ন হতে দিই নি। এ-শক্তি আমার নিজের মধ্যে ছিল

pathagar.net

না, কিন্তু আমার মা যিনি, তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন। এইজন্যে বাগানের সাহেব-মালিক আমায় ভালোবেসেছিলেন, আর মরবার সময় আমাকে তার চা-বাগানখানা লিখে দিয়ে গেল। তার আর কেউ ছিল না। সে ভালো বাসবার মধ্যে একমাত্র বাগানের কাজকে এবং সেই কাজ চালাতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত আমাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু সাহেব ভুল বুঝেছিল। আমি বাগান-খানাকে ভালোবেসেছিলাম—তার কেয়ারি-করা সাজানো চায়ের গাছগুলোর জন্যে নয়—ওই কাঁটাগাছের বেড়ার ধারে ধারে যে স্নেহ-ভালোবাসার লতাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছিল তারই জন্য। ওই বনের গাছ যেখানে ঝুঁকে প'ড়ে মায়ের মতো পাথর ধুলোকে চুম্বন দিত, সেই ছায়াশীতল বনপথগুলির জন্য আমি আমার সমস্ত ভালোবাসা পুষেছিলাম ষাট বছর ধরে। চা-বাগানের ঠিক মাঝে, বাগানের যিনি মালিক তিনি নিজের কবর নিজেই বানিয়ে গিয়েছিলেন—কালো পাথরের ছুঁচোলো একটা পালিশ-করা থাম, তার গায়ে সোনার অক্ষরে বড়ো বড়ো করে তাঁর নাম আর জন্মের তারিখ। তারই গায়ে তাঁর মরণের তারিখ লিখে আমি আমার বাগানের কাজ বন্ধ করলুম।

'শেষ-কুলির দল মাদল বাজাতে-বাজাতে বন্দরের দিকে, দেশের জাহাজ, ঘরমুখো জাহাজ ধরতে চলে গেছে। সন্ধ্যাবেলার চাঁদ, নীরব বাগান, নিঝুম বনের গায়ে চমৎকার আলো ফেলেছে। আমি ঘরে আলো নিভিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময় মাথার উপরে কচি গলায় কে ডেকে গেল, 'মা, মা, মা!' তার পর ছায়ার মতো একটা কে আমার ঘরের দরজা দিয়ে বনের দিকে ছুটে গেল, মনে হল একটি ছোটো ছেলে। আমি লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লুম। বনের ধারে যেখানে একটা গুহা, যেখানে অন্ধকার মুখ-মেলিয়ে রয়েছে, সেইখানে সেই ছোকরার দেখা পেলুম। সে একজন কুলি।

'আমি তাকে শুধোলুম, 'সবাই গেল, তুই যে এখানে?'

pathagar.net

'সে বললে, 'মা পালিয়েছে, তাকে ছেড়ে আমি যাই কেমন করে ?'

'আমি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছি কোথায় তার মা, এমন সময় ছেলেটা চেঁচিয়ে বললে, 'মীরসাহেব, ওই যে মা !'

'অন্ধকারে একটা ফুলের ডাল গুহার মুখে ঝেঁপে পড়েছে দেখলেম, আর কিছু না। ছেলেটা অকথ্য ভাষায় তার মাকে উদ্দেশ করে গাল পাড়ছে শুনে আমি যখন অবাক হয়ে রয়েছি, সেই সময় একটা কালো পাখি উড়ে এসে তার কাঁধে বসল—'

মীরসাহেবের গল্পে বাধা দিয়ে আমি বললেম, 'গোল-বরান্দার নীচে সকালবেলায় আপনার এই জাহাজে ঠিক তেমনি একটা ছেলেকে আমি দেখেছি।'

মীরসাহেব হেসে বললেন, 'সে আমারই সঙ্গে আছে বটে। ছেলেটা সেই কালো পাখিটাকে দুই মুঠোর ভিতরে নিয়ে তাকে কেবলি চুমু খাচ্ছে আর গাল পাড়ছে ; আর পাখিটাও বলছে, 'মা, মা, মা !' এমন সময় বন্দর থেকে শুনলেম কুলির জাহাজ বাঁশি বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ছেলেটাকে বললুম, 'জাহাজ তো বেরিয়ে গেল, তুই এখন কেমন করে দেশে যাবি ?'

'ছেলেটা আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললে, 'দেশ তো আমার নেই।'

'তবে জাহাজে চড়ে কোথায় যাচ্ছিলি।'

'যেখানে সবাই চলেছে।'

'আমি ছেলেটাকে আমার সঙ্গেই রাখলেম। 'মীরসাহেব, আপনার দেশ কোথায়' এই প্রশ্ন করলে আমি ছেলেটাকে বলি, 'দেশ নেই।' সে এখনো জানে, এই জাহাজে করে সে আর আমি আমাদের দেশ খুঁজতে বেরিয়েছি।'

pathagar.net

আমি মীরসাহেবকে বললুম, 'ছেলেটা পাখিকে অমন অকথ্য

ভাষায় গালাগালি দেয়, আপনি ওর কাছ থেকে পাখিটা কেড়ে নিয়ে ধমকে দেন না কেন? আহা, পাখি যে এমন সুন্দর 'মা' বলে ডাকে, এ আমার কখনো শোনা ছিল না।'

মীরসাহেব বললেন, 'বাবুজি, ওই ছেলেটারই কচি গলার 'মা' সুর, পাখিটা সেই চা-বাগানের বুড়ো দুঃখের কান্নার মাঝ থেকে শিখে নিয়েছে—ছেলেটার সবটাই গালাগালিতে ভরা নয়।'

এমন সময় সেই ছেলেটা নীল কোর্তা পরে ছুটে এসে আমাদের বললে, 'আপনাদের জাহাজ এখন ছাড়বে, শীঘ্র যান—কুয়াশা কেটে এখন রোদ উঠেছে।'

'মাতু' জাহাজের পাশ দিয়েই আমাদের জাহাজ বেরিয়ে গেল। দেখলেম, মীরসাহেবের জাহাজের তিনটে চোঙা দিয়ে পাখির বুকের পালকের মতো হাল্কা সাদা ধোঁয়া আকাশে উঠছে। ফিরে এসে যখন আবার আমাদের জাহাজ ঘাটে লাগল, তখন মীরসাহেবের জাহাজ যেখানে ছিল সেখানে মস্ত একটা ফাঁক দেখলুম। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কুলির দল পাটের বোঝা বয়ে পিঁপড়ের মতো সার দিয়ে মাল-খানার দিকে চলেছে; আর, একটা সোনার টুপি মাথায়, সাহেব ছড়ি হাতে তদারক করে বেড়াচ্ছে।

শেমুষি

সেদিন মান্‌থ্‌লি টিকিট রিনিউ করবার দিন; তার উপর সাগর-যাত্রীর ভিড়; স্টীমার-ঘাটে বিষম গোলমাল লেগেছে। জাহাজ ছাড়তে বিলম্ব দেখে ব্রিজের ধারে ফুটপাথের উপর যেখানে অনেক-গুলো নাগা-সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছে সেইখানে অশথগাছের তলায় আমি একটু দাঁড়িয়েছি, এমন সময় রাস্তার ও পার থেকে অবিন টিকিট কিনে হন্‌হন্‌ করে আমার কাছে ছুটে এসে বললে, 'ওহে শেমুষি দেখবে তো এসো।'

লোকের ভিড় ঠেলে জাহাজে উঠে দেখি ফার্স্ট ক্লাসে রোজ অবিন যেখানটায় বসে, সেইখানে একটা লোক; চেহারাটা বেশ গম্ভীর, পরনে লুঙ্গি, গায়ে বেড়ালের লোমের একটা আলখাল্লা। আর, তার মাথায় একটা অদ্ভুত টুপি—তেমন টুপি আমি কখনো দেখি নি—কতকটা টোপর, কতকটা পাগড়ি, কতকটা যেন বিলাতি স্ট্র-হ্যাট!

স্টীমারে উঠেই অবিন আমার হাত ছেড়ে সেই লোকটার দিকে সোজা এগিয়ে চলল। আমি দেখলেম, অবিনের দুই চোখের মাঝখানে ভ্রূকুটি বিদ্যুতের মতো চমকে গেল। অবিন যেখানটিতে রোজ বসে, লোকটা ঠিক সেইখানেই বসেছে। তিন বৎসরের মধ্যে বেঞ্চের ওই অংশটুকু থেকে অবিনকে বেদখল করেছে এমন লোক—কী সাদা, কী কালো—আমি তো দেখি নি। লোকটার কপালে কী আছে ভেবে আমি বেশ-একটু চিন্তিত হয়েছি; এমন সময় অবিন দেখি 'ইয়েঃ সম্‌স্‌' বলে লোকটাকে প্রকাণ্ড এক সেলাম বাজিয়ে অতি ভালোমানুষের মতো আমার পাশে, পিছনের বেঞ্চিতে এসে

বসল। লোকটা অবিনের দিকে ফিরেও চাইল না ; সে কেবল নিজের বাঁ-হাতখানা সাপের ফণার মতো বাঁকিয়ে অবিনের মুখের কাছে একবার তুলিয়ে গট হয়ে বসে রইল।

ঝুঁটি-কাটা ময়ূরের মতো অবিনকে একেবারে মুহ্যমান দেখে আমার আজ যেমন হাসি পাচ্ছিল, তেমনি বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। অবিনকে এরকম করে দমিয়ে দিতে পারে এমন লোক আছে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমি তাকে চুপিচুপি বললুম, 'ওহে, এই ভাগীরথী-তীরে এবং নীরে এতকাল তুমি একা সিংহাসনে বিরাজ করছিলে। আজ আবার এ কোন্ ভাসুরক এসে উপস্থিত হল হে?' অবিন আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে, কেবল ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে, চোখ বুজে চুরুট টানতে লাগল। নদীর মাঝ দিয়ে সারা পথটা তার মুখে আজ কথা নেই। আমিও চুপ করে চেয়ে রয়েছি। দূরে দেখা যাচ্ছে, বালির চড়ার উপরে গোটাকতক নৌকো কাত হয়ে পড়ে আছে। আরো দূরে সবুজ একটা আকের খেত ; তার পিছনে একটা কলের চিমনি থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে ; একটা শঙ্খচিল নীল আকাশ থেকে আস্তে আস্তে জলের দিকে নামছে।

নদীনীর, বালুতীর তুপুরের আলোয় মিলে আমাদের চারি দিকে যখন একটা দিবাস্বপ্নের সৃষ্টি করেছে আর আমাদের জাহাজখানা কুটিঘাট থেকে আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে ওপারের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে, ঠিক সেই সময় অবিন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল, 'ওহে সে-লোকটা গেল কোথায়?'

সামনের দিকে চেয়ে দেখি, সেই প্রথম শ্রেণীর বেঞ্চখানা একেবারে খালি ; সে অদ্ভুত টুপির আর চিহ্নমাত্র নেই। জাহাজ তখনো জেটি ছাড়ায় নি ; আমি সেদিকে চেয়ে দেখলুম, জনমানব নেই। গ্রামের পথঘাট পেরিয়ে সোজা দেখা যাচ্ছে, সেখানে একটা মড়াখেকো কুকুর রাস্তার মাঝখানে ধুলোর উপরে মুখ গুজড়ে শুয়ে রয়েছে ; আর অন্য পথিক কাউকে দেখা গেল না।

pathagar.net

অবিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের এধার থেকে ওধার, নীচের তলার কামরা মায় ইঞ্জিন-ঘরটা পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করে খুঁজে এসে সারেঙ থেকে সুকনি খালাসি এবং সকল যাত্রীদের একে একে সেই লোকটার হুবহু বর্ণনা দিয়ে জেরা করে দেখলে সে-লোকটাকে এ-জাহাজে উঠতেও কেউ দেখে নি, বসে থাকতেও কেউ দেখে নি, এবং কোনো ঘাটে নেমে যেতেও কেউ দেখেছে কি না তাও জানা গেল না। আমরা দুজনে গিয়ে সেই সামনের বেঞ্চিখানা এবং তার চারি দিকটা এমন করে সন্ধান করলুম যে, সেই লোকটার লোমশ আলখাল্লার যদি একগাছিও লোম সেখানে থাকত তবে সেটা আমাদের কাছে ধরা পড়তই পড়ত। কিন্তু এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা এল, বসল এবং চলে গেল অথচ পৃথিবীর কোনোখানে একটু আঁচড় পড়ল না! কোনো-কোনোদিন বন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পারাপার করবার সময় দেখেছি, কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না, হঠাৎ একখানা নৌকো তার দাঁড়িমাঝি মালপত্র রশারশি নিয়ে চকিতের মতো কুয়াশার গায়ে ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল; এ লোকটা ঠিক যেন। তেমনি করে আমাদের দেখা দিল! আমার মনের মধ্যে কেমন যেন শীত করতে লাগল।

প্রথম শ্রেণীতে অবিনের সঙ্গে একলা বসে থাকতে আমার ভালো লাগল না; আমি তৃতীয় শ্রেণীতে যেখানে ইঞ্জিনের ধারে আগুনের তাতে কতকগুলা চিনেম্যান তাদের ফ্যাকাসে মুখগুলো তাতিয়ে নিচ্ছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম।

শেমুষি বেঞ্চ খালি করে দিলেও অবিন কিন্তু আজ তার নিজের সিংহাসনে বসতে বড়ো উৎসাহ প্রকাশ করলে না। সে বেঞ্চিখানার পিঠে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে, থেকে থেকে খানিক চুরুট টেনে টেনে, দোতলায় যেখানে সারেঙসাহেব চাকা ঘুরিয়ে কম্পাসের কাঁটা দেখে জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছে, মই বেয়ে সেখানে উঠে গেল। সাধারণ যাত্রীর দোতলায় যাবার হুকুম নেই, আমি নীচেই রইলুম। কিন্তু, অবিনের গতিবিধি সর্বত্র। সে দোতলার উপর উঠে দিব্যি

আমাদের নাকের উপর দুই পা ঝুলিয়ে সারেঙসাহেবের হুঁকোর মজলিস জম্‌কে তুললে। সারা পথটা তার আর কোনো খবরই পেলুম না। ফিরতি স্টীমার যখন আহেরীটোলার ঘাটে ভিড়ছে, এমন সময় অবিন নেবে এসে বললে, 'ওহে, কাল আবার আসছ তো?'

আমি বললুম, 'আসছি, কিন্তু এ-জাহাজখানার দিকেও আসছি নে।'

ঘাটে নেমে জাহাজখানার নাম দেখে নিলুম—প্রতিভা।

তার পরদিন থেকে বড়োবাজারের ঘাটে 'প্রতিভা'টি বাদ দিয়ে এ লাইনের আর যত নামের যত জাহাজ সব-কখানাতে চড়ে বেড়াই, কিন্তু অবিনকে আর দেখতে পাই নে। সে যে কখন কোন্ জাহাজ ধরে যাতায়াত করে তার আর সন্ধান পাই নে। দূরবীন লাগিয়ে দেখেছি 'প্রতিভা'র ডেকে তার জায়গা শূন্য পড়ে আছে। লোকটা গেল কোথা? শেমুষির মতো তাকেও গা-ঢাকা হতে দেখে আমি একদিন সন্ধ্যার সময় তাদের আহেরীটোলার ঘাটে নেমে জেটি পেরিয়ে অবিনদের বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময় রাস্তার মোড়ে দেখি অবিন হনহন করে স্টীমার-ঘাটের দিকে চলেছে; সঙ্গে আলবোলা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ নিয়ে তার চাকর গোবিন্দ।

তখন সন্ধ্যা সাতটা হয়ে গেছে। বড়োবাজার থেকে শেষ স্টীমার রাতের অন্ধকারে ভেঁপুর শব্দ এবং সার্চ-লাইটের আলোর শুঁড় দোলাতে দোলাতে রক্তচক্ষু একটা বিরাট জলজন্তুর মতো আস্তে আস্তে জেটির গায়ে এসে থামল। অবিনকে এতরাত্রে জাহাজে উঠতে দেখে আমার ভারি একটা কৌতূহল হল। আমি তার অসাক্ষাতে স্টীমারে উঠে থার্ড ক্লাসের একটা খালি বেঞ্চে শাল মুড়ি দিয়ে বসলুম। আমি, অবিন এবং গোবিন্দ ছাড়া আর একটিমাত্র সহযাত্রী একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ির আড়ালে চুপ করে বসে রয়েছে। জাহাজ অন্ধকার জল কেটে সন্তর্পণে চলেছে। তীরের আলোগুলো কালো জলের গায়ে সাপ-খেলানো সোনার এক-একটা রেখা টেনে

pathagar.net

দিয়েছে। আকাশের আর জলের আঁধার এক হয়ে গিয়ে নদীটা অকূল সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে। এমন সময় অবিন আমার নাম ধরে ডেকে বললে, 'ওহে ইয়ার, শেমুষির অত কাছে বসা নিরাপদ নয়; এ দিকে চলে এসো।'

অবিনের চোখ এড়াতে পারি নি দেখে আমি তার কাছে গিয়ে বললুম, 'এখানে আবার শেমুষি কোথায় পেলে?'

অবিন একেবার ঝুড়ি কোলে যে-মানুষটা তার দিকে ঘাড় হেলিয়ে শুরু করলে, 'শেমুষি কি একরকম? তারা নানা বেশে জগৎময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অভিধানে শেমুষি অর্থে দেখবে বুদ্ধি।'

আমি বললুম, 'বুদ্ধিমন্ত জীবমাত্রেই যদি শেমুষি হয় তবে তুমি-আমিও তো শেমুষি!'

অবিন বললে, 'না, ওই বুদ্ধির সঙ্গে অতির যোগ হলে তবে হয় শেমুষি। যেমন তোমার ঠগী, তেমনি শেমুষির একটা দল এখনো আছে। আমরা যেমন কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরই, এদেরও মধ্যে তেমনি অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে হয় শেমুষি। আজন্ম-শেমুষিও দু-চারজন আছে। তারা কেমন জান? হতভাগা লক্ষ্মীমন্ত ধার্মিক ও পাজি, ভদ্র অভদ্র, মহাত্মা এবং দুরাত্মা, সুবুদ্ধি দুর্বুদ্ধি, পাজি ছুঁচো, মহাশয় দুরাশয়, পণ্ডিত ও গোমূর্খ, সমালোচক ও গোবদ্যি, বুজরুগ ও বেচারা একত্র মেশালে যা হয় তাই। এরা স্মরণমাত্রে যেখানে খুশি যেতে পারে, যা খুশি তাই করতে পারে; ঘটি-চালানো, বাটি-চালানো থেকে মায় তোমার লোহার সিন্ধুকের ক্যাশবাক্স পর্যন্ত সরানো—হোসেন খাঁর যত বুজরুগি সব এদের জানা আছে। এরা ইচ্ছে করলে অফুরন্ত তূণ, অক্ষয় কবচ, সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি, বিশল্যকরণীর মলম—এমন-কি, ঘুমের দেশের রাজকন্যাকেও তোমার মুঠোয় এনে দিতে পারেন। স্বর্গের অপ্সরী এঁদের দাসী, দেবতাগুলো হুকুমের চাকর, আর ভূতগুলো ইয়ার। মনে করলে এক রাত্রের জন্যে এরা তোমাকে ইন্দ্রের অমরাবতীতে, কালীফের বোগ্‌দাদে, এমন-কি, এই

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়ে আনতে পারেন অথচ তোমার গায়ে একটু ঘাম দেবে না। এমনি একজন শেমুষিকে সেদিন দেখেছ। কিন্তু, আজ যে ওই ঝুড়ি নিয়ে ওপারে ভালোমানুষটি বসে আছে দেখেছ, ওকে চিনেছ ?'

লোকটা আমার একেবারেই অচেনা। অবিন আমার কানে কানে বললে, 'উনিই সেই দিনের শেমুষি ; ওঁরই পাল্লায় একবার পড়ে একটা স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটতে ছুটতে আমার প্রাণ গিয়েছিল আর-কি। আবার উনি যে কার সর্বনাশ করতে কিম্বা কার-বা কী ভালো করতে এখানে এসেছেন, তাই ভাবছি।'

লোকটার চেহারায় কোনো-রকম শেমুষিত্ব ছিল না। আমি অবিনকে বললুম, 'নির্ভয়ে তোমার শেমুষির ইতিহাস বলে যাও, ও-লোকটা এখনি নেমে যাবে।'

অবিন আমার দিকে একটু ঝুঁকে বললে, 'দেখবে তবে ?' বলেই অবিন তার বুকের পকেট থেকে একটা বনমানুষের হাড়ের বাঁশি বার করে বললে, 'এই হল শেমুষিদের বুকের হাড়ের বাঁশি। গান এবং এই বাঁশির সুর—এই দুই হচ্ছে শেমুষি তাড়াবার একমাত্র ওস্তাদ। তুমি গান ধরো ; আমি বাজাই।'

হাড়ের মধ্যে থেকে যে অমন সুর বার হয় তা আমার ধারণা হয় নি এবং অবিনও যে এমন বাঁশি বাজায় তা আমি আগে জানতেম না। সুর যেমন গিয়ে অন্ধকারকে বিদ্ধ করলে অমনি মনে হল যেন রাত্রির নীল পর্দা খুলে দলে দলে তারা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে ; জলের শব্দ এতক্ষণ কানে আসে নি কিন্তু এখন যেন শুনি জলও ওই সুরে, বাতাসও সেই সুরে তাল দিচ্ছে, আর মনে হল, রাত্রির রঙ ক্রমে যেন পাতলা হয়ে আসছে।

শিবতলার শ্মশানঘাটের কাছে জাহাজ এসে স্থির হল। পারে একটা চিতার আগুন ধুধু জ্বলছে। সেই লোকটা ঝুড়ি মাথায় জেটিতে নেমে দাঁড়াল। আমি দেখলেম, সেটা ঝুড়ি নয়, সেটা তার সেই টুপিটা।

pathagar.net

অবিন বললে, 'দেখলে ?'

দেখতে আমার ভুল হয় নি কিন্তু শেমুষির সঙ্গে তার কী লড়াই বেধেছিল যখন তাকে প্রশ্ন করলুম সে বললে, 'ভুলে গেছি, মনে নেই।'

pathagar.net

প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী, সদাই হাস্যমুখ, ভায়া আমার মূর্তিমান আনন্দের মতো—পন্টুনের পুলিস থেকে জাহাজের যাত্রী সারেঙ খালাসী সকলের কাছে প্রিয় ; কেবল অবিন ডাকে তাঁকে 'প্রিয়া' বলে।

কবে কোন সূত্রে ভায়া যে আমার স্টীমারের 'শুশুক-সভা' বা ডল্ফিন্-ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট অবিনের কাছ থেকে এই সম্মানের উপাধিটা লাভ করেছিলেন তা আমার মতো একজন নতুন শুশুকের জানা সম্ভব নয় ; কেননা স্টীমারের ডেকে সবেমাত্র একটি শীতকাল কাটিয়ে আমি প্রথম বসন্তে পা দিয়েছি, সুতরাং শুশুক-সভার বাই-ল অনুসারে আমার এখনো দুধে-দাঁত ওঠে নি, আসল বয়েস আমার যতই হোক-না।

এখানকার নিয়ম-অনুসারে ক্রমান্বয়ে চার-পাঁচটা বছর, দিন আট-প্রহর, ষড়ঋতুর সব-কটাতে, জল-বাতাস-আলো-অন্ধকারে খেয়া দিয়ে, চল্লিশের ঘাট পেরিয়ে, উনপঞ্চাশের বাতাসে পাল তুলে, পঞ্চাশের পারে যেখানে চিরবসন্তের কুঞ্জতীরে পাপিয়া 'পিয়া পিয়া' বলে দিন-রাত ডাকছে, সেখানে আমার তরী নিরাপদে এনে ভেড়াতে হবে, তবে যদি পিয়ার খবর পাই। আমার সবে ছেচল্লিশ, সুতরাং উনপঞ্চাশের, সুবাতাসের সঙ্গে পিয়ার খবরও আমার পেতে এখনো দেরি আছে—যদি-না ইতিমধ্যে হঠাৎ ভালোমন্দ একটা কিছু ঘটে যায়। এমন দু-এক সময় ঘটে যে খবর না চাইতে খবরটা এসে জোর করে কানে ঢোকে, যেমন মেঘ না চাইতে জল, এবং খালি জল চাইতে যেমন জলখাবারের থালা ; যেটা বলব সে কাহিনীটা এমনি করেই আমার কানে পৌঁছল।

হচ্ছিল সেদিন লাঠি ভাঙার মামলা। অবিন আজ কদিন ধরে লাঠি ভাঙবার চেষ্টায় ফিরছে—কারো পিঠে নয় বটে, কিন্তু লাঠিবংশ তাতে করেও যে রক্ষে পাবে, এমন আশা কিছুমাত্র নেই। আমরা সবাই লাঠি আনা ছেড়ে দিয়েছি। কেবল ভায়া আমার তাঁর নিজের লাঠি আঁকড়ে রয়েছেন। তিনি অবিনকে লাঠি ভাঙতে উস্‌কে দেবার মূলে; সুতরাং তাঁর লাঠি যে চিরদিন অক্ষত শরীরে বর্তমান থাকবে, সেটা আশা করা অন্য লোক হলে যেত না, কিন্তু তিনি অবিনের প্রিয়া-উপাধির পাত্র, সেইজন্যই যদি তাঁর লাঠিটাও বেঁচে যায়। সমস্ত জাহাজের মধ্যে এখন দুটিমাত্র লাঠি। এক ভায়ার হাতের ঘোড়ার কাটা-পা-দেওয়া আবলুসের ছড়ি, আর অবিনের হাতের বাঁশির উপরে মিনের কাজ করা আধা-পাখি আধা-মানুষ একটি কিন্নরী বসানো হিমালয়ের দেবদারু-সৃষ্টি।

এই দুই লাঠিতে যেদিন ঠোকাঠুকি বাধল, সেদিন জলে-বাতাসে মেঘেতে আলোতে কোন বিবাদ ছিল না। এমন-কি, ওস্তাদি রাগ-রাগিণী আজ বাদী-বিবাদী সব সুরগুলি নিয়ে আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিল। একটা আরাম আর শান্তির মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলেছে উত্তরের হাওয়া কেটে। জলের ঢেউগুলোতে কিছুমাত্র চঞ্চলতা নেই; যেন ঘুমন্ত বুকের নিশ্বাসের মতো আস্তে উঠছে, আস্তে পড়ছে। সূর্যাস্তের দিকে কোনো রঙের খেলা নেই। স্বর্ণ চাঁপার মতো একটি স্থির দীপ্তি সমস্ত পশ্চিম আলো করে রয়েছে। তারই উপরে তীরের গাছ যেন কালি দিয়ে আঁকা দেখেছি। ভরা পালের নৌকো যেমন, আজকের সন্ধ্যায় সমস্ত পৃথিবী তেমনি যেন চম্পাই রঙের প্রকাণ্ড পালখানি তুলে রাত্রির মুখে স্বচ্ছন্দগতিতে ভেসে চলেছে নিঃসাড়ায়। প্রাতঃ-সন্ধ্যার অরুণোদয়ের তপ্তকাঞ্চনের সঙ্গে কতটা হিম মেশালে সায়ংসন্ধ্যার এই চাঁপাফুলি আলোর রঙটি পাওয়া যায়—এটা যখন আমি বিশ্বকর্মার কাছ থেকে মনের নোটবুকে টুকে নিচ্ছি থার্ড ক্লাসের একখানা বেঞ্চির কোণে বসে, সেই সময় ফার্স্ট ক্লাসের দিকে 'করেন কী' 'করেন কী' রব উঠল।

pathagar.net

কেউ জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কি না দেখবার জন্যে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি, অবিন তার হাঁটুর চাড়া দিয়ে তার নিজের লাঠিখানা ধনুকের মতো বেঁকিয়েছে ; তার মুখ গোলাপফুলের মতো রাঙা ; আর-একটু হলেই লাঠিখানা দু টুকরো হয়ে গঙ্গা পাবে। ভায়াই যে আজকের ধনুকভঙ্গের নাটের গুরু এবং তাঁর লাঠিটা বাঁচাতে তিনি অবিনকে আপনার লাঠি ভাঙতেই যে উস্‌কে দিয়েছেন, এটা বুঝলুম। অবিনের লাঠিটা এত সুন্দর যে সেটাকে ভেঙে ফেলা আর একটা মানুষের ঘাড় মটকে জলে ফেলে দেওয়ায় আমার কোনো তফাত মনে হল না। মানুষের সৃষ্টিকে নষ্ট করাও যা, ভগবানের সৃষ্টিকে আঘাত দেওয়াও তাই ; একই পাপ আমি মনে করি। অবিনের লাঠির মাথায় সেই কিন্নরীর বাঁশির সাতটা সুর যেন একটা কান্না নিয়ে আমাকে মিনতি করতে লাগল, 'বাঁচাও, বাঁচাও। আমার বুকের মাঝে কেমন করতে লাগল। কিন্তু মুখ দিয়ে আমার একটি কথাও বার হল না। দেখলেম, লাঠিটা ক্রমে বেঁকছে। লাঠি এতটা যে নুইতে পারে তা আমি ধারণাই করতে পারি নি। পাহাড়ের রস টেনে বেড়েছিল সেই সরু দেবদারুর ডাল। অবিন সমস্ত জোর দিয়েও তাকে ভাঙতে পারলে না। লাঠিখানা বেঁকে সাপের মতো তার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তখন আমি সাহস করে এগিয়ে গিয়ে অবিনের হাত ধরতেই অবিন একটা নিশ্বাস ফেলে লাঠিখানা ছেড়ে দিলে। দেখলেম, সেই নিশ্বাসের সঙ্গে অবিনের মুখ কাগজের মতো পাঙাস হয়ে গেল। যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে অবিন আমার দিকে চেয়ে দেখলে! তার পর আমাকে লাঠিটা দিয়ে বললে, 'নাও, তোমাকে দিলুম।'

লাঠিটা আমার কাছে শিল্প হিসাবে খুব মূল্যবান সুতরাং সহজে বখশিশ নিতে আমার লজ্জা হল। কিন্তু, একবার দিয়ে ফিরে নেওয়া অবিনের কুষ্ঠীতে লেখে নি, সুতরাং অন্তত তখনকার মতো হাস্যমুখে লাঠিটা আমায় নিতে হল। তা ছাড়া লাঠিটাকে এখন কিছুদিন অবিন এবং তার প্রিয়া—আমার ভায়াটির কাছ থেকে সরিয়ে

রাখলে সব দিকেই মঙ্গল, এটাও সেই লাঠিটা খুশির সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে বখশিশ নেবার আর একটা কারণও বটে। কাজেই লাঠিটা সেদিন আমার হাতে-হাতে আমার বাড়িতেই এল। তাড়াতাড়ি এক কোণে সেটাকে রেখে আমি গায়ের কোট ছেড়ে রাখব, এমন সময় বাতির আলোয় লাঠির গায়ে একটি বিদ্যুতের রেখার মতো একটা নাম ঝলকে উঠল—'ইন্দু'। তিল তিল হীরের আলো দিয়ে সেই নাম লেখা। লাঠিটা বাইরে ফেলে রাখতে আমার আর সাহস হল না; আমি সেটাকে আমার সঙ্গে সঙ্গেই রাখলুম। সঙ্গে নিয়ে খেলুম, সঙ্গে নিয়ে শুলুম। অবিন লাঠিটাকে কী ভাবে দেখত তা জানি নে, কিন্তু তার ইন্দু বা ইন্দুমতী অথবা ইন্দুমুখীর লাঠিটা আমার যেন বৃদ্ধস্য তরুণীর মতো, চলিত কথায় অন্ধের নড়ি হয়ে উঠল। পাছে তাকে হারাই, পাছে সুড়ঙ্গ কেটে চোর আমার কোলের কাছ থেকে চুড়ি করে পালায়, এই ভাবনাতে আমার খেয়ে সুখ ছিল না, শুয়ে ঘুম ছিল না।

কদিন পরে অবিনের সঙ্গে যখন দেখা তখন প্রথমে আমার ভয় হল, অবিন বুঝি-বা লাঠিটা ফিরিয়ে নেয়—যদিও অবিনের কোনোদিন এমন স্বভাব নয়, বেশ জানতেম। সেদিন আমি লাঠিটা খুব জোর করে মুঠোর ভিতরে যে রাখলুম তা বলতেই হবে। সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি, গঙ্গার একটা মনোরম শোভার মধ্য দিয়ে জাহাজ চলেছে। পশ্চিম তীরে দেখতে পাচ্ছি, সাহেব-মিস্ত্রির বানানো রাজাদের একটা পুরোনো বাগানবাড়ি; পুব পারে দেখছি প্রকাণ্ড একটি মন্দির, ঘাটের ধারেই; পূর্ণিমার চাঁদ জলের উপর দিয়ে একটি আলোর পথ আমাদের জাহাজ থেকে এই ঘাটের কোল পর্যন্ত রচনা করেছে। আর, এই আলোর পথের ধারটিতে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অবিন, পূর্ণিমার চাঁদের দিকটিতে চেয়ে। অবিনকে আমি কতবার এমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, কিন্তু আকাশের পূর্ণ ইন্দু আর আমার হাতের মুঠোর মধ্যে হীরের বিন্দু দিয়ে লেখা নামটার মিল দেখে

pathagar.net

মনটা আমার নড়ে উঠল। আমার মনে হতে লাগল, অবিন হয়তো ওই আকাশের চাঁদের মধ্যে তার ইন্দুমতী বা ইন্দুমুখীকে দেখতে পাচ্ছে; হয়তো এই চাঁদের আলোয় ঝকঝকে তারাগুলির মধ্যে দিয়ে সে তার অনেক দিনের হারানো ইন্দুর কাছে বহু দূর পথে, বহু দিনের পথে, প্রাণের আকূতি বিরহী যক্ষের মতো সারা জীবন ধরে পাঠাচ্ছে, প্রতি পূর্ণিমায়। হয়তো পূর্বজন্মে অবিনের এ-জন্মের ইন্দু ছিল অলকার তন্বী শ্যামা ইন্দুরেখা কিন্নরী। হয়তো সেখানে কোনো নাগেশ্বর চাঁপার কুঞ্জবনে অবিনে-তাতে প্রথম দেখা; তার পর প্রণয়স্বপ্নের মাঝখানে দুজনের সহসা বিচ্ছেদ এবং আকাশ থেকে খসে-পড়া দুটি তারার মতো পৃথিবীতে তাদের ঝরে পড়া।

এখানে এসে স্বপ্নটা আমার যেন আটকে গেল। ওই আহিরী-টোলার গলিতে যে অলকার কিন্নরী ইন্দুরেখা—ইন্দুবালা চক্রবর্তী, ইন্দুমুখী ঝাঁ, ইন্দুমতী মুন্‌সি কিংবা আরো কোনো-একটা নাম নিয়ে অবিনের ঘরে গৃহিনীপনা করতে করতে অথবা অবিনের সঙ্গে কোর্টশিপ চালাতে চালাতে হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে হঠাৎ মারা পড়ল অবিনকে তার শেষ দান এই লাঠিটা দিয়ে, এটুকু মন আমার কিছুতে স্বীকার করতে চাইলে না। আমি ফাঁপরে পড়ে অবিনের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে আমার দিকে চেয়ে মিট্‌মিট্‌ করে হাসছে। আমি লাঠিটা সজোরে ঠুকে বলে উঠলেম, 'এ হতেই পারে না।'

অবিন আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বলল, 'কী হতে পারে না হে আর্টিস্ট?'

আমি উত্তর করলেম, 'আকাশের চাঁদের ভূতলে পতন। ইন্দুরেখা কিন্নরী তোমার আহিরীটোলায় গৃহিনীপনা।'

অবিন গঙ্গার ধারে বাগানবাড়িটা দেখিয়ে বললে, 'ইন্দুরেখা ও পাড়ার ইন্দুভূষণ হলে কি তোমার আপত্তি আছে?'

'কিছু না।'—বলে আমি লাঠিটা ইন্দুভূষণ যাকে দিয়েছিল তাকেই ফিরিয়ে দিলেম। কিন্তু, সম্পূর্ণ অবস্তু ইন্দুরেখার সোনার কাটিটা আমারই মুঠোয় রয়ে গেল—হাতের মুঠোয় নয়, মনের মুঠোতে।

pathagar.net

অরোরা

অরোরার সঙ্গেও যে অবিনের পরিচয় ছিল সেটা আমি জানতেম না। সে কবিতা করে, সুতরাং চাঁদের সঙ্গে তাকে কথা বলতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি ; রামধনুকের সঙ্গে তার আলাপ থাকা সম্ভব ; কিন্তু অরোরার বাসা ; সেখানেও যে তার গতিবিধি, এটা একেবারেই আমি ভাবি নি।

কমলালেবুর মতো পৃথিবীর সব গোল—ঠিক মাঝখানটিতে চাপা এবং যে রাজ্যটা বেশ একটু গভীর সেইখানেই চিরশীতল মণিমন্দিরে না-দিন না-রাত্রির দেশে একাকিনী অরোরা আলো বিতরণ করেন। লক্ষকোটি রামধনুকের শোভা এক করে ঝালর বানিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে যে বাহার, বিনা বরের বাসরে অরোরার রূপ কতকটা সেই ধরনের। নব নব সৌন্দর্যের রঙের এবং আলোর সে যেন একটা ভরা জোয়ার বা চীনাভাষায় যাকে বলে 'টাইকুং'।

অরোরা সম্বন্ধে এমনি একটা ধারণা আমার দূর থেকে। জল-জীয়ন্ত অরোরার বাসায় গিয়ে তার নির্ভুল পরিচয় এ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটে নি ; কেননা সেদিন পর্যন্ত আমি সেই দলভুক্ত ছিলেম যে দলের কাছে রামের ধনুক, অরোরার রঙ্গমঞ্চের রঙ, এমনি আরো অনেকগুলো জিনিস হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ তিথিতে পটোল ঝিঙে ইত্যাদির মতো একেবারে বর্জনীয় ছিল। আমি তখন কি জানি যে তলে তলে আমার দলেও সব চলে? সেটা জানলে ও দল থেকে নাম কাটা সেপাইয়ের মতো অবিনের দলে এসে ভর্তি হবার দরকার ছিল না।

যাই হোক, সেই অমাবস্যার রাত্রে তারার জুঁইফুলে সাজানো

pathagar.net

নীল আকাশের নীচে কলকাতার অন্ধকার গলিতে, আমরা দুই বন্ধু যে অরোরার বন্ধ খিড়কি খোলা না পেয়ে ঘুরে ঘুরে হয়রান ও হতাশ হয়ে, রাত সাড়ে-চারটেয় আহিরীটোলার ঘাটের রানায় বসে পয়লা এপ্রেলের সকালবেলার প্রতীক্ষা করে রইলেম, সেটা স্বীকার করতে এখন আর লজ্জা নেই বা সে লজ্জার কথাটা গোপন করতে দুটো মিথ্যে কথাও এখন আর আমার বলবার আবশ্যক হয় না— অবিনের দলে মিশে এটা একটা সুবিধে আমি দেখছি।

অরোরার অভিসারে বেরিয়ে আর কখনো অবিন এমন নিরাশ হয়েছিল কি না বলতে পারি নে। তবে আমার সঙ্গদোষেই যে এরূপটা ঘটল, পয়লা এপ্রেলের ঠিক পূর্বরাত্রে আমাকে সেটা জানাতে অবিন কিছুমাত্র ইতস্তত করলে না এবং আমিও সেটা মেনে নিলেম। কেননা দল ছাড়বার পূর্বে. আমার আগের দলের যাঁরা বৃদ্ধ তাঁরা বিশেষ করে আমারই উপরে দীর্ঘনিশ্বাস ও হুংকারগুলো নিক্ষেপ করে—পিতৃপুরুষের সঞ্চয়টার সঙ্গে নিজের উপার্জিত পয়সা রূপ গুণ ও যৌবন নিয়ে তাঁদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনায়— ইংরাজিতে এপ্রেলের ওই সম্ভাষণটাই আমাকে দিয়েছিলেন, যদিও মাসটা ছিল অন্য!

খানিক বসে থেকে অবিন মরীচিকামুগ্ধ হরিণের মতো অন্ধকারে আর-একবার তার অরোরার সন্ধানে ঘুরে মরতে গেল অলিতে গলিতে। আমি একা ঘাটে, যেখানটিতে সকালের একটি তারার আলো অনেক দূর থেকে এসে অন্ধকার তীরের কাছে জলের উপর নেমে দাঁড়িয়েছে, সেইখানটিতে চুপ করে বসে রইলেম। ভোরের হাওয়ায় তখনো হিম মাখানো; নদীর মাঝে ময়লা কুয়াশা গত শীতের ছেঁড়া কাঁথার একটা কোণের মতো এখনো ঝুলে রয়েছে। ঘাটের দু ধারে বাঁধা সারি সারি বোঝাই নৌকো জলের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে এক-একবার একটু নড়ে উঠে আবার ঝিমিয়ে পড়ছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা চিতা কিছু দূরে শ্মশানঘাটের সমস্তটা এবং অন্ধকারের অনেকখানি আলোতে ভরে দিয়ে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে জ্বলছে।

চলে যাবার সময়, জ্বলে ছাই হয়ে যাবার বেলায়, মানুষ কতটা আলোই না দিয়ে যাচ্ছে! কী আলোর রথই না তাকে নিতে এসেছে যে হয়তো জীবনের অন্ধকারেই কাটিয়ে গেল রাত্রিদিন।

অন্ধকারের মধ্যে এতখানি আগুনের একটা টান আছে। শিখাগুলো যেন হাত নেড়ে আমায় ডাকতে লাগল। মন আমার প্রদীপের চারি দিকে পতঙ্গের মতো কতক্ষণ ধরে ওই আগুনটার চারি দিকে ঘুরছিল, হঠাৎ একসময় অন্ধকারে একখানা হাত যেন বোধ হল আমার দুই চোখের উপর আস্তে আস্তে চেপে পড়ল। ঠাণ্ডা হাত—চাঁপাফুল আর হেনার গন্ধ-মাখানো আঙুলগুলি; পাতলা একখানি আঁচল, হালকা বাতাসের মতো উড়ে উড়ে আমার গালে পড়ছে; ঠোঁটের খুব কাছে চন্দনের গন্ধ ভরা গরম একটা নিশ্বাস অনুভব করছি। আশ্চর্য এই যে, সে আমার চোখ টিপে থাকলেও আমি তার মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—একেবারে রাত্রির মতো কালো আর তারই মতো স্নিগ্ধ সুন্দর! আমি একবার তার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলির উপরে হাত বুলিয়ে চুপি চুপি বললেম, 'অরোরা!'

পিছন থেকে অবিন গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

আমি চমকে উঠে বললেম, 'কি হে, তুমি? অরোরা কোথা!'

অবিন তার আঙুলটা দিয়ে শ্মশানের চিতা দেখিয়ে বললে, 'শোনো বলি—'

সকালের হাওয়ায় কুয়াশার সাদা চাদর নাট্যশালার যবনিকার মতো আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। নদীর পশ্চিম পারে চিতার আগুন নিভে গেল। তারই শেষ আভার মতো একটি সোনার রেখা নদীর পুব পারের আকাশে ফুটে উঠল। অবিন তার কথা শুরু করে এমন সময় রামা বেহারা এসে খবর দিলে, 'ডাক্তারবাবু আয়া।'

এত রাত্রে এখানে ডাক্তারবাবু কেন, বুঝতে আমার সময় লাগল। ঘুম ভাঙলে যেমন আমি ডাক্তারকে বললেম, 'তুমি যে অসময়ে?'

pathagar.net

ডাক্তার হেসে বললেন, 'আপনি আবার গল্পের খাতা নিয়ে বসেছেন ? এরকম করলে আপনার অসুখ কিছুতে সারবে না। লেখা রাখুন ; যান, জাহাজে একটু বেড়িয়ে আসুন।'

লেখবার টেবিলে এবং তার উপরে দেয়ালে ঝোলানো পাঁজির প্রকাণ্ড একটা এক এবং তার শিয়রে বড়ো বড়ো অক্ষরে এপ্রেলটার দিকে আমার তখন দৃষ্টি পড়ল। আমি একবার ডাক্তারের দিকে, একবার নিজের দিকে চেয়ে সুবোধ ছেলের মতো গল্পের খাতা বন্ধ করলেম। ঘড়িতে তখন বেলা দুটো-উনপঞ্চাশ।

pathagar.net

পর্‌-ঈ-তাউস্‌

ও পারে মুচিখোলার নবাবি নিলেমে চড়েছে, এ পারে সবুজ ঘাসের ঢালুর উপরে দুই বন্ধুতে পা ছড়িয়ে চড়ুইভাতির পরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছি—ঠিকে-গাড়ির ঘোড়াগুলো হঠাৎ কাজের অবসরে এক-একবার যেমন ধুলোয় লুটোপুটি খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নেয়।

সেদিন একটা ভাঙা খাঁচা জলের স্রোতে ভেসে চলতে দেখে আমি অবিনকে তামাশা করে বলেছিলেম, 'ওহে, খাঁচাটা নবাবের চিড়িয়াখানার দিক থেকে যখন ভেসে আসছে, তখন এটা পক্ষীরাজের খাঁচা হলেও হতে পারে। দেখো-না সাঁতরে, যদি ওটাকে ধরতে পার।' অবিন সাঁতার একেবারে না জানলেও সেদিন যে করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আর খাঁচাটা না তুলে তাকে জেলে ডেকে জল থেকে তুলে আনার জন্যে আমার সঙ্গে যে আড়িটা দিয়েছিল, চিরদিন সে কথা আমার মনে থাকবে।

এখন সে কথা অবিন ভুলে গেছে; কিন্তু পক্ষীরাজ তার সেই যৌবনের দুঃসাহস বোধ হয় ভোলে নি; তাই হঠাৎ আজ তার স্থূলশরীর কাশীপুরের ঘাট থেকে জাহাজে আমাদের দর্শন দিতে এসে উপস্থিত। গোছা-গোছা ময়ূরের পালক হাতে সে লোকটা। কী অদ্ভুত যে দেখতে তাকে, তা আর কী বলব! ভণ্ডামির যতরকম পালক হতে পারে সব কটা দিয়ে সে আপনাকে সাজিয়েছে।

ছোটো ছেলে পাখির ছানা হাতে পেলে টিপে-টুপে পালক ছিঁড়ে যেমন করে, অবিন ঠিক তেমনি এ লোকটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলসে। অবিনের গায়ে তুলো-ভরা ছিটের কালো কোট। এ লোকটাকে ময়ূরপুচ্ছে বিচিত্র দেখে আমার কথামালার দাঁড়-

pathagar.net

কাকের গল্পটা মনে পড়ল। আমার তুলনাটা ইংরিজিতে অবিনকে শুনিয়ে দিতেই সে লোকটা আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'তোমার বন্ধুর কোটের নকশাটা ভালো করে কি দেখা হয়েছে? ওটা যে আগাগোড়া ময়ূরপালকে ভরা।'

বলেই লোকটা উত্তরপাড়ার ঘাটে লাফিয়ে পড়ল, গাঁজার বিকট গন্ধে জাহাজ ভরে দিয়ে। আমি অবিনের কোটের দিকে চেয়েই একেবারে ঘাড় হেঁট করলেম।

আকাশে একটা রামধনুক ময়ূরের পালকের রঙ ধরে দেখা দিয়েছে। আবার যখন মুখ তুলে চাইলেম তখন সব প্রথম ওইটেই আমার চোখে পড়ল। আমি অবিনকে সেটা দেখাব বলে ডাকতে গিয়ে দেখি, অবিন সেখানে নেই। আশে পাশে কোনো সহযাত্রী দেখলেম না; জাহাজের ডেক সমস্তটা খালি পড়ে আছে। তারই এক কোণে আমাদের বাঁয়াতবলা-জোড়া পড়ে ছিল। হঠাৎ সে দুটো দেখি, দুখানা করে পালকের ডানা বের করে পাখির মতো উড়ে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের খালি বেঞ্চিগুলো একে একে পালক গজিয়ে পক্ষীরাজের মতো লাফাতে লাফাতে ডেকময় ছুটোছুটি করতে করতে একে একে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চম্পট দিলে।

আমাকে না জানিয়ে বন্ধুরা সবাই হয় মাছের মতো, নয় পাখির মতো, পাখা না-গজিয়ে কেমন করে এই মাঝগঙ্গা থেকে সরে পড়লেন, বেঞ্চগুলো আর ডুগডুগি দুটো কেন এমন অদ্ভুত কাণ্ড করতে লাগল, এ কথা যেমন আমার মনে উদয় হয়েছে অমনি দেখি —স্টীমারখানা দু পাশে দুটো প্রকাণ্ড ডানা ছড়িয়ে সোজা সেই আকাশ-জোড়া ময়ূরপুচ্ছের মতো রামধনুকের ফটকটার দিকে উঠে চলল।

জল ছেড়ে শূন্যে খানিক ওঠবার পর দেখছি, অবিন উপরতলার সারেঙের কুটরি থেকে উঁকি মেরে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। তার পাশে সেই ময়ূরের-পালক-ওয়ালা অদ্ভুত মানুষটা আমাদের। আমি এদের কোনো কথা বলেছিলেম কি না মনে নেই, উত্তরে

একটা খুব গভীর গলায় শুনলেম, 'পালকের জাদুঘরে চলেছি ময়ূর-পুচ্ছধারীদের সপ্তম স্বর্গে!'

স্বর্গ এবং জাদুঘর-এর একটাতেও যাবার মতলবে আমি বাড়ি থেকে রওনা হই নি। তরী আমার বেরিয়েছে জোয়ার ঠেলে ; ভাঁটা কাটিয়ে ঘরে ফিরব, এই কথাই মনে ছিল। কাজেই আমি খুব চেঁচিয়ে বললেম, 'জাহাজ ভেড়াও, আমি নামতে চাই।'

কিন্তু, জাহাজ তখন তার তরুণী রূপ ছেড়ে পাগলা পক্ষীরাজ হয়েছে। আর, চালাচ্ছেন তাকে সেই পালকধারী! কাজেই কোনো ঘাটেই যে সে না দাঁড়িয়ে বরাবর রামধনুকের মট্‌কায় গিয়ে হ্রেষাধ্বনি করে হঠাৎ থামবে, তার আর বিচিত্র কী!

তিনটেতে আমরা পক্ষীরাজের পিঠ থেকে জ্বলন্ত উল্কার মতো কেন যে এতক্ষণ মহাশূন্যে ঠিকরে পড়ে নি, এইটেই আশ্চর্য! ময়ূরের পালকের ডগায় মাছি যেমন, তিনটিতে আমরা তেমনি সাত রঙের একটু কিনারা প্রাণপণে আঁকড়ে শূন্যে দুলছি, এমন সময় আমাদের পাণ্ডা সেই ময়ূরপুচ্ছধারী মানুষ-দাঁড়কাক রামধনুর ডগায় স্থির হয়ে বসে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। সেখানে কী আশ্চর্য পাখিরাই ঘুরে বেড়াচ্ছে! রঙিন পালকের আলোতে সেদিকটা কখনো দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নার মতো নীল, কখনো সকালের আকাশের মতো সোনালি, সন্ধ্যার আকাশের মতো রাঙা, জলের মতো ঝক্‌ঝকে রুপালি, ধানের খেতের মতো ঠাণ্ডা সবুজ। এই-বা নতুন পাতার মতো টাটকা, এই ঝরা পাতার মতো মলিন। রঙের খেলার সেখানে অন্ত নেই। তারই মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে একদল শিশু, পাখির ঝরা-পালক উড়িয়েউড়িয়ে ছড়াছড়ি করে তপোবনে শকুন্তলার মতো।

আমি অবিনের গা টিপে বললেম, 'ওহে, এরাই হচ্ছে পরী।'

পাণ্ডা একটু হেসে বললেন, 'আজ্ঞে, না। এরা হল রামধনুকের প্রাণ। এরা আছে বলেই রামধনুকের রঙ আছে। পরী দেখতে চান

pathagar.net

তো ওই দিকটায়, যে দিকটায় পালকের জাদুঘর, যেখানে পালকের দাম আছে।'

এই বলে তিনি দক্ষিণে প্রায় দক্ষিণ-দুয়ারের কাছাকাছি একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে দেখছেন দুখানা ডানা বেঁধে হাত দুটি বুকে রেখে. ওঁরা হলেন মানুষ, কেবল ডানার খাতিরে আমরা বলি ওঁদের এন্‌জেল্‌; আর কোনো তফাত মানুষের সঙ্গে নেই। আর ওই দেখুন গরুড়কে। শুধু ডানা নয়, পাখির ঠোঁটটা পর্যন্ত মুখোশ করে পরে দাস্যরসের রাজসিংহাসন আপনার রামা চাকরের হাত থেকে বেদখল করে নিয়ে বসে আছেন। ওই ঠোঁট আর ডানা বাদ দিলে উনি মানুষমাত্র। আর, ওই দেখুন বৃন্দাবনের শুক সারী। এঁদের রাজা গরুড় তবু প্রভুর সেবার জন্যে মানুষের হাত দুখানা রেখেছেন; কিন্তু এই গরুড়ের চেলা সেবাদাস-সেবাদাসীগুলি নিজেদের টিয়াপাখির খোলসে সম্পূর্ণ মুড়ে ফেলে আসলটাকে একেবারেই গোপন করে দিব্যি সুখে বিচরণ করছে। মানুষ যখন পালকের শিল্পে খুব বিচক্ষণ হয়ে ওঠেনি, অর্থাৎ তাঁদের গোঁজা পালক ও পাখনা সহজেই লোকের কাছে ধরা পড়ত, এরা তখনকার জীবের আদর্শ। এ অংশটাকে জাদুঘরের পুরানো অংশ বলা যায়। এর পরেই ও দিকে ঐতিহাসিক যুগের জীবগুলো। ক্রুজেডারদের মতো পালক তারা কেবল মাথার ঝুঁটিতে রেখেছে, বাকি সমস্ত দেহে লোহার সাঁজোয়া দিয়ে অনেকটা পাখির ধরনে নিজেদের সাজিয়েছে। এই সময় থেকে ডানার চাল উঠে গিয়ে পালকের ঝুঁটি বাহাদুর লোক মাত্রেরই মধ্যে ফ্যাশন হয়ে উঠল। টুপিতে, পাগড়িতে, মুকুটে, ঘোড়ার মাথায়, পালক-গোঁজার যুগ এটা! ময়ূরের পালক, বকের পালক, কাকের পালক, চিলের পালক, উটপাখি —ঘোড়াপাখি—সবার পুচ্ছ এরা বহন করেছে নিজেদের পুচ্ছ খসিয়ে রেখে। তার পর আধুনিক যুগের জীব দেখো। এখানে একদল শিরে-পুচ্ছ দেখা যায়; একদল দেখা যায় পালকের কলম-পেশা; আর একদল সম্পূর্ণ পালক গোপন করে পালকধারীর রাজা হয়ে কেবল পালকের রঙ গেরুয়া সাদা কালো ইত্যাদি গায়ে মেখে রাজত্ব করছে—

কেউ আদালতে, কেউ বিদ্যালয়ে, কেউ ছাপাখানায়, কেউ ডাক্তারখানায়, প্রকাণ্ড পালকধারীদের কনগ্রেসে কনফারেন্সে, স্ব-স্ব দেশে। এর পরে যে যুগ আসবে তার সোনার ডিম পালকের গদির উত্তাপে এখনো সিদ্ধ হচ্ছে। এই ডিম ফুটে যে বার হবে তার পালক পিঁপড়ের পিঠের দুখানি ডানার মতো হঠাৎ গজাবে, এইরূপই পণ্ডিতেরা বলেন। আর, সেই অদ্ভুত জীবের জন্মদিনের শোকোচ্ছ্বাসগাথা লেখবার জন্যে ময়ূরের ডানার গেরুয়া রঙের পালকের কলমটা কানে গুঁজে যে আসবে তার স্মৃতিসভার বিজ্ঞাপন এখন হতে বিলি আরম্ভ হয়েছে দেখো।'

বড়ো বড়ো শিল, পালক, ধুলোবালি, মুঠো মুঠো ঝুড়ি ঝুড়ি আমাদের মাথায় মুখে চোখে পড়ছে। রামধনুক আঁকড়ে আর থাকা চলে না। এর মধ্যেই তার সাত রঙ ফিকে হতে শুরু হয়েছে ; সম্পূর্ণ গলতে সাত সেকেণ্ডও লাগবে না।

এই ঝড়ের মুখে অবিন তার পালক-ছাপা কোটের বোতাম এঁটে, পাণ্ডাজি তাঁর ময়ূরপালকের চামর বাগিয়ে, উড়ে পড়বার জোগাড় করছে দেখে আমি বললেম, 'ওহে, আমার উপায়? আমার তো পালক নেই। আছে মাত্র গায়ে এই কাশ্মীরের পরীতোষ শাল। এর নাম পরী বটে, কিন্তু এর পালক মোটেই নেই। একে নিয়ে তো ওড়া চলবে না?'

'খুব চলবে। ওকে বুঝি বলে পরীতোষ? ওর ফরাসী নাম হচ্ছে পর্-ঈ-তাউস্। ময়ূরের পেখমের গোড়াতে যে ছাই রঙের নরম পালক লুকোনো থাকে, তাই দিয়ে এটা প্রস্তুত। বাদশারা তক্ততাউসে এই শালের বিছানা লাগাতেন ; এখন আমরা গায়ে দিয়ে থাকি। ভয় নেই, উড়ে পড়ো।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত শালখানা মুড়ি দিয়ে রামধনুকের ঝটকা থেকে ঝুপ করে আবার যে জাহাজ সেই-জাহাজেই নেমে পড়লেম। চোখ খুলে দেখলেম, যেখানকার সেইখানেই আছি—পূর্বের মতো শ্রীঅবনীন্দ্র। রামধনুক আর পক্ষীরাজের সঙ্গে অবিনটা পালিয়েছে।

pathagar.net

ছাইভস্ম

সবাই বলছে সেটা হাঙর, কিন্তু আমি বলছি, 'না, না, না !'

বালি-উত্তরপাড়ার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় জেলেদের জালে এই-যে জিনিসটা ধরা পড়েছে তা আমাদের জাহাজের লেট-শুশুক-সভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বাহন, জীবনশূন্য শুশুকের খালি মোষোক বৈ আর কিছু হতেই পারে না। সুতরাং আমাদের উচিত ছিল ভূতপূর্ব সব সভ্য মিলে খুব ঘটা করে লেট-সভার শ্রাদ্ধ করা। গঙ্গায় তখন তপসী মাছ যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছিল, এবং আমাদের মুখুজ্জেমশায় আমার খাতিরে ও শুশুকের প্রেতাত্মার প্রীত্যর্থে ভোজের দিনে বালি-উত্তরপাড়ায় যতরকম পটোল বাজারে আসে ও খেতে জন্মায় সব তুলে নেবার জন্যে কোমর বেঁধে প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু আমার সে প্রস্তাবটা কেউ গ্রাহ্যই করলেন না। আমাদের লেট-সভার সদ্‌গতি হল না ; উৎপাত শুরু হল জলে স্থলে সভার সভ্যদের উপরে ; দেশে বিদেশে আমাদের কজনের উপরে উৎপাত শুরু হল। হৃষীকেশে দুজন সাহেব, কোথাও কিছু নেই, খামকা দুটো রুইকাতলা ছিপে ধরে মৎস্যহিংসা করে বসল। এতে শুশুক-সভার সমস্ত হিঁদু সভ্য বিষম ব্যথা পেলেন। এ দিকে আবার আমাদের বাঁড়ুজ্জেমশায় কুটিঘাটা থেকে উত্তরপাড়া পর্যন্ত বেড়াজাল ফেলেও আর তাপসী মাছ গ্রেফতার করতে পারলেন না। সমুদ্র ছেড়ে গঙ্গার খালে তপস্যা করতে আসাটা যে মূর্খের মতো কাজ হয়েছে, এটা তাদের কে যে বলে দিলে তা জানা গেল না।

তার পর, উত্তরপাড়ার মালিনীকে আমাদের মুখুজ্জে অভি-সম্পাতের ভয় দেখিয়েও তাঁর জন্যে নিত্য পটোল তুলতে রাজি

pathagar.net

করতে পারলেন না। নিমতলার অবিনাশবাবু আমার ছেলেবেলার বন্ধু হয়েও আমার নামে মানহানির মকদ্দমা আনবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন; অজুহাত যে, আমি 'ভারতী'তে ইদানীং যে গল্পগুলো অবিন নাম দিয়ে লিখছি, সেগুলো তাঁকেই উদ্দেশ করে গালাগালি দেবার মতলবে ছাপানো। অবিন যে 'অবনী'রই সূক্ষ্মশরীর, আর মুখে ছাড়া লিখে গালাগালি ও লিখে ছাড়া হাতে মারামারি যে আমার দ্বারা একেবারেই সম্ভব নয়, এটা আমি কিছুতেই অবিনাশ-বাবুকে বোঝাতে পারছি নে।

শেষে, এই মাসে ঘোড়া-লাভ আমার কুষ্টিতে পষ্ট করে লেখা রয়েছে। আমাদের লীলানন্দ স্বামীজিও বললেন, এবারের ডার্বিতে জুয়াখেলার টাকাটা কাগজের দুখানা ডানা মেলে পক্ষীরাজের মতো আমারই দিকে আসছে। কিন্তু, এ সত্ত্বেও আমার অশ্বমেধ পণ্ড করে ঘোড়াটা পথ ভুলে অন্যের আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল।

এই-সব উৎপাত দেখে আমার মন একেবারে উদাস হয়ে গেল। আমি অবিনকে কিছু না বলে-কয়ে জাহাজ ছেড়ে একেবারে নৈমিষারণ্যের দিকে বেরিয়ে পড়লেম, 'বিফল জনম, বিফল জীবন' একতারাতে এই গান গাইতে গাইতে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াটা কিংবা তার ডানার এক টুকরো কাগজও যদি তখন—যাক সে দুঃখের কথায় আর কাজ নেই।

কাশীর দশাশ্বমেধের ঘাটে সবে ডুবটি দিয়ে উঠেছি, এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে হাত ধরে বললেন, 'ব্যস্ করো, বেটা, চলো হরদোয়ার্‌মে কুম্ভকা অস্নান করেঙ্গে।'

কী জানি সন্ন্যাসীঠাকুরের কী শক্তি ছিল, আমি জড়ভরতের মতো জল থেকে উঠে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে দেখি পায়ে ধুলো নেই। আমি তখনি বুঝলেম, ঠিক লোক পেয়েছি। একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে বললেম, 'ছলনা করছ, ঠাকুর? এখান থেকে হরিদ্বার এক দিন এক রাত্তিরের পথ; আর পাঁজিতে লিখছে,

আজ একটা-উনপঞ্চাশে হল কুম্ভ!'

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, 'বেটা, কুম্ভকা অর্থ ক্যা আগে তো সমঝ লেও!'

ঘাট থেকে সন্ন্যাসীর আস্তানা মণিকর্ণিকার শ্মশান বেশিদূর হবে না; কিন্তু ওইটুকুর মধ্যে ঘটাকাশ যে অর্থে ভরা, পূর্ণকুম্ভের ঘড়ার মতো শুধু গঙ্গাজলে ভরা নয়, সেটা ঠাকুর যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। যিনি ঘটাকাশ এক নিমেষে অর্থে ভরিয়ে দিতে পারেন, আকাশকুসুমের মতো দেখালেও ডার্‌বিখেলার ঘড়াভরা অর্থলাভের সদুপায় যে তাঁরই দ্বারা হতে পারবে, আর কারো দ্বারা নয়, এটা আমার বিশ্বাস হল। আমি ভক্তিভরে, গদ্‌গদভাবে বাবার ঠিক পিছনে পিছনে চললেম। কাগজের অর্থ নয়, রূপেয়া-ভরা কুম্ভও নয়, চক্‌চকে আকবরি-মোহরের ঢাকাইজালা তখন আমার যেন চোখের সামনে উদয় হয়েছেন, এমনি বোধ হতে লাগল।

আমি বাবাকে নির্জনে আপনার মনের দুঃখ জানাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি, বাবা বোধ হয় এটা আগে থাকতেই জানতে পেরেছিলেন। তাই আজ আমার ধৈর্য পরীক্ষা করবার জন্যেই যেন তিনি প্রায় বারোটা পর্যন্ত কাশীর বাঙালিটোলার অলিতে গলিতে ঘিউ আর আটা ভিক্ষে করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু, আমি জেনেছিলেম যে, এবার ঠিক লোকের নাগাল পেয়েছি। সোনা করবার ভস্ম, গাছ চালাবার মন্ত্র, এমনি একটা-কিছু এবার আর না হয়ে যায় না। কাজেই খিদেতে তেষ্টাতে ভিতরটা আমার শুকিয়ে উঠলেও, আমার চোখকে আমি একটুও শুকোতে দিলেম না, প্রেমাশ্রুতে বেশ করে ভিজিয়ে রেখে দিলেম।

যখন আশ্রমের দরজায়, তখন বাবা একবার আমার দিকে কটাক্ষ করে বললেন, 'আউর ক্যা? কুম্ভ আউর উস্‌কা অর্থ তো মিল্ গিয়া। আভি ঘর যাও।'

এখনো পরীক্ষা! ভাঁড়ার ঘরের দরজার কাছে এনে বলা হচ্ছে,

pathagar.net

'ঘরে গিয়ে ভাত খাওগে !' আমি খুব জোরের সঙ্গে বললেম, 'বাবা, অমন অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। আমি এইখেনে পড়ে রইলুম; কৃপা করতেই হবে। বাবার কাছ থেকে কিছু চীজ না নিয়ে আমি নড়ছি নে। প্রাণ যায়, সেও স্বীকার।'

বাবা আমার কথার আর-কোনো জবাব না দিয়ে আটা আর ঘি মেখে রুটি সেঁকতে বসে গেলেন। আমার দিকে আর দৃকপাতও করলেন না।

দুপুরের রোদে আমি একলা মুখ শুকিয়ে এক গাছের তলায় বসে আছি, এমন সময় ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'বাবা, তোমার কাছে কিছু টাকাকড়ি আছে ?'

কী আশ্চর্য! একেবারে বাংলা কথা, টানটোন সব বাঙালির মতো, কিচ্ছু বোঝবার জো নেই যে তিনি পশ্চিমের খোট্টা !

'পয়সা থাকলে কি আমার এমন দশা হয়, বাবা !' বলেই আমি চোখ মুছতে থাকলেম।'

বাবাজি তখন আমাকে কাছে বসিয়ে, পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'তাতে আর দুক্খু কী! আমি বুঝেছি, তোমাকে এই কুম্ভমেলার দিনে, একলা দশাশ্বমেধে ডুব দিতে দেখেই আমি বুঝেছি— থার্ড ক্লাসের ভাড়াটা পর্যন্ত তোমার অভাব। তা. কেঁদো না, বাবা, আমি এখনি তোমাকে কুম্ভস্থলে পাঠাব। এই ঘটিটায় ইঁদারা থেকে একটু জল আনো তো।'

আমার তখনো মোহ কাটে নি। হরিদ্বারে কুম্ভস্নান আমার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হয় যখন কাশীতে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি, হিন্দু ইউনিভারসিটির ঘড়ির কাঁটা একটা-উনপঞ্চাশে পৌঁচেছে প্রায়! যেমন এই কথা মনে করা, অমনি বাবা তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটি আমার কপালে ঠেকিয়ে দিলেন। ব্যস্, একেবারে হরিদ্বারে উপস্থিত! সেই পিতলের লোটাটি পর্যন্ত আমার হাতে-হাতে হরিদ্বারে এসে হাজির! অবশ্য, হরিদ্বার আমি এর পূর্বে দেখি নি। কিন্তু বাবাকে দেখে যেমন বুঝেছিলেম. ঠিক-লোকটি পেয়েছি,

pathagar.net

এবারেও তেমনি বুঝলেম, ঠিক জায়গাটিতেই এসে পৌঁচেছি। শুধু তাই নয়, মনে হল, যেন এইখানে আমি অনেক দিনই এসেছি ; আর-পাঁচজনের মতো আমিও আজ এক কোমর বরফ জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গার স্তব আওড়াচ্ছি, আর থেকে থেকে ডুব দিচ্ছি। চারি দিকের লোকজন, পাহাড়পর্বত, মন্দিরঘাট সত্যির চেয়ে বেশি সত্যি হয়ে যেন আমার চোখে পড়তে লাগল।

এক রাজা হাতি ঘোড়া লোক-লস্কর আর বন্ধ দু-তিনখানা পালকিসুদ্ধ আমার পাশে স্নানে নামলেন। পবিত্র জলের পরশ পেয়ে কাঠের পালকিগুলো বুঝি সোনার পালকি হয়ে যায়, আর হাতি-ঘোড়াগুলো বুঝি-বা রাজা-রাজড়া হয়ে দেখা দেয়. এই ভেবে আমি সে দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় একটা মোটা-পেট পুলিসম্যান পিছন থেকে আমাকে ধমক দিয়ে বললে, 'এ বাবু, ক্যা দেখ্‌তা ? ভাগো হিঁয়াসে।'

আমি পুলিসের ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা কুলকুচি করে যেমন উঠে দাঁড়িয়েছি অমনি চারি দিক থেকে যেখানকার যত পাণ্ডা 'হাঁ হাঁ, করলে কী! গঙ্গায় কুলকুচি করলে! সবার স্নান মাটি হল!' বলে তাদের নামাবলীর পাগড়িতে আমায় পিছুমোড়া করে বেঁধে কিল চাপড় মেরে আধমরা করে একটা অন্ধকার ঘরে টেনে ফেলে দিলে।

তার পর কী হল জানি নে, কতক্ষণই বা অজ্ঞান ছিলেম বলা যায় না. কিন্তু খানিক পরে চোখ চেয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে গিয়ে দেখি, আমি কাশীতে! বললে বিশ্বাস যাবে না, আমার গা কিন্তু তখনো ভিজে ছিল, যেন সেইমাত্র স্নান করে উঠেছি! কাশির হিন্দু কালেজের ঘড়িতে তখন ঢঙ ঢঙ করে দুটো বাজল। একটা-উনপঞ্চাশ থেকে দুটো-এরই মধ্যে হরিদ্বারে গিয়ে কুম্ভস্নান, রাজদর্শন, কুলকুচি, মার খাওয়া এবং পুনরায় কাশীতে ফিরে আসা, সমস্তটা স্বপ্নে দেখতে গেলেও এর চেয়ে ঢের সময় লাগত যে!

বাবা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন. 'বেটা. কুছ চোট লাগা ?'

pathagar.net

আমি একেবারে গদ্‌গদস্বরে বললেম, 'চোট লাগবে, বাবা! আপনার কৃপায় একটি আঁচড় কি একটি দাগ পর্যন্ত নেই, দেখুন।'

এবারে আমি খুব শক্ত করে বাবার পা ধরে রইলেম। এত শক্ত যে আমাকে ছাড়িয়ে বাবার আর এক পা'ও নড়বার সাধ্য রইল না। ওঁর কাছে কিছু আদায় করে নেব, এই প্রতিজ্ঞা। আমার সম্বলের মধ্যে তখন বাঙালিটোলার বাসাবাড়িখানি। আমি যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেও ভাড়াটেদের সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে বাবাকে এনে সেইখানে বসালেম। তেতলায় একখানা ছোটো ঘর, তারই সামনে একটু ছাদ। সেইখানে গুরুদেবের উপদেশমত আমি যোগাসন প্রাণায়াম উৎসাহের সঙ্গে শুরু করে দিলেম।

ফৌজের জমাদার, হাবেলদার, কাপ্তান, কমাদা—সবার যেমন রকম-রকম পোশাক, ইউনিভারসিটির নানা ডিগ্রীর যেমন রঙ-বেরঙের ঘাঘরা, তেমনি সন্ন্যাসীদের দলেও সিদ্ধির তারতম্য-হিসেবে রকম রকম গেরুয়া আর রকম রকম ফ্যাশনের কৌপীন, পাগড়ি, জটা, তিলকের সাজসজ্জা আছে। আমি তখন যোগসাধনের ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসে বা ইন্‌ফ্যানট্রি দলে সবে ভর্তি হয়েছি। কাজেই আমার উর্দিটা হল সাদা লুঙ্গি, সাদা পাঞ্জাবি-কোর্তা, মাথায় সাদা পাগের লম্বা লেজ আর সেই লেজের গোড়াতে একটুখানি গেরুয়া পাড়, হাতে বাঁশের ছড়ি, পায়ে খড়ম, গলায় তেঁতুলবিচির মালা, কপালে ছাই। সারা পাগড়ি-কোর্তা-লুঙ্গি গেরুয়া হয়ে শেষে খালি গায়ের চামড়ায় গিয়ে পৌঁছতে আমার অনেক বাকি। আমার যিনি গুরু তিনিও অতদূর এখনো অগ্রসর হতে পারেন নি, কিন্তু তাই বলে হতাশ হলে চলবে না।

বাবার উপদেশমত খুব উৎসাহের সঙ্গে সবটা গেরুয়া-উর্দি যত শীঘ্র পারি লাভ করার চেষ্টা করতে লাগলেম। ও দিকে বাবার সেবা করতে, সন্ন্যাসী খাওয়াতে, তীর্থ সারতে, আমার জেবের সব গিনি-সোনা এক মোড়ক হরিতালভস্মে ক্রমে পরিণত হয়েছে। আমার হাতে সেই ভস্মটুকু দিয়ে বাবা বললেন, 'যাও, বাবা,

pathagar.net

এখন সংসারে ফিরে যাও, সেখানে তোমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে।'

আপিসের কাজ, ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, অনেক কাজই বাকি রেখে চলে এসেছি। কিন্তু, সে যে হল অনেকদিন। কাজগুলো আমার জন্যে এখনো বসে আছে কি না জানি নে। তা ছাড়া হাতে আমার বাকি রয়েছে মাত্র সেই হরিতালভস্মের মোড়ক। সেটাও সত্যি ভস্ম কি না, তারও পরীক্ষা করতে সাহস হচ্ছে না। অবিনকে তখন একখানা চিঠি লিখে সব খবর জানাবার ইচ্ছে হল।

আমি হরিতালভস্মের মোড়ক বাবার কাছে বাঁধা রেখে ডাক-টিকিটের জন্যে দুটো পয়সা চাইতে গেলুম। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বাবা, আমরা মুক্তির মন্ত্র সাধন করি, কোনো কিছু বাঁধা রাখা তো আমাদের দ্বারা হতে পারে না। সন্ন্যাসী কি কখনো মহাজন হয়, বাবা?'

বাবার মধ্যে মহাজনি যে এতটুকু নেই, তাই দেখে ভক্তিতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমি 'বিফল জনম, বিফল জীবন' আর-একবার মনে মনে গাইতে গাইতে বাঙালিটোলার গলি পেরিয়েছি, এমন সময় অনেকদিনের পর অবিনের সঙ্গে দেখা।

সে ঠিক তেমনি আছে, কোনো বদল হয় নি। কথায়-কথায় জানলেম যে গয়ায় চলেছে—আমাদের জাহাজের সেই লেট-সভার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার যতরকম সভা আছে ও নেই, ব্রাহ্মণশূদ্রনির্বিশেষে সবকটার পিণ্ডদান করতে। আমারও তখন পিণ্ডি দেবার জন্যে হাত নিস্‌পিস্ করছিল, কিন্তু কার সেটা আর বলে কাজ নেই।

গাড়িতে উঠে আমি অবিনকে বললেম, 'ওহে, গয়ার সাধু-সন্ন্যাসীদের খুশি করবার মতো কিছু পকেটে এনেছ তো?'

অবিন হাতের মোটা লাঠিগাছা দেখিয়ে বললে, 'যথেষ্ট!'

কাশী থেকে গয়া কতদূরই বা? কিন্তু, সময় তো লাগছে অনেকটা! এই ভাবতে ভাবতে চলেছি, এমন সময় অন্ধকারের

pathagar.net

মধ্যে একটা স্টেশনে গাড়ি থামতেই অবিন চট্ করে আমার হাত ধরে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। একটা ঝড় হয়ে প্ল্যাট্‌ফরমের সব আলো নিভে গেছে। অন্ধকারে একটা সাদা মোটর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেঁপু দিচ্ছিল। অবিন আমায় নিয়ে তাতে উঠে বসল। মোটরখানা কোনো হোটেলের ভেবে আমি অবিনকে বললেম, 'ওহে, আমার এ বেশে তো হোটেলে ওঠা সম্ভব হবে না। কোনো ধর্মশালায় গিয়ে থাকলে হয় না ?'

অবিন আমার পিঠ চাপড়ে বললে, 'ধর্মশালা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি যে ! এখনো বুঝি ওটার মায়া কাটাতে পার নি ?'

বলতে বলতে গাড়ি একটা ব্রীজ পেরিয়ে বাঁ হাতে মোড় নিয়ে দাঁড়াল। অবিন গাড়ি খুলে লাফিয়ে পড়ল। আমিও নামব, এমন সময় আমার পাগড়ির লেজটা গেল মোটরের একটা চাবিতে বেধে ! লেজের গেরুয়া অংশ, তার সঙ্গে অনেকটা সাদা ফালিও, ভাড়ার উপর বখশিশ হিসেবে গাড়োয়ানকে দিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে নদীর ঘাটে শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডদান করতে বসে গেলেম। অনেকগুলো সভা, পিণ্ডি তো কম দিতে হল না ! সব সারতে ভোর হল। শ্রাদ্ধ সেরে সূর্যের প্রণাম করতে গিয়ে দেখি, আমাদের বড়োবাজারের শ্রাদ্ধঘাটে বসে আছি। সেই সিঁড়ি, সেই মার্বেল-পাথর-মোড়া ঘরে তেমনি মিন্‌টান্ টালির বাহার। আমি তো অবাক। সন্দেহ হল যে, হরিদ্বারযাত্রাটার মতো এ যাত্রাটাও বুঝি-বা অতিশয় সত্যি !

অবিনের দিকে চাইলেম, তারও চেহারাটা কেমন ঝাপসা বোধ হল, যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তাকে দেখছি ! কুয়াশাটা আমার মাথার ভিতরে কি বাইরে জমা হয়েছে, সেটা বুঝতে না পেরে আমি কাপড় ছেড়ে ব্রহ্মতেলোয় হাত বোলাচ্ছি, এমন সময় আমাদের জাহাজের বাবাজি এসে আমার সামনে 'জয় সত্যনারায়ন' বলে হাত পাতলেন। আমি তাঁকে সত্যিই ষোলো আনার এক আনা দেব বলে জেবে হাত দিতেই আমার হাতে ঠেকল সত্যনারানের কোনো

কাজেই যেটা লাগবে না হরিতালভস্মের সেই মোড়ক— যেটা অবিনের চেয়ে, হরিদ্বারের চেয়ে, কাশী গয়া, কলকাতার মোটরগাড়ি, শ্রাদ্ধের মন্তর, বাবাজি, এমন-কি আমার নিজের চেয়েও সত্যি, সত্যি, সত্যি— সত্যি ছাড়া মিথ্যে নয়।

আটটা-উনপঞ্চাশের জাহাজ বাঁশি বাজিয়ে পন্টুনে লাগল। অবিন, আমি, বাবাজি, এবং আরো প্রায় জন-পঞ্চাশ গিয়ে জাহাজের কেউ প্রথম, কেউ দ্বিতীয়, কেউ তৃতীয়-শ্রেণী, কেউ-বা কোনো শ্রেণীই নয়, দখল করলেম।

pathagar.net

লুকিবিদ্যে
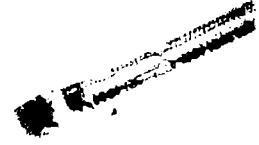
টিকটিকি, গিরিগিটি, মশা, মাছি, ঘুঘু, গায়ে-পড়া আলাপী, ঘাড়ে-চড়া বন্ধু, এককথায় সমস্ত পরকীয়া সাধকদের দলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখা চলে এমন লুকিবিদ্যেটা আংটি করে কর্তা আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন শুনে আমাদের কৌতূহলের সীমা রইল না। আমরা আংটির কেচ্ছা শোনবার জন্যে কর্তাকে চেপে ধরলেম। কোন্ সূত্রে কোনখান থেকে আংটিটা তাঁর আঙুলের গাঁটে এসে যে আটকে রইল, সেটা জানাতে কর্তা নারাজ। কাজেই কাণ্ডের আদিপর্বের শেষ থেকে তিনি আরম্ভ করলেন—

'অন্যের দেশালাইয়ের বাক্স যেমন করে অজান্তে সময়ে অসময়ে আমাদের পকেটে থেকে যায়, তেমনি করে রাঙ এবং সীসা এই দুই ধাতু দিয়ে গড়া লুকিবিদ্যের এ আংটি হাতে নিয়ে সুন্দরবনের অঘোরপন্থীদের আড্ডা ছেড়ে হাঁটাপথে অনেক ঘুরতে ঘুরতে শেষে আমি তমলুকে এসে হাজির। তমলুক খুব একটা ভারী শহর। সেখানে আমি একবার ছেলেবেলায় আমার বড়োমামার সঙ্গে গিয়েছিলুম। মামা তখন ফুরুস কোম্পানির মুচ্ছুদ্দি। সাহেবটা যে পাজি ছিল, তা আর কী বলব! একবার এক কেরানি তার কাছে বাপ মরে বলে ছুটি চাইতে সে বললে কিনা, 'ইয়োর ফাদার হ্যাজ নো বিজ্‌নেস টু ডাই হোয়েন বজেট প্রেসার ইজ গোয়িং অন!' দেখো দেখি, বাপ মরে, তাকে কিনা এই কথা! সেকালের সাহেব দু-একটা ভালোও ছিল! টুনি—সে বড়ো মজার সাহেব ছিল। ধুতি পরে সে কালীপুজোর যাত্রা শুনতে যেত। তার পাখি-শিকারে ভারি শখ। সেটার এক রোগ ছিল এই যে, পাখিটাকে মেরেই

pathagar.net

আগে তার লেজটা কেটে নেবে ! সেইজন্য তার নামই হয়ে গিয়েছিল লেজ কাটা টুনটুনি। সে প্রথম আসে ১৮৩৫ সালে ফৌজের ডাক্তার হয়ে। তার পর মিউটিনির কিছু আগে একটা নীলকরের মেয়েকে বিয়ে করে কোন্ বড়ো মিলিটারি পোস্টে বহাল হয়ে সাংহাই চলে যায়। সেইখেনে বসে লোকটা সাংহাই টু ইণ্ডিয়া একটা রেল খোলবার প্ল্যান হোম গভর্মেণ্টকে পাঠায়। তখন চীনে-মিস্ত্রি আসত জাহাজে করে, আমরা দেখেছি। —ওই বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের দু ধারে জুতোওয়ালা। সন্ধ্যাবেলা ছুরি হাতে তারা ঘুরে বেড়াত। যত সেলার আর চীনের আড্ডা ছিল ওইখানটায় ! বেটারা যে জুতো বানাত, বাপু, তেমন জুতো এখন পাওয়াই যায় না। ওই 'আচীন', ওর অনেক দিনের দোকান। আমার জ্যাঠার মামাশ্বশুর, তিনি ওই দোকান থেকে জুতো নিতেন। সেকালে তাঁর মতো শৌখিন ছিল না। ওই যেখানটায় এখন রিপন কালেজ হয়েছে, ওইটে ছিল তাঁর বৈঠকখানা। তাঁর বাগানে একটা সাদা চাঁপার গাছ ছিল ; তাই থেকেও পাড়াটার নাম হয়েছিল চাঁপাতলা। শুনেছি সেই চাঁপাফুলে তাঁর দোলমঞ্চ সাজানো হত। দেলোয়ার খাঁর নাম শুনেছ তো ? ওই তাঁরই ওস্তাদ ; তাঁর কাছে চাকর ছিল। ওই মিশনারিরা তাঁর ছিরামপুরের বাগানখানা কিনে প্রথম ছাপাখানা বসায়। তখন সব কাঠের টাইপ। রামধন নামে এক বেটা যে কারিকর ছিল, তার মতো পরিষ্কার অক্ষর কাটতে কেউ পারত না, বাপু ! তার বংশের একটা ছোঁড়া এখন আমাদের পাড়ায় ওষুধের দোকান করে ডাক্তার হয়ে বসেছে। সবপ্রথম এ দেশে বিলিতি ওষুধের ডাক্তারখানা খোলেন আমাদের নাকাসিপাড়ার শ্যাম ডাক্তার। সাহেবরা তাঁর ওষুধ ছাড়া খেত না। কবিরাজগুলো কিন্তু তাতে বড়ো চটেছিল—চটবারই কথা !'

আমরাও কর্তার গল্পের বহর দেখে যে না-চটেছিলুম তা নয়। কথাটা আংটি থেকে কবিরাজি শাস্ত্র, সেখান থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাস, মামাশ্বশুরের রূপবর্ণন, মিশনারিদের জুয়োচুরি, ব্রাহ্মদের ভণ্ডামো,

pathagar.net

চৈতন্যদেবের কয় পার্শ্বদের সঠিক জীবনবৃত্তান্তে এসে পৌঁছল। তার পর বুদ্ধের দাঁতের হিসেব থেকে ক্রমে যখন রাসমণির মন্দির যে মিস্ত্রি বানিয়েছিল সে যে হিন্দু নয়. মুসলমান, এবং তার নাতির নাতি এখন পোর্ট-কমিশনারের এই জাহাজের খালাসি হয়েছে, এইরকম একটা জটিল সমস্যাতে এসে পড়ল, তখন আমাদের জাহাজ প্রায় বড়োবাজার পৌঁচেছে।

আমি অবিনের গা টিপে বললেম, 'ওহে লুকিবিদ্যেটা কি লুকিয়েই থাকবে ? আংটিটার তো কোনো সন্ধান পাচ্ছি নে !'

'তার পর আংটিটার কী হল, কর্তা ?' বলেই অবিন চোখ বুজলে।

গল্প চলল, 'লুকিবিদ্যে বড়ো সহজ বিদ্যে নয় ! রাজা কেষ্টচন্দ্রের সভায় নবরত্নের এক রত্ন রসসাগর, তিনি লুকিবিদ্যে জানতেন। লর্ড ক্লাইবের জীবন-চরিতে এই রসসাগরের লুকিবিদ্যের কথা লেখা আছে—'

লর্ডক্লাইব থেকে ফোর্ট উইলিয়াম, সেখান থেকে ব্ল্যাক হোল্ ও সমস্ত বাংলার ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে গল্প ক্রমে রুমের বাদশার কত টাকা, রামমোহন সাহা কী দিয়ে ভাত খেতেন, এমনি সব ঘরাও খবর আবিষ্কার করতে করতে বড়োবাজারের পন্টুনের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চলল—আংটির দিক দিয়েও গেল না ! কর্তার শেষ বক্তব্য দেশের এক নমস্য ব্যক্তির নামে একটা কুৎসা। ভদ্রলোকটির খুব আত্মীয়রাও যে-খবর ঘুণাক্ষরে জানে না, এমন একটা গোপনীয় সংবাদ চুপিচুপি জাহাজের সকলকে জানিয়ে এবং কাউকে বলতে মানা করে দিয়ে কর্তা ডাঙায় পা দিলেন।

আমি অবিনকে বললেম, 'ওহে যথার্থই কর্তা লুকিবিদ্যে জানেন। গল্পটা কিছুতেই ধরা গেল না !'

অবিন খুব গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি ওইজন্যেই তো ওঁর নাম দিয়েছি আবিষ্কর্তা ! নিজের খবর এঁর কাছে লুকোনো থাকে, আর পরের গোপনীয় খবর আবিষ্কৃত হয় এঁর কাছে ওই আংটির প্রভাবে।

pathagar.net

পরের ছোটোখাটো ব্যবহারের জিনিস—চুরুট, দেশলাই, পান মায় তার ডিবে, এঁর পকেটে আপনি গিয়ে প্রবেশ করে ; পরের লাঠি, ছাতা, বই ইত্যাদির মতো সামগ্রী আপনি গিয়ে হাতে ওঠে ; পরের বিত্তেয় ইনি পণ্ডিত ; পরচর্চায় ইনি অদ্বিতীয় পরকীয়া সাধক ; ইনি পরের যা-কিছু পার করবার কর্তা—আপনার কেউ নয় অথচ আমারও কেউ নয়।'

pathagar.net

সিন্ধু তীরে

pathagar.net

মিশনারি বন্ধু আমার কোণার্ক যাত্রার নাম শুনিয়াই বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং কিঞ্চিৎ মুখভঙ্গিসহকারে বলিয়া উঠিলেন, সে স্থানে কী দর্শনীয় আছে !'

মিশনারিটি সেই ধরনের লোক, গির্জা তুলিয়া যাঁহারা জগবন্ধুর মন্দির দমাইতে উদ্যত, নাচ যাঁহাদের চক্ষুশূল, গান যাঁহাদের কাছে কুরুচি, কদম্বতরু অশ্লীল বৃক্ষ এবং কৃষ্ণলীলা তদপেক্ষা অধিক-কিছু ! এরূপ বন্ধুর সহবাসও যে সময়ে সময়ে আমাদের অরুচিকর হইয়া পড়ে এবং যেটা তাঁহারা দর্শনীয় বলেন না সেটাই আমাদের কাছে আদরণীয় হইয়া থাকে, এটা আমার বন্ধুকে বুঝাইতে সময়ের বৃথা অপব্যয় না করিয়া আমি এবারে সত্যই কোণার্ক যাইবার আয়োজন করিলাম ঠিক সেইগুলাই দেখিতে, পাদরি সাহেবের মতে যেগুলা মোটেই দর্শনীয় নয়।

বছরকতক পূর্বে আমি পুরীর পত্রে শ্রীক্ষেত্র সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়াছে। হোটেলে, মোটরগাড়িতে, বৈদ্যুতিক আলোয় পুরী অন্ধকার হইয়াছে এবং সুরুচিসঙ্গত সাহেবি পিয়ানো-বাদ্যের টুংটাং ধ্বনিতে সাগরের কল্লোল চাপা পড়িয়াছে।

সুতরাং, মোগলাই জোব্বার উপরে প্রকাণ্ড একটা সাহেবি সোলা-টুপি চাপাইয়া, একগাছা মোটা লাঠি ও এক লণ্ঠন লইয়া, ছয়-ছয় পালকি বেহারার সঙ্গে একেবারে পূব মুখে দৌড় দিবার বন্দোবস্ত করিলাম—সুরুচির এবং ভদ্রতার কোনো দোহাই না মানিয়া। কিন্তু, যাত্রার পূর্বে মাথার উপরে একখণ্ড মেঘ এমন ঘনাইয়া আসিল যে মনে হইল, বুঝি-বা পাদরি সাহেবের অভিশাপ

pathagar.net

ফলিয়া যায়!

আমাদের যাত্রার মুখে মেঘ কাটিয়া পঞ্চমীর চাঁদ প্রকাশ পাইয়াছে। অদূরে চক্রতীর্থ—বালুকাস্তূপের ধবলতার উপরে, আধুনিক হইতে দূরে, অতীতের একটি মরীচিকার মতো দেখা যাইতেছে।

চক্রতীর্থ পার হইয়া আর অধুনাতনও নাই, পুরাতনও নাই, রহিয়াছে কেবল চিরন্তন, নীরবতা—অন্তহারা অস্ফুটতাকে আলিঙ্গন করিয়া। মানুষের পদশব্দ সেখানে লুপ্ত, সাগরগর্জনে স্বপ্নের প্রায়—পাই কি না-পাই। এই শূন্যতা এত বিরাট যে, চাঁদের আলো সেও সেখানে অন্ধকার ঠেকিতেছে; ছায়ার বৈষম্য দিয়া আলোকে ফুটাইতে, প্রতিঘাত দিয়া শব্দকে জাগাইতে সেখানে কিছুই নাই! অথচ মনে হয় না যে একা! সঙ্গে ছয়-ছয় বেহারা চলিয়াছে বলিয়া নয়; কিন্তু এই প্রকাণ্ড শূন্যতা যে নির্জীব নহে, সেটা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি বলিয়া। এটা যে শ্মশান নয়, এখানেও যে বিরাট প্রাণের স্পন্দন অবাধে আমার চারি দিকে হিল্লোলিত, তাহা বেশ বুঝিতেছি। স্তব্ধ রাত্রি জুড়িয়া লক্ষকোটি কীটপতঙ্গের ঝিনি ঝিনি দূরে অদূরে কাহাদের নূপুরশিঞ্জিনীর মতো তালে তালে উঠিতেছে পড়িতেছে—তাহা কানে আসিতেছে না সত্য; অকূল অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদের সাড়া পাইয়া হরিণের পাল ছুটিয়া চলিয়াছে—চোখে পড়িতেছে না বটে; কিন্তু, মন তাহার সহস্র পরিচয় পাইতেছে এবং আপনাকে নিঃসঙ্গ মানিতেছে না! লোকালয়ে নিজেকে অনেক সময় একাকী বোধ করিয়াছি, কিন্তু কোণার্ক যাত্রার প্রথমেই এই-যে শিশুর মতো ধরিত্রীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ার আনন্দ, নিখিলের সহিত আপনাকে সঙ্গত জানার আনন্দ, ইহাতে প্রাণ যেন দুলিতে থাকে—মনেই আসে না, একা চলিয়াছি। চলার আনন্দ! নিখিলের সহিত দুলিয়া চলার আনন্দ! শূন্যের মাঝ দিয়া উড়িয়া চলার আনন্দ! প্রদীপ নিভাইয়া আলোকের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া ভাসিয়া চলার আনন্দ!

চক্রতীর্থ হইতে বালুঘাই পর্যন্ত সমস্ত পথটা আনন্দের একটা জাগরণের মধ্য দিয়া যেন উড়িয়া আসিয়াছি। এইখানে আসিয়া প্রাণের দুয়ার সহসা যেন বন্ধ হইয়া গেছে—মন যেন আপনার দুই ডানা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছে। নিশ্চল মেঘে চন্দ্রতারকা আচ্ছন্ন : নীরব অন্ধকারের মাঝে নিস্তরঙ্গ বায়ুরাশি ; কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই ! মনে হইতেছে, এ কোথায় আসিলাম ! কোন্ মৃত্যুর দেশে পায়ে পায়ে অর্ধরাত্রে আমরা এই কয় ক্ষুদ্র প্রাণী। এ সময়ে আলোর জন্য, ধ্বনির জন্য, অন্ধকারে কোথাও একটা-কিছুকে দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। মন চাহিতেছে চলি, কিন্তু সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া গেছে !

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পালকি বাহকদের করুণ ক্রন্দনগান শুনিতে শুনিতে চলিয়াছি। কোথায় চলিয়াছি, কেমন করিয়া চলিয়াছি, কেনই-বা চলিয়াছি, তাহা আর মনে আসিতেছে না। শুধু বোধ হইতেছে, যেন প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার গোলকের ভিতর দাঁড়াইয়া, একটি পাও অগ্রসর না হইয়া, আমরা কেবলই তালে তালে পা ফেলিতেছি—'পহর-রাতি, পান-বিঁড়িটি ! পান-বিঁড়িটি, পহর-রাতি !'

বালুঘাই পার হইয়া চলিয়াছি। পহর-রাতি পান-বিঁড়িটি এবং লণ্ঠনের বাতি, তিনে মিলিয়া মনকে ঘিরিয়া একটা যেন স্বপ্নের সৃজন করিয়াছে। মাঝে মাঝে এক-একটা তালগাছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া হঠাৎ চোখে পড়িয়া আবার কোথায় লুকাইয়া যাইতেছে ! চারি দিকে যেন একটা লুকোচুরির খেলা চলিতেছে ; মরীচিকার মায়া দেখা দিতেছে, ঢাকা পড়িতেছে। কাছে আসিতেছে সকলই—গাছপালা, গ্রাম নদী। কিন্তু ধরিতে গেলেই সরিয়া পালাইতেছে ; কিছুই নিরাকৃত হইতে চাহিতেছে না !

দর্শন, আকর্ণন এবং নিরাকরণ—এ তিনের অভাবের মধ্যে নিয়াখিয়া নদীটি শীতল স্পর্শে আমাদের সমস্ত জড়তা দূর করিয়া আপনার স্বচ্ছ হাসির কল্লোলে যখন চাকতির মতো রাত্রির

pathagar.net

গভীরতাকে মুখরিত করিয়া তোলে, তখন প্রাণের দুয়ার সহসা যেন খুলিয়া যায় : পাল্‌কি হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখি, অদূরে, অন্ধকার বনের ছায়ায় ছোটো গ্রামখানি। মন এখান হইতে, এই চিরপরিচিত গৃহকোণকে ছাড়িয়া, এই নিয়াখিয়ার খেয়াঘাট পার হইয়া আর চলিতে চাহে না।

রাত্রিমুখ হইতে রাত্রিশেষের দিকে যাত্রার মধ্যপথে এই হাস্তময়ী কল্লোলিনী নিয়াখিয়া। এই মধ্যপথ অতিক্রম করিয়া মন কেবলই আলোকের জন্য, প্রভাতের জন্য, ব্যাকুল হইতে থাকে। কেবলই মনে হয়, আর কতদূর, আর কত প্রহর এমনি করিয়া অন্ধকারে চলিব।

অফুরান পথ চলার, প্রহরের পর প্রহর একটা বৈচিত্র্যহীনতার ভিতর দিয়া বাহিত হইবার, সুবিপুল শ্রান্তি এই সময় আসিয়া মনকে এমন করিয়া আক্রমণ করে যে, সে কোনো দিকে আর চাহিতে ইচ্ছা করে না ; আপনাকে গুটাইয়া-সুটাইয়া একটি কোণে পড়িয়া থাকিতে পারিলে যেন বাঁচে।

ঘুমাইয়া পড়িবার, আপনাকে এই বিশ্বজোড়া বিলুপ্তির মধ্যে বিনা আপত্তিতে নামাইয়া দিবার জন্য দুর্দমনীয় খোঁয়ারি আসিয়াছে। যেন একটা শীতল মুষ্টি প্রাণের সমস্ত ইচ্ছাকে, জাগিয়া রহিবার সকল চেষ্টাকে, সবলে চাপিয়া অসাড় করিয়া দিতেছে। দারুণ অবসাদ! দেখিতেছি, যাত্রীদল ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের কাছে ডাকিয়া শুধাইতে চাই পথ আর কতখানি, কিন্তু পারি না। কোষের মধ্যে কীটের মতো নিশ্চল মন, একটা খট্‌খট্‌ ছাড়া আর কোনোরূপ সাড়া দিতেছে না! পাল্‌কির তলা দিয়া লণ্ঠনের আলো এবং বাহকদের দ্রুত চঞ্চল পদক্ষেপের ছায়া আলো-আঁধারের স্রোতের মতো অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। চোখ এই আলো এবং কালো, এবং আলোর গতাগতির দিকে চাহিয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে!

রামচণ্ডীর বটচ্ছায়ায় পাল্‌কি নামাইয়া বাহকেরা কখন কে কোথায় সরিয়া গেছে। সমস্ত দেহ-মন একটা আগুনের উত্তাপ অনুভব করিতেছে এবং ধীরে ধীরে আপনাকে জড়তার নিষ্পেষণ

pathagar.net

হইতে মুক্ত করিয়া আবার সজাগ হইয়া বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিতেছে ; কিন্তু পারিতেছে না। চারি দিক এমনি নীরব স্থির ও স্তিমিত যে মনে হইতেছে, একখানা প্রকাণ্ড দৃশ্যপটের ভিতরে তাহারা আমাকে রাখিয়া গিয়াছে ! মন্দিরের পিছনে, আকাশের নীলের উপরে একটিমাত্র তারার জ্যোতি স্থির হইয়া আছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড বটগাছের শিখরে সামান্যমাত্র কম্পন নাই ; তলদেশে পাতার গুচ্ছে, শাখার গায়ে, আগুনের রঙ হলুদের প্রলেপের মতো লাগিয়া আছে অচঞ্চল। আগুনের তপ্তকাঞ্চনবর্ণের সম্মুখে চক্রাকারে সজ্জিত মানুষের ছায়া সুতীক্ষ্ণ সুস্পষ্ট দেখিতেছি। কিন্তু, অবিরল, অবিকল, ছবির মতো।

চণ্ডীদেবীকে দর্শন করিলাম ; পাল্‌কিতে আসিয়া বসিলাম ; বাহক আসিল ; পাল্‌কি চলিল এত গভীর নীরবতার মাঝখানে যে মনে হইতে লাগিল, সেই সীমাচলে পৌঁছিয়াছি যেখানে বাস্তবে-অবাস্তবে স্থূলে-সূক্ষ্মে গলাগলি ভাব। নিজেই আছি কি না এ কথাটা জানিতে চারি দিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে, কাঁটাবনের ঢালু পথ বাহিয়া, পায়ে পায়ে সন্তর্পণে, একটা অচেনা অন্ধকারের দিকে পুনরায় যখন নামিয়া চলিয়াছি সেই সময়ে সহসা খোল-করতাল ও সংকীর্তনের প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত বাস্তবকে আনিয়া মনের উপরে এমন করিয়া আছড়াইয়া ফেলিল যে মনে হইল, বুক বুঝি ছিঁড়িয়া পড়িল ! অন্ধকারে হঠাৎ আলোর আঘাতে দৃষ্টি যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তেমনি সুনিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে এই শব্দ তরঙ্গের ঝনঝনায় প্রাণের তন্ত্রী বিদ্যুৎবেগে রনরন করিয়াই শিথিল হইয়া পড়ে।

রামচণ্ডী, আমাদের যাত্রাপথের শেষ ঘাট, পিছনে ফেলিয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। সেখান হইতে এখানেও কীর্তনের সুর যেন কোন্ পরিত্যক্ত পার হইতে একটুখানি আক্ষেপের মতো আমাদের নিকটে পৌঁছিতেছে—অস্পষ্ট, মৃদু, ক্ষণে ক্ষণে। পাড়ি দিয়াছি যে ঘাট হইতে তাহার সংবাদ এখনো পাইতেছি ; পাড়ি

দিতেছি যে পারে তাহার সংবাদ এখনো পাই নাই ; মাঝগঙ্গায় মন সমস্ত পাল তুলিয়া যেন মন্থরগতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে আলোক-রাজ্যের সিংহদ্বারের দিকে।

প্রাতঃসন্ধ্যার ভরপুর অন্ধকার। তারার আলো নিভিয়া গেছে। প্রভাতের আলো, সে এখনো সুদূরে। এই সাড়াশব্দহীন ধূসরতার মাঝে ক্ষণেকের জন্যে আমরা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছি কাঁধ বদলাইতে।

হরিণ যেমন বহু পথ দৌড়িয়া হঠাৎ একবার উৎকর্ণ উদগ্রীব হইয়া দাঁড়ায়, তার পরে পথের ঠিকানা পাইয়া তীরের মতো সেই দিকে চলিয়া যায়, তেমনি আমরা উড়িয়া চলিয়াছি—সিন্ধুতীরের নিষ্কলুষ ধবলতার উপর দিয়া, একটা বিশাল গম্ভীর কল্লোলের মুখে, নির্ভয়ে, বাতাসে বুক ফুলাইয়া।

জ্যোর্তিমন্দিরের সিংহদ্বার অতিক্রম করিতেছি। আলো গলিয়া আমাদের পায়ের নীচে বিছাইয়া যাইতেছে, শব্দ গলিয়া আমাদের আশে পাশে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূর কালো সমুদ্রের সাদা আলো মায়ার প্রাচীরের মতো অবিরাম চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিতেছে, ভাঙিয়া পড়িতেছে !

রাত্রি চতুর্থ প্রহর। বিশ্বমন্দিরে উত্থান-আরতি বাজিতেছে ; কালোর দুন্দুভি আলোর তালে ধ্বনিত হইতেছে দিকে দিগন্তে, সীমায় অসীমে ! এই জ্যোতির্ময় ঝনঝনার ভিতর দিয়া, এই বিগলিত আলোকের চলায়মান শব্দায়মান আস্তরণের উপর দিয়া, দ্রুত পদক্ষেপে ইহারা আমাকে লইয়া চলিয়াছে—বরুণদেবতার অনুচরগণের মতো, নীল, নগ্ন, দীর্ঘকায় ! আলোকবিধৌত সিন্ধুতীরে ইহাদের পদক্ষেপ, ছায়া ফেলিতেছে না, চিহ্ন রাখিতেছে না !

বালুতট ও দিকে গড়াইয়া চন্দ্রভাগার কোলে পড়িয়াছে, এ দিকে গিয়া সমুদ্রজলে নিজেকে হারাইয়া দিয়াছে। রাত্রি—আলো-আঁধারের ধ্বনিপ্রতিধ্বনির মরীচিকার পারে, প্রহরশেষের নিশ্চল ধূসরতা দিয়া গড়া নীরব এই বালুতটে আমাদের ক'টিকে আছড়াইয়া ফেলিয়া যেন বহুদূরে সরিয়া গেছে।

নূতন দিন জন্ম লইতেছে—অনাবৃত আলোকে, নীরবতার মাঝখানে, আনন্দময়ী উষার অঙ্কে। বিশ্বব্যাপী প্রসববেদনার আঘাতে মেঘ ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সমুদ্র আলোড়িত হইতেছে, বাতাস মুহুর্মুহু শিহরিতেছে ! একাকী এই জন্মরহস্যের অভিমুখে চাহিয়া দেখিতেছি। একটিমাত্র রক্তবিন্দু ! পূর্বসন্ধ্যার অরুণিমার উপরে বিশ্বজগতের পূর্বরাগের একটিমাত্র বুদ্‌বুদ—অখণ্ড, অম্লান ! অনন্তের পাত্রে টলটল করিতেছে ! জ্যোতির রথ, মহাদ্যুতি এই প্রাণবিন্দুটিকে বহিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—সপ্তসিন্ধুর চলোর্মি ভেদ করিয়া, জাগরণের জ্যোতিষ্মান চক্রতলে সুষুপ্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া ! পূর্ব আকাশে এই শোণিতবিন্দুর আভা লাগিয়াছে, সমুদ্রতরঙ্গ বহিয়া তাহারই প্রভা গড়াইয়া আসিতেছে। পাণ্ডুর তটভূমি দেখিতে দেখিতে রক্তচন্দনের প্রলেপে প্লাবিত হইয়া গেল ; রক্তবৃষ্টিতে চন্দ্রভাগার তীর্থজল রাঙিয়া উঠিল। মৈত্রবনের শিখরে কোণার্কমন্দিরের প্রত্যেক কোণ, প্রতি শিলাখণ্ড, আতপ্ত রক্তের সজীব প্রভা নিঃশেষে পান করিয়া অনঙ্গদেবতার উল্লসিত কেলিকদম্বের মতো প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মানুষের গড়া কোণার্কের এই বিচিত্র রথ দেখিতেছি—কত যেন ক্ষুদ্র ! সূর্যের তেজ ধারণ করিয়া, তাহারই শক্তিতে ঊর্ধ্বে বাড়িয়া, আপনাকে চিরশ্যামল চিরশোভন রাখিয়াছে এই যে বনস্পতি, ইহারও ঊর্ধ্বে কোণার্কের রথধ্বজা উঠিয়া তিষ্ঠিতে পারে নাই—আপনার ভারে আপনি ভাঙিয়া পড়িয়াছে !

জরাজীর্ণ বজ্রাহত এই মন্দিরের উপর হইতে অরুণোদয়ের রক্ত-আভার মোহ সরিয়া গেছে। দিনের প্রখর আলোয় সে তাহার সমস্ত দীনতা লইয়া বনস্পতিটির আড়ালে আপনাকে যেন গোপন করিতে চাহিতেছে, মিলাইতে চাহিতেছে ! দূর হইতে কোণার্কের এই হীন এবং দীন-ভাব মনকে যেন লোহার মতো শক্ত করিয়া দিয়াছে। উহার দিকে আর এক পাও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু তবু চলিয়াছি—চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া, অসমতল কালিয়াই-

pathagar.net
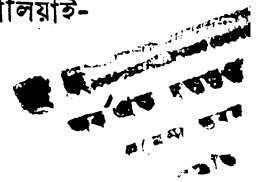
গণ্ড পায়ে পায়ে অতিক্রম করিয়া মানবশিল্পের একটা সুবিদিত আকর্ষণবশে চুম্বকের টানে লোহার মতো। মন টানিতেছে! ওই বট-চ্ছায়ায় মন টানিতেছে, ওই চূড়াহীন মন্দিরের দিকে মন টানিতেছে, ওই ঝরিয়া-পড়া ঝুঁকিয়া-পড়া বালুশয়ানে শুইয়া-পড়া রাশি রাশি পাথরের দিকে মন টানিতেছে!

কোণার্কের বিরাট আকর্ষণে বাধা দেয় ওই বনস্পতিটির শ্যাম যবনিকা। সেটি সরাইয়া মৈত্রবনের ছায়ানিবিড় আশ্রমটি পার হইয়া যে মুহূর্তে কোণার্কের অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে পা রাখিয়াছি অমনি দৃষ্টি মন সকলই অগ্নিশিখার চারি দিকে পতঙ্গের মতো, আপনাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শ্রান্ত করিয়া ফিরিতেছে—কিছুতে আর তৃপ্তি মানিতেছে না!

চিরযৌবনের হাট বসিয়াছে! চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কেলিকদম্বতলে নিখিলের রাসলীলা চলিয়াছে—কিবা রাত্রি, কিবা দিন—বিচিত্র বর্ণের প্রদীপ জ্বালাইয়া, মূর্তিহীন অনঙ্গদেবতার রত্ন-বেদীটি ঘিরিয়া।

এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্বর নাই। পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চারি দিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে, এই শব্দায়মান, চলায়মান, উর্বরতার চিত্র-বিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়, শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশশত শিল্পীর মানসশতদল—সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।

এইবার ফিরিতেছি—উদয়ের পার হইতে আবার সেই অস্তের পারে; আর-একবার সংসারের দিকে, সুরুচি-কুরুচি শ্লীল-অশ্লীলের দিকে।

কোণার্ক আমাদের নিকটে বিদায় লইতেছে। মরুশয্যায় অর্ধ-নিমগ্না পড়িয়া আছে সে পাষাণী অহল্যার মতো সুন্দরী—নীরব,

pathagar.net

নিস্পন্দ, মণিদর্পণে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া, দিগন্ত-জোড়া মেঘের ম্লান আলোয় যুগযুগান্তরব্যাপী প্রতীক্ষার মতো; শতসহস্রের গমনা-গমনের এক প্রান্তে সুদুর্লভ একটি কণা পদরেণুর প্রত্যাশী।

Book No 386
Date 14.6.2005

pathagar.net

386
14.6.2005
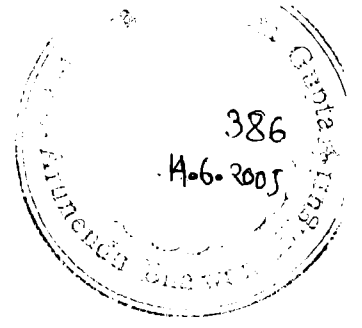
নিষ্ক্রমণ

মায়ের পরশ ! আলোয়-ধুলোয় লোকে-লোকাকীর্ণ শহরের কিনারা দিয়েই এই নির্মল পরশখানি একটুখানি নদীর বাতাস হয়ে বহে চলেছে ! এপার থেকে ওপারে যাবার, পার থেকে ঘরে আসার, সেতু-পথে চকিতের মতো এই পরশ—গঙ্গাজলে ধোয়া এই পরশ।

এই শান্ত সুস্নিগ্ধ পরশখানির আর এক পারে দেখছি পরিচিত পুরাতন দেশ, আর পারে দেখা যাচ্ছে প্রবাসবাসের সিংহদ্বার হিম-রাত্রির-অন্ধকার-মাখা।

বিপুল জনস্রোতের সঙ্গে একত্রে ছুটে চলেছি, ঠেলে চলেছি, নিঃশব্দে, নীরবে; আর নদীর উপর দিয়ে অবিশ্রান্ত বহে আসছে কাজল আকাশ, কালো জলের সমস্ত স্নেহ-মাখা মায়ের পরশ !

অন্ধকারের মাঝখান থেকে একটা তীব্র বাঁশি দিগ্‌দিগন্তে সুনীল পরিসর হঠাৎ ছিন্ন করে দিয়ে চিৎকার করে উঠল। আবার আলো, আবার ধুলো, আবার জনকোলাহল ! এ সমস্তকে ছাড়িয়ে যখন পৃথিবী-জোড়া প্রকাণ্ড রাত্রি ভেদ করে চলেছি তখন কেবল শুনছি, পায়ের তলা দিয়ে একটা ঝনঝন লৌহনির্ঝরের মতো ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে।

গাড়ির দুই সারি জানলার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র দুই কালি আসমানি পর্দা, তার মাঝে মাঝে ঝকঝকে এক-একটি তারা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীলের এই দুই যবনিকার ভিতর চলেছি। দক্ষিণে বামে কিছুই দেখছি না; কেবল সম্মুখ থেকে একটার পর একটা ঝনঝনার ধাক্কা আসছে, আর মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একটা

pathagar.net

গাছের ঝাপসা মূর্তি চোখের উপরে এসে আঘাত করেই সরে যাচ্ছে।

বিরাট রাত্রির এই প্রকাণ্ড বৈচিত্র্যহীনতার ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছি বললে ভুল হয়। নিশাচর পাখিরা রাত্রির নীরব নীলের মধ্যে আপনাদের নিশ্চল পাখা মেলে নিঃশব্দে যেমন ভেসে যায়, এ তেমন করে যাওয়া নয়, এ যেন একটা উন্মত্ত দৈত্য চাকা-দেওয়া লোহার খাঁচায় আমাকে বন্ধ করে পৃথিবীর উপর দিয়ে দৌড়ে চলেছে ; তার চলার প্রচণ্ড বেগে লোহার খাঁচাটা পৃথিবীর বুক আঁচড়ে, চারি দিকে অগ্নিকণা ছিটিয়ে, অন্ধকুহরের ভিতর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে।

সুদীর্ঘ অনিদ্রা, অফুরন্ত অস্থিরতা, তার পরে বিরাট অবসাদ। নির্জীব প্রাণ নিরুপায় অবোলা একটা জন্তুর মতো চুপ করে পড়ে আছে, অপার অন্ধকারের মুখ দুই চোখ মেলে।

একটুখানি আলোর আঘাত, নিশীথবীণায় সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন। উষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি নূতন দিনের দিকে মুখ করে। পৃথিবীর পূর্বপার পর্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশীকৃত দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণসার চর্মের মতো একটি কোমল অন্ধকার, তারই উপরে আলোর পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে। সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি পদ্মের কলিকা জলের মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ; যেন ভূদেবী বিশ্বদেবতাকে নমস্কার দিচ্ছেন।

পথিক যেমন পথ চলতে ক্ষণিকের মতো পথপ্রান্তে দেবতার দেউলটিতে একটি নমস্কার দিয়ে পুনরায় চলতে আরম্ভ করে, আমরা তেমনি এই প্রাতঃসন্ধ্যাটিকে প্রণাম করেই যেন আবার অগ্রসর হচ্ছি।

একটা কূল-কিনারা-হারা বালুচরের ঠিক আরম্ভে রাত্রি প্রভাত হয়েছে। আকাশের বর্ণ দূরে দূরে নদীর ক্ষীণ ধারাগুলিকে সুতীক্ষ্ণ ছুরির মতো উজ্জ্বল করে তুলেছে। পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত

pathagar.net

হয়ে পড়েছে পরিষ্কার ফিরোজার একটিমাত্র প্রলেপ ; তার উপরে একঝাড় কুশ আর কাশ। নূতন সূর্যালোক কাশফুলের শ্বেতচামরের উপরে আবীর ছড়িয়ে সমস্ত ছবিটিকে রাঙিয়ে তুলেছে। নির্জন এই নদীর পার, নিঃশব্দ নিশ্চল এই নদীপারের বালুচর, এর ভিতর দিয়ে জলের ক্ষীণ ধারা আমাদেরই মতো মন্দগতিতে চলেছে।

নদী থেকে শত শত হাত ঊর্ধ্বে সেতুপথ বেয়ে চলেছি। একটি মৃদুমন্দ দোলা, গতির একটা শিহরণ মাত্র, এ ছাড়া আর-কিছু অনুভব হচ্ছে না। চলেছি, চলেছি, দিনের মন-ভোলানো সবুজের মাঝ দিয়ে রাতের ঘুম-পাড়ানো নীলের দিকে।

অশেষ পথ, সুদীর্ঘ প্রহর-পালের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত চলেছে। দিন ও রাত্রি এই পথের দুই ধারে নিরাবরণ ও আবরণের দুইখানি মায়াজাল রচনা করতে করতে আমাদেরই সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

বারাণসী—মন্দির-মঠের একটা প্রকাণ্ড অরণ্য। দ্বিপ্রহরের সূর্যালোকে তার সমস্তটা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—জনশূন্য স্নানের ঘাটে সোপানের কোলে কোলে নদীজলে বিজলীরেখাটি থেকে তপ্ত পথে নিঃশব্দে যে যাত্রীরা চলেছে তাদের গাঢ় ছায়াটি পর্যন্ত। এ যেন একটা মায়াপুরীর দিকে চেয়ে রয়েছি। পাষাণপ্রাচীরগুলো থেকে একটা উত্তাপ মুখে এসে লাগছে ; নাগরিকদের সমস্ত গতিবিধি কার্য-কলাপ আমাদের চোখে পড়ছে স্পষ্ট ; কিন্তু তাদের কোনো সাড়াশব্দ আমাদের কাছে পৌঁছতে পারছে না। এ যেন একটা মূকের রাজত্ব পেরিয়ে চলেছি। আর, শব্দের সীমার বাহিরে তাদের এই প্রকাণ্ড নগরী ঊর্ধ্ব আকাশে পাংশু দুটি পাষাণবাহু তুলে একটা ভাষাহীন নিবারণের মতো দূর-দূরান্তরের দিকে চেয়ে রয়েছে, দুইপ্রহর বেলার শব্দহীন আলোকের গায়ে চিত্রার্পিত।

রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের উপরে বেলাশেষের তাম্র আভা। আম্র-বনের ছায়ায় ছায়ায় রাত্রি আপনার আশঙ্কা নিয়ে এখনি দেখা দিয়েছে। বনরেখার উপরে অযোধ্যার শেষ নবাবের বহুকালের পরিত্যক্ত প্রাসাদের একটা অংশ আকাশের পরিষ্কার নীলের গায়ে

pathagar.net

শুষ্করক্তের গাঢ় একটা বিমলিন ছাপ ফেলেছে। বাঁধ-ভাঙা গোমতীর জল প্রকাণ্ড একটা ছিন্ন কন্থার মতো পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, অনেক দূর পর্যন্ত সমস্ত সবুজকে আচ্ছাদন করে।

পশ্চিমদিগন্তব্যাপী শোণিমার নীরব একটি নির্ঝর আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর পর্যন্ত নেমে এসেছে; রাতের পাখি এরই উপর দিয়ে কালো ডানা মেলে উড়ে আসছে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে বৃষ্টি নেমেছে; পাহাড়ের হাওয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মুখে এসে লাগছে বরফের মতো। দূর-দূরান্তরে একটি-মাত্র ঝিল্লি অন্ধকারে শব্দের একটা উৎস খুলে দিয়ে ক্রমান্বয়ে গেয়ে চলেছে। একটা পান্থশালার প্রদীপ জলে-ধোয়া পৃথিবীর মসৃণতার উপরে আপনার আলোটি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়ে অনিমেষে রাত্রির দিকে চেয়ে রয়েছে।

নীরন্ধ্র অন্ধকারকে ধাক্কা দিতে দিতে গাড়ি চলেছে, হিমালয়ের যে দিক বেয়ে গঙ্গা নামছেন সেই দিক হয়ে।

এখানে মেঘ কেটে চাঁদ দেখা দিয়েছেন অন্ধকার গিরিশ্রেণীর চূড়ায়। অদূরে স্নানের ঘাট, নহবৎখানা, মন্দিরচূড়া. জ্যোৎস্নায় ঘুমিয়ে আছে; গঙ্গার বাতাস সমস্তটির উপরে স্নিগ্ধতা ঢেলে দিয়েছে। আমাদের যাত্রাপথের শেষে সুদীর্ঘ রাত্রির অন্তিম প্রহরে এই গঙ্গাদ্বার। এরই ওপরে সূর্যদেবের হরিতাশ্বসকল অপেক্ষা করছে, নূতনকে—অদৃষ্টপূর্বকে—জগতে বহন করে আনবার জন্য।

রাজপুরের পান্থশালায়, হিমালয়ের ঠিক পায়ের কাছটিতে বসে বিশ্রাম করছি। বরফের বাতাস দিয়ে ধোয়া তরুণ প্রভাত, আকাশজোড়া পাহাড়ের কোলে ছোটো এই শহরের ঘরে ঘরে জাগরণের সোনার কাঠি স্পর্শ করে যাচ্ছে। দক্ষিণে একটি গিরিনদী, গোপন গুহা থেকে স্বচ্ছ ধারাটি তার উপলখণ্ডের উপর দিয়ে, পুষ্পিত কুঞ্জের ভিতর দিয়ে, নেমে এসেছে তরল কল্লোলে পৃথিবীর বুকের উপর। আর, বামে উঠে গেছে গিরিপথ পৃথিবী ছেড়ে ক্রমাগত আকাশের দিকে, ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে, মেঘের অন্তরালে। এই আকাশের দিকে উঠে চলা, আর এই অনন্ত সাগরের দিকে নেমে আসা, এরই মাঝে মুহূর্তের বিশ্রাম এই পান্থশালা কুঞ্জতীরে।

পর্বতের নীলের ভিতরে প্রবেশ করছি। চোখ-জুড়ানো নীল অঞ্জন, ঘুম-পাড়ানো নীল রহস্য, এরই একটি স্নিগ্ধ আভা সমস্ত দিনটিকে, সকল পথটিকে, সুশীতল করেছে।

পাহাড়ের একটা বাঁক। মেঘ-ফাটা রৌদ্রে একখানা প্রকাণ্ড পাথর, মাথায় এক বোঝা শুকনো ঘাস চাপিয়ে, পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ও ধারে ভীষণ একটা ভাঙন, পাহাড়ের গায়ে অগ্নিদাহের ক্ষতচিহ্নের মতো কালো দেখা যাচ্ছে। প্রখর রুদ্রমূর্তিতে দিগ্‌বিদিক এখানে দেখা দিয়েছে, যেন দুঃস্বপ্নহত। একটা নির্জীব ঘোড়া এরই মাঝ দিয়ে একরাশ পাথর বহে চলেছে পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা একটা রাজ-অট্টালিকার দিকে।

এ পাহাড়ের আর-একটা বাঁক। বনতরুর ঘন পল্লবের তলায় ছায়া, একখানি নীড়ের মতো, পায়ের তলা থেকে মাথার উপর

পর্যন্ত ঘিরে নিয়েছে। চিররাত্রি এখানে অবগুণ্ঠন টেনে কোলের মধ্যে ঝরা পাতা, নব কিশলয়, জীবন-মরণ, সবাইকে নিয়ে দোলা দিচ্ছেন নির্জনে মেঘরাজের গোপন অন্তঃপুরে।

পর্বতের সানুদেশ অতিক্রম করছি। দুই ধারে উপবন, তারই মাঝ দিয়ে পথ; জনমানব নেই, কিন্তু সমস্ত যেন কারা সযত্নে সুমার্জিত করে রেখেছে। সুবিন্যস্ত তরুশ্রেণী, সুশ্যাম সুচারু তৃণভূমি; তারই প্রান্তে দেখা যাচ্ছে পার্বতীমন্দির—সুধাধবল। এরই উপরে পাহাড়ের নীলের কূলকিনারা-হারা একটিমাত্র গভীর প্রলেপ বর্ষার মেঘের মতো আকাশ ঢেকে রয়েছে। এই কালোর উপরে আলো নিয়ে শোভা পাচ্ছে সমস্ত দৃশ্যটি স্থির বিদ্যুতের মতো। দেখতে দেখতে সমস্ত দৃশ্যটি মুছে দিয়ে গেল; অনাবিল শুভ্রতার কোলে ফুটে উঠল সোনার ফুলে সাজানো একটিমাত্র কর্ণিকার।

মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছি। কুয়াশার সুবিমল শিশিরচুম্বন মুখে লাগছে, চোখে লাগছে, প্রাণের ভিতর পর্যন্ত স্পর্শ করছে পথের ক্লেশ-ক্লান্তি ধুয়ে মুছে।

পাহাড়ের একটি অন্ধকার কোণ। লতাপাতার ভিতর থেকে একটা জলপ্রপাত নেমেছে; তারই উপরে অপরিসর সেতু ছত্রাকে-ভরা জীর্ণ একখানি কাঠের উপর ভর দিয়ে রসাতলের দিকে চেয়ে রয়েছে। একখানা বিশাল পাথর অতলস্পর্শ অন্ধকারের উপরে ঝুঁকে রয়েছে; আর তারই তীরে বনদেবীটির মতো বনলতা পুঞ্জ পুঞ্জ তারা-ফুলের একটিমাত্র গুচ্ছ। জলের হাওয়ায় কাঁপছে কচি পাখির ডানা দুখানির মতো দুটি লতাবল্লীর; আর তারই পাশ দিয়ে ফেনিল জল চলেছে অট্টরোলে অতলের মুখে। ঝাঁপিয়ে-পড়া, গড়িয়ে-চলা, তলিয়ে-যাওয়ার একটা প্রকাণ্ড ডাক। অনেকখানি জুড়ে দূরে দূরে পর্বতে পর্বতে রণিত হচ্ছে এই নিরুদ্দেশের দিকে নৃত্য করে চলে যাওয়ার, এই গহনের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝনৎকার।

মেঘরাজ্যের উপরে উঠে এসেছি। প্রকাণ্ড অজগরের নির্মোকের মতো একখণ্ড কুয়াশা সমস্ত গিরিশ্রেণীটি বেষ্টন করে নিশ্চল হয়ে

Pathagar.net

রয়েছে। নীচে একটা সুদীর্ঘ কালো ছায়া পাহাড়ের গায়ে অনেক দূর পর্যন্ত লতিয়ে উঠেছে ; আর উপরে একটা সবুজ উচ্ছ্বাস নীল আকাশে তরঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। ওইখানে, নির্মেঘ ওই নীলের বুকে, শরতের সুতীক্ষ্ণ হাওয়ায়, কোন্ দেবদারুবনের ছায়ায় আমাদের এবারের নীড়, মন যেখানে উড়ে যেতে চাচ্ছে এখনি অর্ধপথের পান্থশালা ছেড়ে।

পাহাড়ের গা দিয়ে একটি সরু পথ ; এক দিকে খাড়া পাথরের দেয়াল, আর-এক দিকে অতলস্পর্শ শূন্য। অনেক দূরে, যেন একটা প্রকাণ্ড হ্রদের পরপারে, ধূসর গিরিশ্রেণী দেখতে পাচ্ছি। একখণ্ড মেঘ শূন্যের উপরে সাদা পাল তুলে ধীরে ধীরে চলেছে, বাতাস তাকে যে দিকে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে পর্বতের এক-একটা মোড় নেবার সময় এই শূন্যের উপর দিয়ে খেয়া দিতে দিতে চলেছে আমার এই জীর্ণ কাঠের দোলাখানি। পাথর আপনার অটুট পরমায়ু, লতাপাতা আপনাদের ক্ষণিকের জীবনযৌবন নিয়ে এই শূন্যতার একেবারে তীরে এসে প্রতীক্ষা করছে ঝরে যাবার জন্য, খসে যাবার জন্য। এইখানে একটি পাখির গান। অদূরে বনের নিবিড় ছায়া থেকে সে ক্রমান্বয়ে বলছে—পিয়া-পিয়া পিউ-পিউ।

শুষ্ক নদীর খাতের মতো ঊষর একটা গিরিসংকট ; তারই মোহড়ায় একটা লোক সরকারি আপিসে বসে যত লোকের কাছে চুঙ্গি আদায় করে ছেড়ে দিচ্ছে। একটা বুভুক্ষিত কুকুর এইখানের চারি দিকে মাটি শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পর্বতের সুনীল ছায়া, সমস্ত শোভা, এই শুষ্ক ভূমিটাতে ছেড়ে দেখছি অনেক দূরে পিছিয়ে গেছে। এ যেন আকাশের উপরে একটা রাশীকৃত পাথর আর ধুলার মরুভূমি। এরই পরে বনের নীলের মধ্যে আর-একবার অবগাহন। সেখানে পায়ের তলায় পাহাড় ক্রমান্বয়ে অন্ধকারের ভিতরে গড়িয়ে গেছে। দিন সেখানে যেতে পারে নি, কেবলমাত্র কেলুবনের শিখরে শিখরে পূর্ব-সন্ধ্যার একটু ধূসর জ্যোতি নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। সূর্যদেব এখন মধ্যগগনে বিরাজ করছেন, কিন্তু

pathagar.net

এই বনরাজির তলায় শিশিরসিক্ত ঝরা পাতার বিছানায় এখনো রাত্রি। ঝিল্লিরবের ঘুম-পাড়ানো সুর এখানে বাজছেই, কিবা রাত্রি, কিবা দিন।

পুরাতন অরণ্যানীর নিষুপ্তির মধ্যে এই একটিমাত্র ডুব দিয়েই পথ একেবারে জনতা, সভ্যতা, কর্মকোলাহলের মাঝখানে গিয়ে মাথা তুলেছে!

একটা মানুষ এখানে কর্কশ গলায় চিৎকার করে কেবল ডাকছে, 'ফাল্‌তো, ফাল্‌তো এ ফাল্‌তো! এরে বেকার কুলি!'

সভ্যতার এই প্রবেশদ্বারেই এক দিকে রয়েছে দেখি 'ওল্ড ব্রুয়ারি' বা পুরাতন মদের ভাঁটি; আর-এক দিকে কতকগুলা দোকান-ঘর—সেখানে একটা দর্জি, সে বসে কাপড় ছাঁটছে, আর-একটা টেবিলের সামনে সোডা লেমনেড হুইস্‌কির বোতল সাজিয়ে হোটেলওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে ক্রমাগত চোখকে পীড়া দিচ্ছে টিনের ছাদ, পোস্ট-আপিস, রয়েল হোটেল, ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড, সাহেবদের হ্যাট-কোট, একটা মাড়োয়ারি রাজার ক্যাসেল এবং পর্বতের গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা নিলাম কনসার্ট ও স্কেটিং-রিঙের বিজ্ঞাপনী। বাহকেরা যখন দেখিয়ে দিলে আমাদের বাসাটা অনেক দূরে আর-একটা পর্বতের শিখরদেশে তখন মনটা যেন সুস্থির হল।

দুর্গম দুরারোহ গিরিপথ উচ্চ হতে উচ্চ হয়ে বন্ধুর একটা গিরি-সংকটে গিয়ে প্রবেশ করেছে: তারই শেষে পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে, হাট-বাজারের অনেক ঊর্ধ্বে, পাখির বুকের পালকের মতো শুভ্র সুকোমল মেঘে ঘেরা শরতের আমার এবারের বাসা—ফুলে-ঢাকা পর্বতের একটা বিশাল অলিন্দের একটি কোণে গোলাপলতা আর মল্লিকাঝাড়ের পাশাপাশি।

pathagar.net

আমাদের সেখানে আর এ পাহাড়ের ঋতুপর্যায়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বসন্ত এখানে এসে যায় শীতের আগেই দিগ্‌বিদিকে ফুলের মেলা বসিয়ে দিয়ে। আমাদের সেখানে যখন ফুলেদের বাসর-জাগবার পালা, এখানে তখন তুষারের বিছানায় ঘুমিয়ে গেছে সব ফুলগুলি। সেখানে বসন্ত দেখা দেয় শীতের আসরে শিউলি ফুল ছড়িয়ে; এখানে শীত আসে বসন্তের সভায় সাদা চাদর টানতে টানতে, ফুল মাড়িয়ে।

শীত গলে পড়ছে বর্ষায়, বর্ষা ফুটে উঠছে, বসন্তে, বসন্ত খিন্ন হতে হতে শরতের জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে ঝিকমিক করতে করতে তুষারের শুভ্রতায় গিয়ে শেষ হচ্ছে—এখানের ছন্দটা এইরূপ।

এখানে এসে অবধি হিমালয়কে একবার দেখে নেবার জন্যে উঁকি দিচ্ছি—এখানে ওখানে, সকালে সন্ধ্যায়। কিন্তু অচল সে, কুয়াশার ভিতরে কোথায় যে চলে গেছে সপ্তাহ ধরে তার সন্ধানই পাচ্ছি না।

এ যেন একটা নীহারিকার গর্ভে বাস করছি। দিন এখানে আসছে উত্তাপহীন, অনুজ্জ্বল; রাত আসছে অঞ্জনশিলার মতো হিম, অন্ধকার।

আমার চারি দিকে সবেমাত্র দশ-বিশ হাত পৃথিবী গুটিকতক ফুল-পাতা নিয়ে, যেন অগোচরের কোলে এক-টুকরো জগৎ, আর, আমরা যেন এক ঝাঁক দিশেহারা পাখি এইখানটায় আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের কাছে চারি দিক এখনো অপরিচিত রয়েছে। শিল্পী এখনো যেন তাঁর রঙ-তুলির কাজ শুরু করেন নি—সবেমাত্র কুয়াশার শুভ্রতার গায়ে পার্বত্য দৃশ্যের আমেজ একটু একটু দেগে রেখেছেন,

অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট।

এই-যে পরিচয়ের পূর্বমুহূর্তে কুয়াশার যবনিকাটি তুলছে, এ পারে ও পারে বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম ব্যবধান, একে সরিয়ে যেদিন শুভদৃষ্টি হবে সেদিন অন্তর গিয়ে মিলবে বাহিরে, বাহির এসে লাগবে অন্তরে। এই কথাটাই এক-গোছা সবুজ পাতা আমার জানালার কাচের বাহিরে কেবলই ঘা দিয়ে দিয়ে জানাচ্ছে কাঁচের এ পারে ঘরের বন্দী প্রকাণ্ড একটা পতঙ্গকে। অজানার দিক থেকে একটির পর একটি দূত—চঞ্চল একটি নীল পাখি, ছোটো একটি মৌমাছি—তরুলতার কানেকানে, অপরাজিতার ঘোমটা একটু খুলে, এই কথাই জানিয়ে যাচ্ছে দিনের মধ্যে শতবার।

আজকের সন্ধ্যাটি শীতাতুর কালো হরিণের মতো পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল অন্ধকারের দিকে মুখ করে। কলঙ্ক-ধরা একখানা কাঁসরের মতো গভীর রাত্রিটাকে কালো ডানার ঝাপটায় বাজিয়ে তুলে মস্ত একটা ঝড় আজ মাথার উপরে ক্রমান্বয়ে উঠে বেড়াচ্ছে যেন দিশেহারা পাগল পাখি।

রাত্রিশেষে বর্ষা দিগ্‌বধূর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আকাশের নীল চোখে সরু একটি কাজল-রেখার কোণে একটুখানি অরুণ আভা দেখা যাচ্ছে। আর, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল দেখছি ধূসরের অচল ঢেউ দিকের শেষ-সীমা পর্যন্ত; তার রঙও নেই, রূপও নেই! এই অবিচিত্রতার মধ্যে একটিমাত্র পাহাড়ি ফুলের কুঁড়ি, বসন্তের নববধূ সে, আলোর প্রতীক্ষা করছে। প্রজাপতির পাখার চেয়ে সুকুমার এর পাপড়িগুলি, এত ছোটো, এত কচি—একেই ঘিরে আজ প্রভাতের সমস্ত সুর। সুদূর গিরিশিখরে, মেঘলহরীর তীরে, বনের পাখির কণ্ঠে, নীহারের যবনিকা ঠেলে বাহিরে ছুটে এসেছে পর্বতের কলভাষী দুরন্ত শিশু এই-যে জলধারা—এর ঝরে পড়ার মধ্যে।

কাঁচা সোনার একটিমাত্র আভা, বসন্ত-বাউরির বুকের পালকের

pathagar.net

অস্ফুট বাসন্তী আভা, সকালের আকাশে বিকীর্ণ হয়ে গেল। এই আলোর উপরে সব প্রথম তুষার, আজ সে সোনার পটে যেন কাজলের লেখার মতো কালো হয়ে ফুটে উঠল।

এই কালো বরফের নিষ্কলঙ্ক ললাট! এইখানে বসন্তদিনের, তরুণ-দিনের, প্রথম আশীর্বাদ পড়েছে; সে একটিমাত্র আলোর কন্নকা। আর তারই আভা তুষারের সহস্র ধারায় হিমালয়ের অন্ধকার আলো-করে গড়িয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে ফুল ফোটার ছন্দটি ধরে।

আমার এ বাগানখানি পাহাড়কে আঁকড়ে ধরে শূন্যের উপরে ঝুলে রয়েছে। এখানে এক-ঝাড় পাহাড়-মল্লিকা, এক-ঝাঁক পাখি, আর আমি। এইখানটিতে তুষারের বাতাস নিয়ত গাছের ফুল, পাখির গান, ফুটিয়ে তুলছে। আমার গান নেই। সকাল-সন্ধ্যায় একখানা পাথরের মতো নিশ্চল নির্বাক আমাকে বাতাস আর আলো শুধুই স্পর্শ করে যাচ্ছে।

আমাদের যারা অনেকবার পাহাড়ে এসেছে এবং যারা নূতন আগন্তুক, তাদের দেখি ওঠা-নামা চলা-ফেরার অন্ত নেই। যেখানে ইংরেজি বাদ্য, গোরার নাচ, সেই-সকল মেলাতেই এরা ত্রিসন্ধ্যা যোগ দিয়ে ঘুরছে, কেবলই ঘুরছে—হয় ঘোড়ার পিঠে নয়তো নিজের পায়ে দুইজোড়া চাকা বেঁধে। মাড়োয়ারি রাজার ফরাসিধরনের বৈঠকখানার চুড়োয় বাতাসের ধনুকে চড়ানো ওই লোহার তীরটার মতো, এরা দেখি, শূন্যকে বিঁধে-বিঁধেই কেবলই ঘুরছে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে; ছুটেও চলছে না, উড়েও যাচ্ছে না।

আমার চলার গণ্ডীটাও যে খুব বড়ো, তা নয়। একটি পাহাড়ের যে পিঠে সূর্য উদয় হন আর যে পিঠে তিনি অস্তে যান, এইটুকুমাত্র প্রদক্ষিণ করে উঁচুনিচু একটা পথ; এই পথ দিয়ে কাঁটা-দেওয়া একটা মস্ত লাঠি নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, পাথর কুড়িয়ে, গাছ সংগ্রহ করে—মাসের মধ্যে ত্রিশ না হোক, উনত্রিশ দিন তো বটেই—এই পথটিতেই সকালের আলোয়, সন্ধ্যার ছায়ায়, দিবা দ্বিপ্রহরে,

রাতের অন্ধকারে। এইখানে পাথরের গায়ে কচি শ্যাওলার নূতন সবুজ, কেলুবনের ফাঁকে নীল আকাশের চাঁদ, একটি নির্ঝরের শীর্ণ ধারা, আর পর্বত ছেয়ে দুর্গম বনের নিবিড় রহস্য; প্রাতঃসন্ধ্যায় ভ্রমরের গুঞ্জন, সায়ং-সন্ধ্যায় পাখিদের গানের শেষে অন্ধকারের সেই ঝিমঝিম যা শুনছি কি বোধ করছি বলা কঠিন।

এই পথের একটা জায়গায় একখানা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড, তাতে লেখা আছে—'সাধারণ সড়ক নয়। অনধিকার প্রবেশ দণ্ডিত হইবে।' পর্বতের কোলে এই 'সাইন'টা আমাকে প্রথম দিন বড়োই ভয় দিয়েছিল। কিন্তু, সন্ধানে জানলেম, যারা এই কয়েদের ভয় দিয়ে সারা পাহাড় ঘিরে নিতে চেয়েছিল তাদের মেয়াদ অনেকদিনই ফুরিয়েছে। পথটা এখন আর অনন্যসাধারণ নেই। এবং সাধারণেও এই পথটার আশা অনেকদিন ছেড়ে দিয়ে এক ধাপ নীচে স্কুলবাড়ি কুয়োখানা প্রভৃতির গা ঘেঁষে আর-একটা ঘুরুনে রাস্তা—সারকুলার রোড—ক্লাব-ঘর, ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড ও বাজার পর্যন্ত, জিলাপির পাকের ধরনে রচনা করে নিয়েছে। সুতরাং এ রাস্তাটার ভবিষ্যতেও পথ হয়ে ওঠবার কোনো আশা নেই। এ বিপথ হয়েই রয়ে গেল; মানুষের কাজে লেগে পথ হয়ে ওঠা এর ভাগ্যে আর ঘটল না।

অনেকদিন আনাগোনায় এই বিপথটার একটা মানচিত্র আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে। পাহাড়ের পশ্চিমে গা বেয়ে প্রথমটা সে ঠিক পশ্চিম মুখে সুন্দর বাঁক নিতে নিতে 'সহস্রধারা'র উপত্যকার দিকে কাত হয়ে চলেছে। ঠিক যেখানটি থেকে সূর্যাস্তের নীচে সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার চিরে নদী একটি রুপোর তারের মতো দেখা যায়, সেখানটিতে পৌঁছে পথ স্তূপাকার পাথরের উপর হঠাৎ লম্ফ দিয়ে অকস্মাৎ আবার পুবে মোড় নিয়ে পর্বতের একটা উত্তর-ঢালু বেয়ে ছুটে নেমেছে। একটু দূরে গিয়েই হঠাৎ পর্বতের পুরের দেয়াল ঘেঁষে আবার পশ্চিমে দৌড়। সেখানে একদল মহিষ চোখ রাঙিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখেই, পাহাড়ের একটা গড়ানে ভাঙন দিয়ে সে দ্রুত নেমে গিয়ে, সোজা আকাশের দিকে উঠেই, সহসা মোড় নিয়ে

পর্বতের পূর্বগায়ে দিগন্ত-জোড়া হিমালয়ের সম্মুখে দেবদারুবনের ছায়ায় এসে লুকিয়ে পড়েছে। এই দিকটাতে সে শৈবালকোমল নির্ঝর-শীতল পর্বতের বাঁকে বাঁকে একলাটি খেলা করতে করতে পর্বতের পুব পিঠে আর-একটা গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে টিন্-মোড়া দোকানঘরে দর্জি কোট সেলাই করছেন; রাস্তার এক পাশে কাদের এক গাড়ি জ্বালানি কাঠ খরিদ্দারের অপেক্ষায় পড়ে আছে; হতভাগা চেহারার দুখানা ভাঙা ডাণ্ডি আড্ডার দাওয়ার বাহিরে চড়ায় বাঁধা পানসির মতো কাত হয়ে পড়েছে। এই পর্যন্তই বিপথের দৌড়। বাকি যেটুকু অতিক্রম করে আমাদের বাসায় উঠে যেতে হয়, সেটা বিপথ না হলেও বিপদ যে তার আর সন্দেহ নেই। মানুষ সেটাকে পর্বতশিখর পর্যন্ত এমন তিন-চারটে বিশ্রী মোচড় দিয়ে টেনে তুলেছে যে, সেখানে কোনো যানও যান না, পাও চান না যে চলি।

বিপথের শেষে পথের এই মোড়টা যেন ইস্কুল-মাস্টার, নয়তো ধর্মপ্রচারক। তার বুলিই হচ্ছে, 'এইবার পথে এসো!' নয়তো সে বলছে, 'বিপথ হইতে পথে আইস।' এই-যে রোড—সেণ্ট ভিনসেণ্ট বা তপস্বী ভিনসেণ্ট মহোদয়ের রাস্তা—এখানে নিরালা একটুও নেই; মানুষের সকৌতুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির চোর-কাঁটা এখানে আমার মতো বিপথের পথিকদের জন্য শরশয্যা রচনা করে রেখেছে। পেন্সন্‌ভোগী এক কাবুলি আমিরের নূতনবয়ঃপ্রাপ্ত দুই-চারি বংশধর, যাদের মাথায় শিখ-পাগড়ি, গায়ে সাহেবি কোট ও পায়ে যোধপুরি পাজামা ডসনের বুট, তারা আজ কদিন ধরে আমার লম্বা চোগা ও গোর্খা টুপিটার উপরে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এবং দুইবেলা আমার গা ঘেঁষেই বলাবলি করে চলেছে, 'আজব টোপি! আজব চোগা!' আজবের মধ্যে আমার দুটিমাত্র পদার্থ; দুইটিই তিব্বতীয় এবং শীতের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু, আজবের সংগ্রহ এ গরিবের চেয়ে আমির-পুত্র-কয়টির অনেক বেশি ছিল। সুতরাং যুদ্ধে আমারই হার লেখা গেল। এক মেমসাহেব শিলাতলে বসে মসুরি ভ্রমণের

pathagar.net

নোট নিচ্ছেন। তিনিও দেখলেম, আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই চট করে খাতায় কী-এক লাইন টুকে নিলেন। তাঁর সে নোট ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুই-একজন নিকট বন্ধু ছাড়া আর কারুর হাতে পড়ছে না। যাই হোক, এইরকম সব ছোটো-খাটো উৎপাত এড়াতে মানুষের পথে আমি চোগা ছেড়ে একটা প্রকাণ্ড সোলার টুপি ও তদুপযুক্ত চাঁদনির কোট-প্যাণ্ট পরিধান করে বিচরণ করে বেড়াই। তাতে মানুষেরা আমায় আর তাড়া দিচ্ছে না বটে, কিন্তু মানুষের উলটো পিঠের জীব যারা তারা আমাকে তরুশাখার উপর থেকে একটা আয়না দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে ছাড়ে না। সুতরাং বলার জ্বালায় আমার চলা দুর্ঘট হয়েছে—কী পথে কী বিপথে। অথচ ডাক্তার পরামর্শ দিচ্ছেন চলবারই।

পথে যাই কি বিপথে, চলি কি না চলি—এই দো-টানার মধ্যে যখন আমি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় কোনোরকমে পথ-বিপথ দুইয়েরই মান রেখে দিনযাপন করেছি, সেই সময় দেখি, পর্বত একেবারে আপাদমস্তক ফুলের সাজ পরে সহসা বসন্তের বাসর জমিয়ে বসেছেন। 'ফুলন ফুলত ভার ভার!' যত পাতা তত ফুল। যেখানে যত ধরা ছিল—পাথরের বুকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়—সূর্যের উদয়-অস্তের যত রঙ, আজ তারা ফুল হয়ে বাহিরে এসেছে। ঋতুরাজের বাঁশির ডাকে পৃথিবীর সমস্ত সবুজ রঙটা দেখছি বিপুল হিল্লোলে মেঘ অতিক্রম করে গিরিশিখর পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মেঘের বুক থেকে ইন্দ্রধনুর ফোয়ারা সাত রঙের পিচকারি আকাশে ছিটিয়ে দিচ্ছে। আর সন্ধ্যার কুঙ্কুমে, সকালের হলুদে হিমালয়ের সাদা আর গেরুয়া বসনের দুই পিঠই দুই বেলা রঙের প্লাবনে ডুবিয়ে দিয়ে বইছে উত্তর তীরের বসন্তবাতাস।

বসন্তের সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয়ের আনন্দটা আমার পথ-বিপথ দুটোরই ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমি আজকাল যখন যে সাজটা হাতের কাছে পাই সেই বেশেই ঋতুরাজের দরবারে ত্রিসন্ধ্যা হাজিরা

pathagar.net

দিচ্ছি, একেবারে নির্ভয়ে।

ইনি এই পর্বতের এক নামজাদা মহিলা আর্টিস্ট। আজ কদিন ধরে আমার যাবার-আসবার পথ আগলে হিমালয়ের একটা দৃশ্যপট লিখতে বসেছেন। সমস্ত উত্তর দিক জুড়ে তুষারের উপরে সন্ধ্যা মুঠো মুঠো ইন্দ্রধনুচূর্ণ ছড়িয়ে আলপনা টেনে যাচ্ছেন—মনেই ধরা যায় না সে এমন বিচিত্র। এক টুকরো সাদা কাগজে এরই নকল নিচ্ছেন আমাদের এই মহিলা আর্টিস্ট।

উপহাসকে সেদিন আর পুরু পাহাড়ি চোগার মধ্যে ঢেকে রাখা গেল না। সে একটা অকাল বাদলের আকার ধরে বাতাসে কুয়াশায় ও জলের ঝাপটায় চিত্রকারিণীর রঙ তুলি কাগজপত্র উড়িয়ে নিয়ে, অবশেষে তাঁর অতি-আবশ্যকীয় রঙ-মেশাবার জলপাত্রটি পর্যন্ত উলটে দিয়ে, দুরন্ত একটা পাহাড়ি ছাগলের পিছনে পিছনে পলায়ন করলে একেবারে গিরিশৃঙ্গে।

এই দলের এক আর্টিস্টের কতকগুলো ছবি নিয়ে একটা লোক কোন্-একটা পাহাড়ে শিল্পপ্রদর্শনী খুলেছে। যিনি কবি, যিনি কর্মী, তিনি ওই নীল আকাশপটে আলো-অন্ধকারের টান দিয়ে ছবি সৃষ্টি করছেন ; আর আমরা যারা কবিও নই, শিল্পীও নই, ওই আসল ছবিগুলো দেখে একটা-একটা জাল দলিল প্রস্তুত করে নিজেদের নামের মোহরটা খুব বড়ো করেই তাতে লাগিয়ে দিচ্ছি নির্লজ্জভাবে।

মানুষ সে মানুষই, বিধাতা তো নয় যে তার সৃষ্টিটা বিধাতারই সমান করে তুলতে হবে। মানুষের শিল্প মানুষকে আগাগোড়া স্বীকার করে বিশ-হাত দশ-মুণ্ডু অথবা বিধাতার গড়া নরনারীমূর্তির চেয়ে সুন্দর হয়ে যদি দেখা দেয় দিক, তার মধ্যে প্রবঞ্চনার পাপ তো ফুটে ওঠে না। কিন্তু, তুষারপর্বত না হয়েও যেটা তুষারের ভ্রম জন্মে দিয়ে চলে যেতে চায়, সেটাকে আমরা কী বলব? সে যে বিধাতা এবং মানুষ দুয়েরই সৃষ্টির বাহিরে থেকে দুজনকেই অপমান করতে থাকে।

pathagar.net

আমার এ বাগানে ফুল আর ধরছে না। প্রতিবেশী সাহেব-সুবার ছেলেমেয়েরা—তাদের আঁচল নেই—খড়ের টুপি ভরে ফুল লুট করে নিয়ে চলেছে! আমাদের গয়লা-মালী, তার অনেক যত্নের এ ফুল। ওই শিশু-পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সে আমার কাছে নালিশ জানায় বটে, কিন্তু ফুলের মকদ্দমা তার দিনের পর দিন মুলতুবিই থাকে।

সেদিন এই গয়লার একটা কালো বাছুর খাদ্যাখাদ্য বিচার না করেই নিতান্ত ছেলেমানুষি-বশত সাহেবদের বাগানের একটা ফুলগাছ সমূলে নিঃশেষ করে ধরা গেছে। সাহেবের চৌকিদার বাছুরকে থানায় দিতে চলেছে। পথে বেচারা অবোধ জীব মানুষের এই আইনের বিরুদ্ধে বিষম আপত্তি জানাচ্ছে এবং দেখছি, তার বড়ো বড়ো দুটো চোখ চারি দিককে কেবলই প্রশ্ন করছে সকাতরে, কী তার অপরাধ জানতে। গোরু-বাছুরের উপরে চৌকিদারের একটা শ্রদ্ধা অনুমান করেই যেন, সাহেব পুলিসের উপর একখানি জবাবি চিঠি দিয়েছিলেন; সুতরাং উৎকোচ দিয়ে যে নিরপরাধ জন্তুটিকে খালাস করে দিই, এমন উপায়ও ছিল না। তখন গয়লাকে তার বাছুরের হয়ে ত্রুটি স্বীকার করে মার্জনাভিক্ষা করতে পাঠিয়ে দিয়ে ফুলের দুটো মকদ্দমা একই দিনে নিষ্পত্তি করলেম।

এমনি করেই নির্বিবাদে পর্বতে পর্বতে ফুল-ফোটার দিন অবসান হল।

যে পর্বতটাকে ঘিরে চঞ্চল হরিণশিশুর মতো আমার চলার পথটি নৃত্য করে খেলা করে চলেছে, তারই মেরুদণ্ডের ঠিক উপরে সজারুর কাঁটার মতো ঘন দুই সারি দেবদারু। শরতের বাতাস এখান থেকে শব্দের একটা জাল নীল আকাশে দিবা রাত্রি নিক্ষেপ করছে। এক দিকে হিমালয়, আর-এক দিকে সহস্রধারার উপত্যকা—যেখানে সূর্য-উদয় এবং যেখানে সূর্যের অস্তগমন—এ দুই দিকই আমি দেখি এইখানটিতে বসে।

ফুলের রাজত্ব শেষ হয়েছে। আকাশের চোখে রঙের নেশা

pathagar.net

আর তেমন করে লাগে না। সূর্যের আলোতে ঝরা পাতার কষ ধরেছে। তুষারের সাদা দিনে দিনে নীল আকাশে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে চাঁদের আলোর সঙ্গে সঙ্গে।

হিমালয়ের দিনগুলিতে বিজয়ার সুর লেগেছে। এই সুর লোহার কষের মতো পাথরের গায়ে, ঘাসের সবুজে, সন্ধ্যার সিঁদুরে মিশিয়ে গিয়ে দিনান্তেরও পরপারে রাত্রির অনেক দূর পর্যন্ত আকাশের গায়ে গেরুয়ার টান দিয়ে দিয়ে বাজছে। দিন যেন আর যায় না! শরতের চাঁদনি রাতের তীরেও নীলাকাশের বিরহী নীলকণ্ঠ আপনার একটিমাত্র সুরে বেদনার নিশ্বাস টানছে শুনি—উঃ উঃ!

আজ আমাদের সে-দেশে নবমীর নিশি প্রভাত হল। এখানে শরতের সাদা মেঘের দুখানা ডানা নীল আকাশে ছড়িয়ে আজকের দিনটি যেন কৈলাসের তুষারে-গড়া একটি শ্বেত ময়ূরের মতো কার ফিরে আসার পথ চেয়ে পর্বতের চারি দিকে কেবলই উড়ে বেড়াচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় দেখছি, ঠিক সহস্রধারার উপত্যকার মুখে—পর্বতের পশ্চিম গায়ে তৃণে গুল্মে, লতায় পাতায়, পাথরের গায়ে, পথের ধুলায়, ফুলের মতো, আবীরের মতো, মানিকের আভার মতো একটা আলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। মনে হচ্ছে, যেন তুষারের হৃদয়রক্ত গলে এসে হিমালয়ের এই পশ্চিম দুয়ারের সোপানে আলপনার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এরই উপর দিয়ে দেখছি, সন্ধ্যাতারার মতো একটি বনবিহঙ্গী—আলোয়-গড়া মোনাল পাখি সে—চলে গেল পায়ে পায়ে গিরিশিখর অতিক্রম করে চাঁদনি রাতের প্রাণের ভিতর। আজ দেখলেম, তুষারের শিখরে চাঁদ উঠেছে আলোর একটা সুকোমলচ্ছটা আকাশে বিকীর্ণ করে। হিমালয়ের আর-সমস্তটা আজ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ঘরে এসে দেখছি, এ পাহাড়ের এক ভিখারি আমার জন্যে তার শরৎকালের উপহারটি রেখে গেছে—এক-গোছা সোনালি কুশ আর কাশ। সুদূর পাহাড়ের কোন্ নিরালা পথের ধারে এরা নত হয়ে পড়ে ছিল, চলে

যেতে কার সোনার আঁচল উড়ে উড়ে এদের স্পর্শ করে কনকচূর্ণের বিভূতি দিয়ে এদের সাজিয়ে গেছে।

ভেঙে-পড়া দেবদারুর নির্যাসগন্ধ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আজকাল বরফের হাওয়া বইতে আরম্ভ হয়েছে। পথ দিয়ে ক্রমাগত কম্বল-পরা পাহাড়ির দল কাঠের বোঝা, ভালুকের আর বন-বেড়ালের ছাল নিয়ে—গহন বন থেকে মোনাল পাখির সোনার পাখা আর মৌচাকের সোনালি মধু চুরি করে ঘরে ঘরে ফেরি দিচ্ছে। কোনো দিকে কুয়াশার লেশমাত্র নেই ; দিন রাত্রি সমান পরিষ্কার। কেলুগাছের ফলন্ত শাখায় প্রশাখায় গিরিমাটির একটা রঙ লেগেছে।

পার্বতী রুক্ষ রক্তবাস আপনার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কঙ্কালিনী বেশে দেখা দিয়েছেন। অনেক দূরের একটা পাহাড় ; তার গায়ে একটি-একটি গাছ দ্বিপ্রহরে চাকা-চাকা কালো দাগ ফেলেছে, যেন প্রকাণ্ড একখানা বাঘছাল রৌদ্রে বিছানো—এরই উপরে চির-তুষারের ধবল মূর্তি সারাদিন সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটির পর একটি গিরিচূড়া হিমে সাদা করে দিয়ে শীত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছি। পর্বতে পর্বতে মানুষের জ্বালানো দীপমালা থেকে দু-দশটা করে আলোর ফুলকি প্রতিদিনই দেখছি খসে পড়ছে ; আর, নীল আকাশে দীপালি-উৎসব ক্রমেই দেখছি জমে উঠছে। এখানকার হাট ভাঙবার পালা শুরু হয়েছে ; পুজোর ছুটির যাত্রীরা দলে দলে ঘোড়াতে ডাণ্ডিতে ক্রমে পর্বত খালি করে দিয়ে নেমে চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্তটা দৈন্য এবং অশোভনতা—দেশী বিদেশী নির্বিশেষে—তার মুরগির ঝুড়ি, আধ-পোড়া হাঁড়ি, ছিট-মোড়া ময়লা বিছানা দড়ি-বাঁধা বাক্স, কড়ি-বাঁধা হুঁকা, হলুদের ছোপ-ধরা চিনের বাসন নিয়ে ঘর ছেড়ে আজ-রাস্তায় বেরিয়েছে এবং ময়লা জলের একটা নালার মতো পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলেছে।

pathagar.net

এই যে-কটা ঋতুর মধ্যে দিয়ে শীতের আগে পর্যন্ত এই পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ পাখি এল, বাসা বাঁধলে, সংসার পাতলে, বাস করলে, আবার চলে গেল দূর-দূরান্তরে আকাশপথে দলে দলে—কী সুন্দর, কী স্বাধীন এদের গতিবিধি। আর, মানুষ যে জলে স্থলে আকাশে আপনার রাজত্ব বিস্তার করলে তার যাওয়ায় কী অশোভনতা। সিন্ধবাদের বিকটাকার বুড়োটার মতো সে আপনার সঞ্চিত কাজের বাজের মূল্যবান অথচ মূল্যহীন আসবাবের আবর্জনাকে বয়ে চলেছে দেখছি, বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে। পাখি চলে গেল, সে তার বাসার একটি কুটোও নিয়ে গেল না ; আর, মানুষ যেতে চাচ্ছে আস্তাবলের খড়কুটোটা এবং আস্তাকুঁড়ের ভাঙা ঝুড়িটা, এমন-কি রাস্তার কাঁকরগুলো পর্যন্ত সংগ্রহ করে মোট বেঁধে নিয়ে।

প্রথমে এসে পর্বতে পর্বতে পথ হারিয়ে আমি প্রায়ই অন্যের বাগানে অনধিকার প্রবেশ করে লজ্জিত হয়েছি, এখন সে ভয় গিয়েছে। প্রায় অধিকাংশ বাড়িরই ফাটক বন্ধ এবং পর্বতের গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশের পথ একেবারে খোলা হয়ে গেছে। আমি সেখানে অবাধে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করি। চন্দ্রসূর্যের উদয়াস্তের মধ্যে দিয়ে ছবির পর ছবি, কিন্নরীর ঝাঁকের মতো চিত্র-বিচিত্র আলোর পাখনা মেলে এ-কয়দিন আমার অন্তরে বাহিরে সকালে সন্ধ্যায় দিনে রাতে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। এদের ধরতে গিয়ে দেখি, এদের সমস্ত শ্রী লজ্জাবতী লতার মতো আমার আঙুলের পরশে ম্লান হয়ে গেল। শীত এসেছে। হিমের অভিযানের পূর্ব থেকেই গাছগুলো তাদের পাতার অনাবশ্যক বাহুল্য ঝেড়ে-ঝুড়ে আপনাদের সমস্ত শক্তি ভিতরে ভিতরে সঞ্চয় করে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। বসন্তে ফুলের ভারে এরা নুয়ে পড়েছিল দেখেছি, আর আজ দুদিন পরে বরফের পীড়ন সুদীর্ঘ শীতের দিন-রাত্রিতে বহন করবে এরাই অনায়াসে—ফুলেরই মতো, পাতারই মতো। পর্বতের সক্ষম সহিষ্ণু সন্তান এরা, পাথরের

বুকের ভিতরকার স্নেহ এদের বড়ো করে তুলেছে ; অটুট এদের প্রাণ !

আর, মানুষ যাদের যত্নে বাড়িয়েছে সেই-সব ক্ষীণপ্রাণ গাছদের মালীরা, দেখছি, আজকাল তুষারের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য কাঁচ-মোড়া গরম ঘরে নিয়ে তুলছে, শুকনো ঘাসের রক্ষাকবচ তাদের সর্বাঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে।

এখানকার পাহাড়িগুলো মোটেই পাহাড়ি নয়, তারা আসলে চাষি—যখন খেতের কাজ নেই, ডাণ্ডিতে এসে কাঁধ দেয়। পাহাড়ের পথগুলো চেনে কিন্তু পাহাড়কে চেনে না, বরফকে এরা ভয় করে। পর্বত যেখানে খেতের উপরে নদীর জলে আপনার ছায়া ফেলেছে সেখান থেকে উঠে এসেছে এরা ; আবার সেইখানেই ফিরে যেতে চায়। আজ ক'দিন ক্রমাগত এরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, বরফ পড়ল বলে ! কাল আমাদের যেতে হবে ; কালো মেঘের ভ্রূকুটি বিস্তার করে একটা ঝড় দূর পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে আজ আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে। দিনের আলোর নিষ্প্রভ, ধূসর আকাশ দুর্বহ হিমের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে।

আমি পর্বতের চূড়ায় একটা বন্ধ বাড়ির বাগানে একলা উঠে এসেছি। ঠাণ্ডা দিনটির ভিতর দিয়ে একটানা বরফের হাওয়া মুখে এসে লাগছে। একেবারে ছায়ার মতো ঝাপসা কালো-কালো পাহাড়গুলোর উপরেই আজ তুষারের সাদা ঢেউ যেন এগিয়ে এসে লেগেছে—চোখের সামনেই দাঁড়িয়েছে যেন। এ বাগানটা যাদের তারা চলে গেছে ; টিনের ঘরে তালা দিয়ে বাগানের যত ফুলগাছ সব রেখে গেছে। এদের বুড়ো মালী একটা কেলুগাছের তলায় কতকগুলো চারাগাছের উপরে খড়ের ঝাঁপ আড়াল দিচ্ছিল। সে আমাকে তার কাজ ফেলে বাগান দেখাতে লাগল।

কাঁচের ঘরে সাহেবের যত মূল্যবান শৌখিন ফুলের গাছ, জাল দিয়ে ঘেরা ; টেনিস খেলার একটা চাতাল, এর উপরে এক হাত বরফ সেবারে পড়েছিল ; এইটে মেম-সাহেবের চা-পানের মণ্ডপ ;

pathagar.net

এই রাস্তা দিয়ে সাহেবের ঘোড়া পর্বতের উপর আসতে পারে ; ওখানে সাহেবের কাছারির তাম্বু পড়ে ; বাড়ির এই দিকটা পুরানো আর ওই দিকটে সাহেব অনেক ব্যয়ে নূতন করে বানিয়েছে। ইত্যাদি।

অনেক দেখিয়ে মালী আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে বললে, 'ওই যে ভাঙা বাংলাটা, ওইটেই যে এ বাগান প্রথম বানিয়েছিল তার ; ও দিকে আরো অনেকটা বাগান ছিল, বরফে ধ্বসিয়ে দিয়েছে ; আমি ছোটোবেলায় সেই বাগান দেখেছি।'

মালী যে দিক দেখালে সে দিকে তুষারপর্বত পর্যন্ত নির্মল একটি শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এরই ধারটিতে সেই ভাঙা বাংলা ; ভাঙনের গা বেয়ে একটি গোলাপ-লতা ভাঙা ঘরখানার চালের উপর দিয়ে একেবারে তুষারপর্বতের দিকে ঢলে পড়েছে—ফুলের একটা উৎস! এর কাঁটায় কাঁটায় ফুল, গাঁটে গাঁটে ফুল—পর্বতের শিখরে এ যেন একটা ফুলের স্বপ্ন! বসন্তের বুলবুল নয়, তুষারের সাদা পাখি ওকে ডেকেছে শূন্যতার ওই ও পার থেকে!

ArkaPrabha D.
Book No.
Date
...awan, Siliguri

pathagar.net

চলা বলা সব বন্ধ করে, যা-কিছু কুড়োবার কুড়িয়ে, যা-কিছু গুঁড়োবার গুঁড়িয়ে বসেছি। পাহাড়ের নীচে থেকে কুলির সর্দার চীৎকার করে ডাকছে, 'ফাল্‌তো! ফাল্‌তো! হারে রে বেকার কুলি!'

---

pathagar.net

মাসি

pathagar.net

Book No 386
Date 14.6.2005

মাসি

'ওলো. কে আছিস, অবু এয়েছে, ঘরে খৈ-মোয়া আছে নিয়ে আয়।'

'মাসি, আমাকে দেখলেই বুঝি তোমার খৈ-মোয়ার কথা মনে পড়ে?'

'মনে পড়বে না, অবু? মাসির মোয়া খাবার জন্যে আবদার করে এমন তো দুটি নেই আমার, অবু।'

'আর একটি যদি থাকত মাসি—'

'ছিল তো, রইল না যে। আহা, যদি থাকত আজ—'

'বলতে বলতে থামলে কেন, মাসি?'

মাসি আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ডাকলেন, 'ওলো ও ঝিঙ্কারী।'

'ঝিঙ্কারী কে, মাসি?'

'ঝঙ্কারীর বোন। নয়াদুমকা থেকে এসেছে দুজনে কাজ করতে। কাজ জানে, কিন্তু কথা বোঝে না।'

'নাম দুটো নতুন ঠেকল মাসি। তোমার সে ফুকারি দাসী কোথা গেল?'

'সে গেছে এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে। বলি, 'যেয়ে করবি কী', জবাব করলে না; পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে মাথায় নিয়ে চলে গেল চোখ মুছতে মুছতে।'

'নিশ্চয় মাসি সে তুম্বু-জুজুর ভয়ে পালিয়েছে, না হলে কখনো যায় তোমাকে ছেড়ে? ফুকারি দাসী লোক ছিল ভালো, তোমায় যত্ন করত; আর রোজ আমার ঘনদুধের সরে ফুটো করে দুধটুকু ঢেলে নিয়ে নিজের জন্য রাখত, সর-সুদ্ধু খালি বাটি আমায় ধরে

pathagar.net

দিত---চুমুক দিয়ে যদি বলতেম, 'দুধ কোথা গেল ?' তো সাফ বুঝিয়ে দিত, 'দুষ্টু গয়লা ফুঁকো দুধ দিয়েছে, ঐ সরটুকুই এখন খেয়ে নাও, ও বেলা ফুঁকো দুধের চাঁচি খাওয়াব। মাসিকে বোলো না, আমারও চাকরি যাবে, গয়লারও জরিমানা হয়ে যাবে ; দুধও আসবে না, সরও পড়বে না, চাঁচিও পাবে না।'—আমি তার নাম দিয়েছিলুম চালাক দাসী। সে তোমার মোয়া চুরি করে আমাকে এক-একদিন ধরা পড়লে দিত, মাসি।'

'ওমা, এমন। আচ্ছা, তোকে দেখলে যেমন আমার খৈ মোয়ার কথা মনে পড়ে, আমাকে দেখলে তোর কী মনে পড়ে ? অবু ?'

'ছেলেবেলার কথা মাসি, খুব ছোটো বেলা—যখন আসত তাড়াতাড়ি সকাল, তাড়াতাড়ি পড়ন্ত বেলা।'

'এখন ?'

'মাসি, আমার মনে হয় আমি ঠিক তেমনিই আছি ছোট্টটি।'

'না তুই বড়ো হয়েছিস, তাই আমাকে মনে পড়তে তোর দেরি হয়ে যায়, না হলে কোন্ কালে আসতিস। দেখ না, দাসী দুটোকে কোন্ কালে ডেকেছি, এখনো দেখা নেই। ওলো ও ঝঙ্কারী, ও ঝিঙ্কারী, আয়-না—'

'আঁউ মায়ী, যাঁউ মায়ী—'

'এই দেখ, চুল-বাঁধার আয়না মুখ-সাফের বাক্স নিয়ে এল দুটোতে। হাঁউমাউ করছেই সারাদিন। ওরাও বোঝে না আমার কথা, আমিও বুঝি না ওদের বুলি। এর কী করি উপায় বল তো, অবু।'

'এ তো সহজ। ছত্রীক্ষেত্তরের লোকজনের কথা তো বুঝতে, মাসি ?'

'তা এক রকম বুঝতেম—'চিতাবাড়ি ধাঁইকিড়ি মৌসীমা পড়কী চড়'। এদের কথা যে কিছু বুঝি নে।'

'বুঝবে কী করে, মাসি ? ফাইলোলজি পড় নি তো।'

pathagar.net

'তুই তো পড়েছিস, অবু ?'

'একটু-একটু।'

'তাই নাহয় আমাকে শেখা একটু। কী উপায়ে এদের বোঝাই কখন কী চাই।'

'আচ্ছা দেখো মাসি, ছীক্ষেত্তরের লোকেরা সব কথার গোড়ায় চন্দ্রবিন্দু উলকির মতো বসায় ; আর এরা ডুমকা পাহাড়ের লোক, কথার শেষে উলকি টানে 'ভুখি লাগা ডুহি পিলাউঁ' ; তারা হলে বলত, 'ভুখ লাগিলা, ডুধ না পাইলা কাঁই, ধাঁইকিড়ি গোয়ালী বাড়ি যাঁই'। বুঝলে তো মাসি ?'

'বুঝেছি, দেখি তো তোর বুদ্ধিতে এদের মতো কথা কয়ে—ওরে শিগ্‌গিরি মেঠাই লাঁ, দাঁড়িয়ে হাঁসতা কাঁ, জলদী যাঁ।'

'মাসি, ছুটেছে ডুটোতে। বোধ হয় বুঝেছে কিছু কিছু!'

'কই অবু, দৌড়ে গেল, দৌড়ে আসার নামও যে করে না।'

'ব্যস্ত হোয়ো না মাসি, আমি খেয়ে এসেছি খিদে নেই, ও-বেলা খাব।'

'ওমা, সেকি অবু, কে এমন ভাগ্যিমন্তী, তোমার পেটটি ভরিয়ে পাঠালে এখানে ?'

'তাকে তুমি চিনবে কি মাসি—ফেলার মা।'

'ফেলার মা ? কই, চিনলেম না তো। কোথায় থাকে ?'

'সিঙ্গির বাজারে।'

'সিঙ্গির বাজারে ?'

'হাঁ মাসি, মিণ্টুদির বাড়ির কাছে। অমন করে আকাশ তাকিয়ে কী ভাবছ, মাসি ? শোনো-না বলি—'

'হাঁ বল্, তারপর ?'

'সেই তো, মাসি, পিসেমশায় আমাকে ইস্কুলে পাঠালে, তারপর কতকাল তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ নেই। রথ গেল, দোল গেল, চড়কপুজো আসে-আসে, গাজনের বড়োসন্ন্যাসী কাঁটা-ঝাঁপ খাবে, পঞ্চাননতলার মাঠে চড়কগাছে পোঁতা হল, ঢাকে ঢোলে কাঠি পড়ে

pathagar.net

আর-কি—আমার আর সবুর সইল না মাসি, তোমায় দেখতে চৌপাটি পড়ে দিলেম লম্বা, পায়ে হেঁটে বকুলতলার বাড়ির ঠিকানা ধরে। দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে, আবার যায় দিন, আবার আসে রাত। মনে কত ভাবনা আসে যায়। মাসি কি পর করে দিলে, মাসি কি ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গেল তুম্বু-জুজুর ভয়ে? কিছুই ঠিক পাই নে। হাঁটতে-হাঁটতে চলি। যশোর থেকে বসিরহাট, সেখান থেকে দমদমার মাঠ, পাইকপাড়া, চিৎপুর, টালার জলকল, আহিরিটোলা, হাটখোলা, নতুনবাজার, জগন্নাথের ঘাট, মাথাঘষার গলি, আমড়াতলা, খেংরাপটি ঘুরে ঘুরে শেষে বাক্সপটি মশারিপটি, চোরবাগান, জোড়াসাঁকো —বকুলতলা। এমন ফেরে কোনো দিন পড়ি নি, মাসি। আগেও তো তোমার বাড়িতে গেছি, গলির মোড় ফিরতেই শরীর যেন শীতল হয়ে যেত। এবারে যেন একটা তাপ এসে লাগল মুখে! চোখ তুলে দেখি, লোহার ফটকের ধারে হেলে-পড়া সে নিমগাছটা নেই। প্রাণটা তখনি কেমন করে উঠল বাড়ি ঢোকবার মুখেই।'

'সে বাড়ি তো আর আমাদের নেই, অবু। আর-একজনরা সে বাড়ি যে নিয়েছে বাড়ি ছাড়বার সময় আমার অসুখ, তাই কাউকে খবর দিয়ে আসতে পারি নি। তোমাকে যে একটা পত্তর দিয়ে আসব সেটুকু সময়ও দিলে না তারা।'

'এতক্ষণে বোঝা গেল, মাসি। পুরোনো বাড়িতে ঢুকে দেখি সদর-ফটক আধখানা আছে আধখানা নেই, পাহারায় কেউ নেই— না পট্টুলাল, না উচ্ছেলাল, ছেদিলাল, ছোটেলাল; সাড়াশব্দ নেই কারো। চাকরদের নাম ধরে ডাকি—ও রামলাল, ও গদাধর, ও ঈশেন, বিপিন, দুগ্‌গোদাস। কেউ দেখা দেয় না। ভয়ে ভয়ে ঢুকলেম ভিতরে, উঠে গেলেম ঘুরনো সিঁড়ি বেয়ে বৈঠকখানাতে। দেখি কি মাসি—ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, আরশি-কুশি কিছু নেই। বসি কোথায় ভেবে পাই নে। কোথা টানাপাখা, কোথা ফুলকাটা গালচে, বড়ো বড়ো তসবির-সব বড়ো-কর্তা মেজ-কর্তা

ছোটো-কর্তাদের, দেয়ালজোড়া বড়ো বড়ো পর্দা—সব অদৃশ্য। ফটিকের বাতিদান, চীনের পেটিসান, ফুলকাটা ফুলদান, পাথরের মুরত, দামি দামি বই-ঠাসা আলমারি—কিছু কি নেই ; সব যেন ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কেবল সিঁড়ির ঘরগুলো খাড়া আছে এখনো ; ধাপের পর ধাপ, পঁচিশ তিরিশ বিশ পঞ্চাশ, চিৎ হয়ে পড়ে কড়ি গুনছে—বড়ো সিঁড়ি, ছোটো সিঁড়ি, পাথরের সিঁড়ি, গোল সিঁড়ি, ঘুরনো সিঁড়ি, কেটো সিঁড়ি, মেটে সিঁড়ি ! কোথায় সে ঘড়ির ঘর, নাচঘর, ছবিঘর, ইস্কুলঘর—সব ঘর একশা হয়ে চুপচাপ আছে। এমন কাউকে দেখি না যে শুধিয়ে জানি, মাসি কোথায়। মাসি মাসি বলে ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল। একবার মনে হল যেন অন্দরবাড়ির দিকটায় কে যেন ডাকল 'মাসি গো মাসি।' তার পরেই যে-চুপ সেই-চুপ, নিঃসাড়া পুরী। ছুটলুম অন্দরের দিকে. বলি মাসির যদি দেখা পাই সেখানে। দালান. দর-দালান, গলিঘুঁজি চাকর-দাসীদের ঘর পেরিয়ে পালকিদোরের সামনে যেয়ে দেখি, মাসি, সেই যে আমাকে সময়-ভোলা ঘড়িটি দিয়েছিলে, আর আমি যেটিকে ভোলানাথের ঘড়ি নাম দিয়ে ঠিক পালকিদোরের উপরে বসিয়ে দিয়েছিলেম, সেটা ঠিক তেমনি বসে আছে—ঝালেগাঁথা, চাঁদওঠার দিকে চেয়ে। দেখে সাহস হল, তবে হয়তো মাসিও আছে। একছুটে দোতলায় উঠে গেলেম তোমার ঘরে, মাসি। কোথায় মাসি ! খালি ঘর চুপচাপ সবুজ খড়খড়ি বন্ধ করে অঘোরে পড়ে আছে। বলি, দেখি তো ভাণ্ডার-ঘরটা খুঁজে যদি পাই। দেখি-না তালাখোলা দোর, তার একদিকে গলাভাঙা একটা কুঁজো, আর একদিকে কানাভাঙা কলসি একটা। ভয় করল মাসি. উপোসী ঘরখানা গজালপোঁতা গর্তগুলো নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে যেন খাবে বলে—যাকে পায়। ঠিক মনে হল, মাসি, যেন রাবণ-বধের বিংশলোচন আমাকে দেখছে। সেখান থেকে পালিয়ে, মাসি, তোমার তরকারি-ঘরে ঢুকে দেখি সেখানেও তুমি নেই। উঠানের ধারে কলতলা, সেখানে দু বেলা থালাকাঁসিগুলো বাসনমাজুনির হাতে পড়ে 'মাসি মাসি' বলে চেঁচাত, ঝগড়া লাগত কাঁসাতে-পিতলে,

লোহার কড়াতে হাতাতে-বেড়িতে-খুন্তিতে—ঝন্‌ঝন্ খন্‌খন্ আর ঢালু বারান্দা থেকে তোমার ময়না চেঁচাত 'ও বউ, ও খোকা, ও সরলা' —সব সুনসান্। কী বলব, মাসি, বুকটা যেন টিপ-টিপ করে উঠল। মেটে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেম গিয়ে রান্নাবাড়ির ছাতে। মাথা ঘুরে গেল, মাসি, সেখান থেকে চারিদিক দেখে—ঠাকুরবাড়ির চুড়ো থেকে সুদর্শনচক্কর অদর্শন হয়ে গেছেন। বাজপড়া-শিক মুঠিয়ে ধরে যে গোদাচিল সারাদিন বসে ভাবত আর থেকে থেকে চিল্‌লাত 'চির্‌র্ আঁচি-র্ পাঁচি-র্ মাসি-র', সেটাও নেই চিলঘরে। ছাতের আলসে থেকে ঝুঁকে দেখি, তোমার ঘরের দেওয়াল ছাওয়া করেছিল যে আমসির গাছ সেটি, আর উত্তর পশ্চিম হাতায় তিন্তিড়ি-গাছ—যার গোড়ায় আমাদের সাতপুরুষের নাড়ি পোঁতা, আর যার নামে বাড়ির নাম হয়েছিল 'বকুলতলার বাড়ি'—সে গাছটিও নেই। পুকুরের পুবধার ঢেকে নেই সে জটে বুড়ির বটগাছ, ঝুরি নামিয়ে কালো জলে। গোল-বাগানের একধারে সেই সিমুগাছ আর একধারে সেই কাঁঠালগাছ —কিছু কি নেই।

'জলের ফোয়ারা, রঙিন টালির গোল রাস্তা—সব লোপাট হয়ে গেছে। গাছ নেই, বাগান থাকে? ফোয়ারা নেই, ঘাস থাকে সবুজ? মাসি অমন বাগান মরে গিয়ে যেন শুকনো লেবুর খোলার মতো পাঙাশ বর্ণ হয়ে পড়ে আছে। সে ছিরি চলে গেছে পুরোনো বাড়ির। ছি ছি মাসি, অমন বাড়ি অমন বাগান তুমি কোন্ প্রাণে তেয়াগ করে এলে? বসে থাকলেই পারতে, কে তোমায় তাড়াত দেখতেম। মাসি, আমার সেই সময় ভোলা ঘড়ি, সেটি এখনো বসে আছে তোমার ঘরের পাঁচিল আগলে; তাকে নড়াতে চাইলেম, সে নড়ল না। আমি বললুম 'থাক তবে, মাসি ঘর পাহারা দে।' সে এখনো চাঁদ ওঠার দিক চেয়ে বসে আছে তেমনি শক্ত হয়ে; আর তুমি, মাসি, এলে কিনা তাকে একলা ফেলে। মনে আছে তো সেটিকে?'

'আছে অবু, অসুখ-শরীর তখন, গোলেমালে তাকে আনতে মনে ছিল না।'

pathagar.net

'তা জানি, মাসি। তোমার খোঁজ নিয়ে এখানে আসতে পঁচিশ দিন সেই নির্বান্ধব পুরীতে আমি একলা কাটিয়ে এলেম। আর তুমি, মাসি, আমায় একটা পত্তর ফেলে দু দিন অপিক্ষে করতে পারলে না সেই পুরনো ঘরে।'

'পুরোনো ঘরের কথা থাক্, অবু। পুরোনো ঘরের সঙ্গে পুরোনো সব কিছু বাড়ি বাগান মানুষ-মুনিষ চলে গেছে। আর ফিরবে কি? যাক, এখন তোর সেই ফেলার মায়ের কাহিনী ক' শুনি।'

'সে হবে এখন বৈকেলে, চিনির পানা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে। এখন একবার ঘুরে-ঘারে এই বাড়িটার সঙ্গে পরিচয় করে আসি।'

'সেই ভালো। পুকুরে নেয়ে এসে পেসাদ পাস্, ঠাকুরের ভোগ সারা হলে।'

'আচ্ছা মাসি।'

দিশা

তুলোগাছে কুড়গাল পাখি বৈকালে কাড়ে রাও।
পাশা কলা শাঁখআলু বেলের পানা খাও॥

ঝকঝকে কাঁসিতে জলপান সাজিয়ে মাসির বাড়ির ঠাকুরঘরের সেবায়েত সামনে ধরে দিয়ে বললে, 'খায়েন।'

'খায়েন কী। এই যে আড়াইটে বেলায় ভোগ খেয়ে উঠেছি।'

'বৈকালি খায়েন।'

'বাপু, খায়েন তো জানি। খায় কে?'

'উদর, বাবু, উদর।'

বুঝলেম সেবায়েত পণ্ডিতলোক, খাও-কে বলেন খায়েং, পেটকে বলেন উদর। কাজেই অনুস্বর বিসর্গ চন্দরবিন্দু দিয়ে সাধুভাষা কইতে হল আমায়।

নৈবিদ্যির কাঁসিখানি হাতে নিয়ে কলার চোপা, শসার টিকলি, শাঁখ আলুর টুকরো গালে ফেলি আর বলি, 'কিং নাম? কুত্র বাসা? অত্র না তত্র? চ পিতা চ মাতা?'

আর সমস্কৃত বিদ্যেতে কুলোলে না, 'কয়টি ভ্রাতা?' বলেই বেলের পানাতে চুমুক।

সেবায়েত জবাব দিলেন, 'এজ্ঞে, মোর নাম বাস্থুন্তে।'

'তাই বলো, নামটা যেন শোনা-শোনা; বাস্থুন্দের কেউ হও?'

'নহঃ।'

'হারুন্দে-মারুন্দের?'

সে দুবার ঘাড় নেড়ে ছড়া কেটে দিলে, পুঁথির পাতায় যেন আঙুল বুলিয়ে চলল তার জিভ—

pathagar.net

'দুঃখের কথা কিবে কহিমু তোমারে,
আমা চেয়ে অভাগিয়া না কেহ সংসারে।
পরিচয় কিবা দিমু, শুন বিবরণ,
ছেলা-বয়সে মাও-বাপ মরিল দুইজন।
বাপ নাই, মাও নাই, নাই বহিন-ভাই,
ঠাকুরসেবায় নাগিয়াছি, অন্য কাম নাই।'

'এ তো ভালো কাম পাইলা' বলে খালি কাঁসিখানি তার হাতে দিয়ে মাসিকে গিয়ে গড় করতে মাসি বললেন, 'চারিদিক ঘুরে কেমন দেখলি, অবু?'

'আশ্চর্য দেখলেম, মাসি।'

'কী দেখলে?'

'সুদর্শনচক্কর অদর্শন হন নি, মাসি। তিনি এখানে এসে ঠাকুর-দালানের আলসেতে গট্ হয়ে বসে গেছেন।'

'আর কী দেখলে আশ্চর্যি?'

'চাঁইবুড়ো আর চাংড়াবুড়ি দুজনে পেঁপেতলা থেকে তুলসী তলায় রোদ পোয়াচ্ছেন।'

'আর কী দেখলে, অবুচাঁদ?'

'মাসি, এমন আশ্চর্য কাণ্ড আমি জন্মে দেখি নি। কোথায় সে বকুলতলার পুরোনো বাড়ি, আর কোথায় এই নতুন বাসা।'

'ঘুরেঘারে দেখলি সব তো, অবু। কেমন বোধ হল?'

'বোধ আর হবে কী, মাসি। দেখে শুনে বুদ্ধিহত হয়ে গেছি। সেখানটা যেন এখানে কে এনে বসিয়ে দিয়ে গেছে। সেই পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে সারিসারি নারকেল-গাছ, সেই ভুতুড়ি-কাঁঠালি, সেই তেঁতুল, সেই পাতবাদাম—সবাই যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে যে যার জায়গায়। কেউ দক্ষিণের বারান্দার দিকে চেয়ে, কেউ উত্তরের পাঁচিল ঘেঁষে। নিশ্চয় তুমি ডাক-মন্তর জান, মাসি। ডাক-মন্তরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সবাই, এতে আর সন্দ নেই—'

pathagar.net

'ডাক-মন্তর যদি হত তবে বাগানের পারে পাঁচিল ঠেস দিয়ে বসত সিঙ্গির বাজার, উড়েযাত্রা, কুঁড়েঘর, ছ্যাকরাগাড়ি, মুদির দোকানপাট সব নিয়ে ; আর ঐ ঠিক দক্ষিণে নাকের সামনে বসে যেত খেতু খোট্টার তিনতলা মোকামটা, আর তারই পাশে হিমি-বাড়িওয়ালির ছাতে পাঁপড়ওয়ালির টিনের ঘরটি। কই, এসব তো আসে নি, অবু ?

'এসেছে মাসি, পাঁপড়ওয়ালির টিনের ঘর এসেছে, পাঁচিল টপকে তোমার বাগানে এখানে লোহার ফটকের ধারে বসে আছে চেয়ে দেখো।'

'তাই তো ওটা তো চোখে পড়ে নি।'

'আমি শহরে থাকতে খোঁজ নিয়েছিলুম ; ফেলার মা বললে, ঘর তুলে পাঁপড়ওয়ালি চলে গেছে ; কেউ জানে না কোথায়।'

পাঁপড়ওয়ালিকে ও-ঘরে দেখলি কি, অবু ?'

'না মাসি, তুমি যে ফটক বন্ধ রেখেছ, ঢুকবে কোন্ সাহসে। ভূতি কুকুর তেড়ে যাবে। ওধারে একখানা মুদির দোকান ভাড়া নিয়েছে, দেখলেম যেন তাকে।'

'তা হবে।'

'হবে কি মাসি, হয়েছে। আমি বলছি, তাকে একদিন খুঁজে ডেকে আনব দেখো। বেতালা তেতালা মারোবাড়ি মোকামগুলো ভারি বলে এতদূর উড়ে আসতে পারে নি, মাসি ; রেল-রাস্তার উঁচু বাঁধে ঠেকে ঝুপঝাপ পড়ে গেছে লোহালক্কড় তালপাকিয়ে ওধারে। ইস্টার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মহাদেব তেওয়ারি সেইসব মাল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে গাড়িগাড়ি চালান দিচ্ছে কারখানায়—কানাইবাবুর হুকুমে।'

'তা ভালো। কিন্তু সেই পাঁচী-ধোপানীর গলি, আর সেই 'অর্চনা' পোস্ট-আপিস ?'

'সব এসেছে, মাসি। কেবল এখানে এসে ভোল ফিরিয়েছে। হয়তো পোস্ট-আপিসটা হয়ে গেছে পেট্রোলের ডিপো।'

pathagar.net

'আর সেই কাদামাখা অন্ধকার গলিটা, অবু ?'

'ভারি সাজ সেজেছে সে, মাসি। লাল শাড়িতে ঘাসি রঙের পাড়, তাতে কাঁচপোকার চমক—রাস্তাটি যেন পাড়াগাঁয়ের মেয়েটির মতো। ঐ টিনের ঘরের কাছ দিয়ে আমি দেখেছি।'

'তুই কেমন করে চিনলি তাকে, অবু ?'

'মাসি, পা চেনে রাস্তাকে, রাস্তা চেনে পা। গঙ্গা-নাইতে যদি কোনোদিন হেঁটে হেঁটে যাও তো, মাসি, সেই রাস্তায় তোমার পা পড়তেই তোমাকেও সে চেনা দেবে। যাবে একদিন, মাসি, গঙ্গা নাইতে ?'

'তা যাব, সময় হোক। তুই নিয়ে যাস পথ দেখিয়ে।'

'সেই ঠিক হবে, মাসি। পারবে তো হাঁটতে ?'

'ও অবু, কাঁকর ফোটে যদি পায়ে ?'

'ঘাসের ওপর দিয়ে যাবে।'

'পায়ে যদি চোরকাঁটা বিঁধে যায় ?'

'বোসো মাসি, ভেবে দেখি। আচ্ছা, তুমি যাবে পালকিতে আর আমি তোমায় হাত ছুঁয়ে পাশে পাশে চলব। তা হলেই হবে, এতে তো রাজি ?'

'রাজি। কিন্তু পথ যদি ভুল হয়, অবু।

'তা হতে পারে না, মাসি। আমি ফিজিকাল জিয়োগ্রাফি পড়েছি। বেহারাদের জানিয়ে দেব, ঠিক রাস্তা ধর। মানচিত্র-মতো।'

'সে আবার কেমন ?'

'শোনো না মাসি—

কাঁধ বদলি করুক জয়নগরের পাল্‌কি
বরানগরের মোড়ে যেখানে আপিস এ. আর. পি.,
সেখান থেকে হাফিস কল,
ডাইনে রেখে দক্ষিণেশ্বর
চলুক সোজা বরাবর,

pathagar.net

বাঁয়ে রাখো হাই ইস্কুল সাগর দত্তর,
ডাইনে মোর ফিরে আগরপাড়া, আদ্যাপীঠ,
তারই ওপিঠে ইছাপুর গন্ ফ্যাক্‌টারি পাচ্ছি।
দেখতে পাচ্ছ তো মাসি এ-পাড়া সে-পাড়া পরিষ্কার ?'
'তা পাচ্ছি, কিন্তু গঙ্গা তো দেখতে পাচ্ছি নে, অবু ?
'এইবার পাবে, শোনো—
ফ্যাক্‌টারি ছাড়িয়ে দাঁতিয়ার খাল,
সেখানে রাতে বেরোয় ডাকাত দিনে খ্যাঁকশেয়াল।
আড়াআড়ি খালটা পেরিয়ে চলো কামারহাটি,
তার পরেই খড়দা, শ্যামসুন্দরের বাঁধাঘাট আর কি,
সেখানে চান সেরে, ফের কাঁধ-বদলি ক'রে
পানিহাটি গদাধরের ছীপাট ধ'রে
এখানে এসে দাখিল হোক মাসির বাড়ির পালকি।'

সে পালকি বুঝি আর আস্ত রেখেছ তুমি সেবারে পিসির বাড়ি যাবার কালে। নড়িটি দিয়েছিলেম, সেটিও খুইয়ে এসেছ। সেটি থাকলে না-হয় হেঁটে হেঁটে গঙ্গা চানে যেতুম। পুরোনো লণ্ঠনটিই বা কী হল তা তুমিই জান।'

'ও মাসি, আমি তো পষ্ট সাফ কথা ছাপিয়ে সাধারণে প্রকাশ করে দিয়েছি। লাঠিগাছা মুনশীবুড়ো কেড়ে রেখেছে, লণ্ঠন আর পালকি দুইই খুইয়েছে তোমার হারুন্দে-মারুন্দে পাঁচভূতে মিলে বালুঘাই পেরোবার সময়। কটক পুলিশের বাবুরাও পড়ে দেখেছে সে কথা। দেখো-না, এবার ঠেকলেন সবাই রাহাজানির মামলায়, হুলিয়া বেরল বলে তাদের নামে চ্যাটার্জি কোম্পানি থেকে।'

'ও অবু, করেছিস কী ? মুনশী যে গ্রাম সম্পর্কে আমার নাত-জামাই, হারুন্দে-মারুন্দে তারা হল পুরোনো চাকর। তাদের ফেসাতে ফেলতে আছে ?'

'পুরোনো চাকর তো এল না কেন তারা তোমার সেবা করতে এখানে ? তোমাকে এই বনালয়ে একা পাঠিয়ে তারা কেউ গেল

pathagar.net

মামার বাড়ি, কেউ গোঁসাইপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি আরামে থাকবেন আর দরকার হলে লিখবেন 'পত্তরপাঠ মনিঅর্ডার করিলেই যাইব' কেউ 'হাত ভেঙে গেছে, হাঁড়ি ঠেলা অসম্ভব', কেউ লিখবেন 'আমি বাটী আসিয়া কালাজ্বর নুমোনিয়া ইত্যাদিতে শয্যাগত, এক বোতল সালসা পাইলে এ যাত্রা রক্ষা পাই, এই পত্র টেলিগ্রাফ বলিয়া জানিবেন।' এই ব্যাভার তোমার সঙ্গে মাসি। যা এককলম ঝেড়েছি, পুলিশের ঠেলায় তোমার পায়ে এসে পড়তে পথ পাবে না, দেখো। তোমার সম্পর্কে নাতজামাই বা কেমন তা তো বুঝি নে—লাঠিটি সাফ গাপ্পাই।'

'ছি ছি অবু, এমন জুলুম করতে নেই মানুষের উপর।'

'মানুষ কী বলছ মাসি. হারুন্দে-মারুন্দে তারা সব ভূত!'

'আহা, গালাগাল দিস নে। আমি ইচ্ছেসুখে তাদের ছুটি দিয়েছি। তুম্বু-জুজুর ভয় পেয়েছে তারা, গরিব তারা তো আমার মাইনের চাকর ছিল না, অবু।'

'তবে কে ছিল তারা মাসি?'

'তুই বল্ না ভেবে।'

'ভাবতে গেলে, মাসি, মাথা ঘুরবে।'

'আচ্ছা, না ভেবেই বল্।'

'বলি—

কে ছিল মাসি, কে ছিল তারা?
তোমাকে মা বলেছিল,
আমার মাকে মাসি বলেছিল যারা,
তারা কে ছিল সব, মাসি?
কত গরব করে বলত তারা—
'আমরা মাসিমার লোক গো';
তোমার ঘরকে বলত তাদের ঘর;
তারা সবাই কে ছিল?
চাকর-চাকরানি দাস না দাসী,

pathagar.net

কেনা বাঁদী না কেনা নফর ?
না আপ্তজন, না কেউ অপর ?
আর সেই যে ছিল গোবরার মা—
জাঁতা ঘোরাত দিনে,
রাতে দাবাত পা,
মাইনেও নিত না, দেশেও যেত না—
তাকে কি দাসীহাটে কিনেছিল, মাসি ?
আর সেই যে, আকাশী পিদুম ঝুলিয়ে দিত
শুকতারার কাছাকাছি বাঁশের আগাতে,
ঘণ্টাকে বলাত 'হুম্ তৎসৎ' সন্ধিপূজাতে,
উঠত দেখে উদয়তারা,
নামটি ছিল যার উদাসী—
পড়াপাখিকে শিখিয়েছিল সে
বলতে—জয় মাসি।
আর সেই বেহারি ? আর সেই রাখামালী ?
আর সেই-যে সে আনত জ্বালানি কাঠ—
কাঠফাটা রোদে খাটত ফাইফরমাশ
আমার, তোমার, বাড়ির সবার,
ছাগলছানার, হাঁসের বাচ্ছার,
কী শীতে কী গরমে দিনরাত।
সে বলেছিল 'বাবু, তোমার বিয়েতে
আমার বউকে রুপোর বালা গড়িয়ে দেবেন মাসি।'
তাকে তোমার মনে পড়ে কি ?
আচ্ছা মাসি, সেই যে আমায় বিনিপয়সায়
মুঠো ভরে দিত টোপাকুল,
এনে দিত রথে রঙিন ছাতা, সোনার ফুল,
ভিঙ্গারে ভরে দিত মিঠেজল কপ্পূরবাস,
সে খাওয়াত কপ্পূরকাঠি পানের দোনা

pathagar.net

চানাচুর বেগনিভাজি
তার নাম ছিল না রাজি ?
এমন শত কাজের শত জনা ছিল—
কেউ আমায় কাঁধে চাপিয়ে ঘোড়া হয়েছিল,
কাঠের দোলনায় ঝাঁকানি দিয়ে
নাট্-সাহেবের পাল্‌কি চাপিয়েছিল,
তিনতলার ছাদে তুলে ধরে দু হাতে
চাঁদমামাকে চিনিয়েছিল,
পুকুরঘাটে কাগাবগাকে,
পানকৌটিকে, বেনেবউটিকে,
শোলার ঝারাতে টুনটুনি পাখিকে,
ঝুমঝুমি-গাছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির কথা শুনিয়েছিল।
এমনি-সব তারা কোন্ দেশ হতে
এসেছিল, মাসি ?

তারা কেউ কুটত আনাজ, বাটত লঙ্কা,
সংক্রান্তিতে কখনো শুনি নি চেয়েছে তঙ্কা,
আপনি এসে বেড়ালের বিয়েতে থালা চাপড়ে
ডঙ্কা পেটাত, কাজল পাড়াত, ঘষত চন্দন—
কাজেতে যেমন খেলাতে তেমন মজবুত
ছিল তারা বড়ো অদ্ভুত।
না চাকর, না নফর, না বাঁদী, না দাসী,
তা কে ছিল ভেবে পাই নে, মাসী।'
'অবু, তারা তোমারও কেউ ছিল,
আমারও কেউ ছিল,
পাখিরও কেউ ছিল,
বেড়ালেরও কেউ ছিল।'
'আর বলতে হবে না, মাসি।'

pathagar.net

'বুঝলে তো, অবু, আর কোনোদিন তাদের দোষ ধরে ডাইরি লেখাতে যেয়ো না যেন পুলিশে—'

'মাসি, যে দোষ করে চুকেছি তার আর চারা নেই। আজ থেকে হুলিয়া লেখালেখিতে নাকে খত, দণ্ডবৎ।'

২

মাসির বাড়ির দক্ষিণ-পাঁচিল ঠেসান দিয়ে ঘরখানি, রেলের ধারেই লালরং-করা তিনটি জানলা। ঘরটা চায়ের ক্যাবিন ডাকবাংলা মিলে দেড় ছটাক, পুরো একটা-কিছু হতে পারে নি; হবেও না কোনোদিন।

বাসুন্তে ভালো ঘর পেয়ে এটা ছেড়ে দিয়েছে আমার জন্যে; দিনরাত রেলগাড়ির চলার শব্দে ঘরখানা কাঁপে, পাছে কোন্‌দিন ঘাড়ে পড়ে এই ছিল তার ভয়। এই ঘরখানি দখল করে থাকি আমি একা। একটা পুরোনো কুর্সি, একটা টেবিল, একটা বেঞ্চি, আর পায়াভাঙা একটা তক্তা, আর-একটি ডালাফাটা কাঠের সিন্ধুক, একটি শুঁড়ভাঙা মাটির গণেশ—এই দিয়ে সাজিয়ে ছ্যালে পেরেক-আঁটা পট ঝুলিয়ে বসে গেছি আরামে ফুলবাগিচার একপাশে; পুতুল খেলা পটদাগা অল্প-পড়া অনেকখানি মনগড়া কত কী নিয়ে। লণ্ঠন নেই, চাঁদ-সূর্যি আলো দেয়, পাই; পাখিরা গায়, শুনি। বাসুন্তে মাসির কাছে তেলবাতির পয়সা নিয়ে ফুলুরি কিনে খায়। বললে বলে, আমার কাছে ঘরভাড়া তো চাইতে পারে না, এমনি করে উসুল দিচ্ছে—মাসি যেন না শোনে।

ফুলবাগিচার উত্তরধারে দেখা যায় মাসির দোতলা বাসাবাড়ি, গেরিমাটির রং-করা ছোট্ট যেন পুতুলখেলার বাড়িটি। পশ্চিমধারে দিঘি, পুবধারে পুকুর হাঁসচরা, আঁকতে ইচ্ছে করে; বসে বসে নিজের ঘরে দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে কত কী দেগেছি—বাঁশঝাড়, পানা-পুকুরে হাঁস; পুতুলও গড়েছি—ঝিঙ্কারী-ঝঙ্কারী, কাঠবেড়াল, গোহালের শিংভাঙা বাছুর।

pathagar.net

এইসব করছি বসে বসে, মাসি যে কখন এসে গেছেন বুঝতেই পারি নি।

'ও অবু, তোর খেলাঘর কেমন গোছালি দেখি।'

'ও মাসি, তুমি এসেছ? এ যে ভাঙা, তক্তা কোথায় বসবে?'

'দেখি-না ঘুরে ঘুরে। ওমা, এ যে পট লিখেছিস্ দেয়ালে। ওমা, এ যে চমৎকার সব পুতুল। নিজে গড়লি নাকি? বাঃ, বেশ তো হয়েছে খেলনাগুলি—সিঙ্গি বাঘ গোরু কাছিম। এটি কি টিয়েপাখি?'

'না মাসি, ও পরিবাণু বেগম।'

'এ দুটি?'

'চিনতে পারছ না ঝিঙ্কারী-ঝঙ্কারী? একটু শালুর টুকরো দিয়ো মাসি, ওদের পরিয়ে দেব। দেখবে ঠিক দুটি বোন।'

'এসব কাঠকাটরা কোত্থেকে জোগাড় করিস?'

'এই বাগান থেকেই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে জমা করি সিন্ধুকে।'

'দেখ অবু, তোকে আমি কেষ্টনগরে পাঠিয়ে দেব।'

'কেন মাসি, আমি তো দুষ্টুমি করি নি!'

'তা নয়, অবু। পুতুলগড় পটলেখা এসব কারিগরের কাছে শিখতে হয়। কেষ্টনগরে কুমোরপাড় আমার চেনা লোক আছে, গেলে সে যত্ন করে শেখাবে।'

'কেন মাসি, আমায় মিথ্যে পাঠাবে? আমি আবার পালিয়ে আসব তোমার কাছে।'

'তা কি হয়, অবু? এসব বিদ্যে গুরুর কাছে শিখতে হয়।'

'শিখলে কী হয়, মাসি?'

'পয়সা হয়, কড়ি হয়, গাড়ি হয়, জুড়ি হয়।'

'হয়ে কী হবে?'

'প্রবাসী কাগজে তোর নাম বেরোবে; চাকরি পেয়ে যাবি বিশ্বভারতীতে।'

'দুলালকে চিঠি লিখে জানি, মাসি; সে যদি বলে তো যাব।'

pathagar.net

'দুলাল আবার কে, অবু ?'

'সে একজন বড়োদরের আর্টিস্, আমার বন্ধু।'

'ও, বুঝেছি। মোটা মোটা চুরুট খায়, ঠ্যাংভেঙে লুঙি, ঠনঠনের চটি, নাকের উপরে গোল চশমা, ঢিলে আস্তিন, বুকের-বোতাম-খোলা জামা, লম্বা ইস্টিক হাতে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটে—কী-যেন খুঁজছে, থেকে থেকে ধুলোবালি হাতড়ে কী-যেন তুলে নিয়ে পকেটে ভরে, মাথার তেলোতে চুল নেই—'

'মাসি, তুমি কী বলছ। দুলাল তো কোনোদিন পুরোনো বাড়িতে যায় নি। তুমি অন্য কাউকে দেখেছ। দুলাল এই আমার সঙ্গে ইস্কুল পালিয়েছে।'

'অবু, সব ইস্কুল-পালানো ছেলের সঙ্গে মিশোনা। তারা সব কুবুদ্ধি।'

'মাসি, দুলাল বুদ্ধিমান ছেলে বলে ইন্‌স্পেক্‌টরের মেডেল পেয়েছে।'

'কুবুদ্ধি বলি আর কাকে। মেডেল পেলি তো ইস্কুল ছাড়লি কেন, বাপু ?'

'সে কেন মেডেল পেলে শোনো, তবে তার বিচার কোরো।'

'আচ্ছা শুনি।'

'বলি—

ইন্‌স্পেক্‌টার শুধোলেন, 'দুলাল,
ইজি রিডার, মোক্ত বউর নোক্তা,
বুধচন্দ্রিকা, ঋজুপাঠ—
কেমন লাগে তোমার ?'
'মশায়, একেবারে গুরুভার।'
গুরুমশায় বেত তুলেছিলেন,
ইন্‌স্পেক্‌টার তাকে থামিয়ে বলেন,
'কেমন হওয়া চাই শিশুদের শিক্ষাটি ?'
'আজ্ঞে, যেমন বোঝার উপর শাকের আঁটি

pathagar.net

'আর, এখন কেমন আছে ?'

'ধোপার মোট যেন উলটে পড়েছে

কল্‌মিশাকের গাছে।'

ক্লাসসুদ্ধু লোক কেলাপ কেলাপ।

পেয়ে গেল মেডেল

মাস্টার রামদুলাল!'

'ও অবু,

পাকা পাকা কথা কয়,

মন নেই পড়াশুনায়,

ইঁচড়ে-পাকা তারে কয়।

তোমার এ বন্ধুটিকে তো ভাল বোধ হচ্ছে না। বুড়িয়ে গেছে যে।'

'না মাসি, ছেলেমানুষ। ফেলা তাকে দাদা বলে।'

'ও বুঝেছি। ফেলা তোমারে কী বলে, অবু?'

'ও বুঝেছি হাসির কথা, মাসি। সে আমার নাম দিয়েছে নসিবমশায়।'

'তার মানে।'

'সে-ই জানে, মাসি। এখানে আসার আগে পুরোনো বাড়িতে রোজ একবার করে এসে বলত, 'নসিব, আমি এয়েছি।'—'এয়েছ, বেশ করেছ'—'দাও আমি তোমার জিনিসগুলি গুছিয়ে দিই।'—মুখ চলল বকে, হাত চলল গুছিয়ে—'এই কাগজগুলো কী হবে, নসিব?'—'ফেলে দাও।'—'আমি নিই এইগুলি।'—'নিয়ে হবে কী ছেঁড়া কাগজ?'

—'নিয়ে মা মুড়ির ঠোঙা করবে। এই টিনের কৌটোটি দাও-না।'

—'কী করবি?'—'মা সিঁদুর রাখবে। এই নুড়িগুলি নেব?'

—'বা রে, ও আমার দরকারি নুড়ি, ওতে হাত দিয়ো না!'—'আচ্ছা থাক্, গুছিয়ে রাখি। এই কড়িগুলি আমি নিলুম।'—'কড়ি নিয়ে করবি কী?' —'ঘুঁটি খেলাব আমরা।' —'আচ্ছা,

কড়িগুলো নিতে পার।'—'মনিব তো ধমকাবে না ?'—'মনিব কে ?' —'ঐ যে দুয়োরগোড়ায় বসে থাকে বোঁদাসীর কোলে চেপে।' 'ওঃ, সেই বুঝি তোমার মনিব ? কিছু বলবে না সে, নিতে পার তুমি।' আর কিছু বলে না, যাবার সময় বলে যায়, 'তুমি যা ফেলে দেবে আমাকে দিয়ো। মা নেবে, আমরা খেলাব, বাবা বেচবে বাজারে।' এমন গিন্নী মেয়েটা, কিছু ফেলতে দেবে না। আমি শুধোলেম, 'ফেলা, তোর মায়ের নাম কী ? —'কোমদী।' —'বাপের নাম ?'—'বসন্ত।' —'কী করে তারা ?' —'কাজ করে। —'কী বললি, নাচ করে ?'—'ধেৎ, কাজ করে বলছি।' আমাকে এক ধমক দিয়ে চলে গেল, মাসি। ভাবলেম, আর আসবে না। সকালে একলা সন্দেশ কিনে খাচ্ছি, দেখি ঠিক সময়ে হাজির। —'নসিব, সন্দেশ দাও-না !' —'খাও।' তার পর চলল—'এটা দেবে, সেটা দেবে, তোমাদের ঘর দেখাও না।' খুব কাজের মেয়েটা ; মাসি, তুমি চাও তো আমি লিখলেই চলে আসবে ; তোমার হুস্কারীমুস্কারীর চেয়ে ঢের ভালো দাসী হবে সে।'

'তার মা তাকে কেন ছেড়ে দেবে, অবু ?'

'ফেলা যে বললে, মা বলেছে, নসিব যদি ডাকে তো যাস্ ফেলা।'

'ওমা, এমন। কত বড়ো মেয়েটা ?'

'এই মাসি, এত বড়ো ; না না, এই এমন ছোটোটি ; না না, রোসো মাসি, দেখি ঐ যে তোমার দক্ষিণ-বারান্দার কোণে দেখা যাচ্ছে ঐ ওইটির মতো এতটুকু মেয়েটা।'

'ওটি বুঝি এতটুক্ হল। ওটি যে একটি সুপুরি গাছ, ফুলের লতা তাকে জড়িয়ে আছে ; এখান থেকে দেখাচ্ছে বটে ছোট্টো।'

'হাঁ মাসি, ঠিক অমনটি ; খোঁচা খোঁচা চুল তার, সুন্দর মেয়েটি। কিন্তু একটি দোষ আছে বলে রাখি। সন্দেশ দাও, খেয়ে নেবে ; তার পর বলবে, তোমাদের সন্দেশ কেমন আটা-আটা ; আমার মা যে সন্দেশ দেয় ডেলা-ডেলা মিছরির মতো, মিষ্টি

pathagar.net

খেতে : একটু নিন্দুক আছে, যদি এখানে এসে তোমার নিন্দে করে বসে ?'

'তা হলে কী করবে, অবু ?'

'সেই তো ভাবনার কথা। এল তো ঘাড়ে-পড়া হয়ে রয়ে গেল।'

'দেখি বিবেচনা করে; এখন তুমি লেখা-পড়াতে মন দাও। পরের কথা পরে হবে। ফেলাও দেখছি ফেলনা নন।'

এই বলে মাসি তো যান। আমি জানলার ধারে বসে পড়া মুখস্থ করতে লাগি—

'ইজ্জিলী বিজ্জিলি তিমি তিমিজ্জিলী
ওয়ান্ টু থিরি
ফোর ফাইব্ সিক্স—ম্যাথেম্যাটিক্স্।'

রাস্তার ওপার দিয়ে তিনটি মানুষ পায়ে পায়ে যাচ্ছে। পুরুষ-মানুষটি নিয়েছে শাবল কোদাল; তার পাছে পাছে দুটি মেয়ে, মাঝেরটির মাথায় পুটুলিবাঁধা ভাতের হাঁড়ি, কোলে খুকু একটি ঘুমিয়ে, হাতে ধরেছে ছাগলের গলার দড়ি; শেষের মেয়েটি চলেছে কালো ছাগল-ছানা একটি বুকে করে। তিনটি জানালা পেরিয়ে যায় তারা, পড়ে চলি আমি—

'সিক্স্পিয়ার, হিস্টিরী,
ট্রী মানে বিরিক্ষ, থ্রী মানে তিন,
নাইট মানে বীরপুরুষ, ডে মানে দিন।'

গড়ানে টিনের চালে শালিক পাখির ছা দৌড়নো অভ্যেস করছে, খুটখাট শব্দ পাই আর পড়ে চলি—

'ফ্রী মানে ছাড়া, হরি মানে তাড়াতাড়ি।'

এবারে শালিখ পাখি-দুটো ঘাসের 'পরে নেমে আমার সঙ্গে যেন পড়া মুখস্থ করছে—

'ব্রীক্ ইট, ব্রীজ্ পুল, মন্থ্ মাস, স্কুল ইস্কুল।'

ঘর কাঁপিয়ে রেলগাড়ি বেরিয়ে যায় স্টেশনের নাম মুখস্থ করতে

pathagar.net

করতে—ডান্‌কুনি বাঘনান্, ডান্‌কুনি বাঘনান্। আমিও তেজে মুখস্থ বলি—

'ময়দা ফ্লাউয়ার, বোকা ফুল,
ডক্‌কে বলে বন্দর, ওর্ককে বলে কাজ,
লিপ হল লাফ, শিপ হল জাহাজ,
হিমগিরি ইমোলোইয়াস, লঙ্কা চিলি,
টেমারিণ্ডিকা তিন্তিড়ি,
মেকাপ্‌কে বলে সাজ,
সাজাকে বলে পানিশ্‌মেণ্টো,
সদাগর মারচেণ্টো, মোচার ঘণ্টো নো ইঞ্জিলী
—ইতি রুল অব্‌ থ্রী।'

রুল অব্‌ থ্রী—রুল—অব্—থ্রী—রু-রুন্ বাঁশি শুনলেম ইস্টিমারের, বিগুল শুনলেম কেল্লার মাঠের, তুস্থ-জুজু জুজু-তুস্থ। তার পরে আর সান নেই, একেবারে ঘোরতর স্বপন। ট্যাঁক হাতড়াচ্ছি পয়সা দেব, ট্যাক খুঁজে পাচ্ছি নে; কোথায় আছি বোঝা দায় হোটেলে না মুদিখানায়।

পেট চাপড়ে বোঝাতে চাচ্ছি খিদে লেগেছে, পেট আর খুঁজে পাচ্ছি নে। পেটের ছাঁদ কন্‌ভেক্‌সিটি না কন্‌কেভিটি, সিটি আর মনে পড়ে না। সিটি কলেজ, ইউনিভার্‌সিটি, মিউনিসিপালিটি, পোকামাকড়ে দাঁত-খিটিমিটি দিলে খানিক, তারপরেই এল মেডিকেল্ ফ্যাকাল্‌টি। বিদ্যুৎপ্রকাশ অকস্মাৎ। দেখি-না পুকুরঘাটের কাছেই জলে পড়ে আছে খুঁটে-বাঁধা চকচকে দুয়ানি। তুলতে যেতে হাত পিছলে পালাল। 'কড় কি কড় কি' ডাক দিল কোলাব্যাঙ। ঘেটো রাঘব বোয়াল খুঁটসুদ্ধ্ দুয়ানি মুখে পুরে কড়বঙ্গাং ঝম্প দিয়েই ডুব মারল। থির জলে গণ্ডির পরে ভাই লক্ষ্মণের গণ্ডি—চৌকো পুকুর হয়ে গেল গোল চশম্। হঠাৎ ফিসফিনিস্ বলে কানের ছাঁদায় মশা ঢুকে পড়ে—ব্যাস্। চট্‌কা ভেঙে কান ঝাড়তে ঝাড়তে খাতা ফেলে দে দৌড়, মোচা চিংড়ি চড়িয়েছি যেখানে চাংড়াদি।

এমনি প্রায়ই কোনোদিন ঠেকে যাচ্ছে পড়া মোচার ঘণ্টোতে, কোনোদিন গুড়-অম্বলে, কাঁটা-চচ্চড়িতে, ডাঁটাসিদ্ধতে, কখনো-বা হাঁসের ডিমের কালিয়াতে। চাঁইবুড়ো চাঁপাতলার ঘাটে ছিপ ফেলে বসে আমাকে আড়চোখে দেখে বলেন, 'আজ কিসের হাঁড়িতে বিঘ্নের জাহাজ তলাতে চললে হে অবুবাবু ?'

আমি রোজই বলি, 'সুক্তোর হাঁড়িতে, চাঁইদাদা।'

চাঁইবুড়ো অমনি শোলক আউড়ে দেন ছিপ গুঁড়িয়ে—

'শুক্তায় মুক্তা, ডিম্বের মধ্যে হাঁস,
ডুবুরি হই তো তুলি, তলাক্-না জাহাজ।
চলো দাদা, দুটো ডুব দিয়ে বসা যাক্‌গে পাতে।'

চাঁইবুড়ো মন্তর পড়েন, পুকুর-জলে দাঁড়িয়ে—'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—যাবৎ পিবেৎ তাবৎ জীবেৎ।' দু-চার কুলকুচি, দুটো ডুব দু পাক ডুবসাঁতার, এক পাক চিৎসাঁতার খেয়ে পৈতে মাজতে মাজতে ঘাটে ওঠা হয়, রোদে-জলে-তেলে পিতলাই হাঁড়ার মতো চাঁইবুড়োর পেটটা চক্‌চক্ করতে থাকে।

আমি বলি, 'চাঁইদাদা, যে মন্তরটা জপো তার মানে কী ?'

'মন্তরের মানে ভাঙতে নেই দাদা, গুরুর নিষেধ আছে।' ব'লে গামছা নিঙড়োতে নিঙড়োতে চলেন আর হাঁক পাড়েন বুড়ো, 'রান্না হল গো ? আর কত দেরী ? একবাটি ঘি বেশী দিয়ো অবুবাবুকে।'

এমনি রোজ দুপুরবেলায় মাসির বাড়িতে চাঁইদাদার বাসাঘরে ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ মুখস্থ করে কাটাচ্ছি। এক-একদিন রোদ-ঝাঁঝাঁ দুপুরবেলায় শালিক পাখির ছানাম্না কপচাতে শেখে প্রথম পাট—'কীট্ কীট্ কিডিং।'

তক্কার পরে চাঁইবুড়ো তালপাতার পাখা চালেন আর বলেন, 'পাখিগুলো কী বলছে বলো তো, অবুদাদা।'

'ওরা ক বর্গ মুখস্থ করছে। কীট মানে কিডিং।'

'অ্যাঃ, এও জানো না ? ওরা কিট্ কিট্ খেলছে গাছতলায়।

pathagar.net

কাঠঠোকরা কী করছে শুনে বলো তো দেখি।'

'ওরা কে জানে কী করছে!'

'বুঝলে না, ওরা কোটরে বসে কাঠের তক্তিতে ক-খ না লিখে টুক্‌টাক্ খেলাচ্ছে হে অবু। ওরা কেউ পড়া মুখস্থ করছে না। ওরা জানে পড়া নয়, দইবড়া মুখস্থ করতে হয়।'

'তুমি কেমন করে জানলে, চাঁইদাদা?'

'শকুনবিদ্যের জোরে।'

'আমাকে শকুনবিদ্যে শেখাও-না!'

'ক্রেমশঃ প্রকাশ্য ভাই। আগে বোবিদ্যেতে তোমার নাক দোরস্ত হোক।'

'সে কবে হবে? হবে তো?'

'অভ্যেস করো, কেন হবে না। এখন বাগানের ওপারে বসে চাংড়ার রান্নার খোশবো পাচ্ছ, এর পর রেলরাস্তার ওপার থেকে পাবে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। দক্ষিণেশ্বরে আমার শ্বশুরালয়ে চাংড়া চড়াত হাঁড়ি, গঙ্গাপারে উত্তর-পাড়ার টোলে বসে পেলাম তার খোশবো! খেয়ানৌকো ধরে বসলেম গিয়ে ষষ্টিবাটার ভোজে।'

'এমন!'

'হাঁ ভাই, এখন যখন হবে তখন জানবে বোবিদ্যেয় বি-এ পাস হলে।'

'তোমার চেয়ে বোবিদ্যেয় বেশি পাস করেছে কেউ?'

'করেছে বইকি? গন্ধগোকুল এ বিদ্যেয় এম-এ, মৌমাছি পোস্ট-গ্রাজুয়েট পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে। বোবিদ্যেয় পুরো দখল পেয়ে গেছে অনেক কৃষ্ণের জীব ভাই।' ব'লেই চাঁইবুড়ো পাঁচালি আওড়ালেন—

> 'তাই-না আসে বাদুড়ছানা না পাকাতে তেঁতুল,
> কলা না পাকতে আগে থাকতে বাগানে পড়ে লেঙুর,

pathagar.net

মালী না জানতে জেনে নেয় কাঠবেড়াল
কোন্ ডালে লিচু হল বসে লাল,
কোন ডালে ঝোলে নারকোলে কুল ;
মালী জেগে দেখে খ্যাঁকশৃগাল
রাতারাতি টপকে আল
বেগুনের খেত করেছে নির্মূল।'

'এইবার বুঝলে তো দাদা ?'

'বুঝেছি।'

'কই, বুঝেছি বলো কেমন বুঝেছ দেখি।'

'রোসো বুড়োদা, ভেবে বলছি। বো=বাস, বাস=সেন্ট= খোশবো !'

'হ্যাঁ, ঐ বিদ্যেয় কৃষ্ণের জীবনমাত্রে পাকা হয়ে ওঠে মানুষের আগেই।'

'না বুড়োদাদা, তোমার হিসেবে ভুল আছে।'

'শুনি কেমন ভুল।'

'বলি বুড়ো দাদা—

১ প্যাঁচা আর ছুঁচা দুজনে বেরোলো
রাতের ঘোরে,
বুড়ো ছুঁচা পড়ে গেল কেন
খপ করে কাল্‌প্যাঁচার খপ্পরে ?

২. শেয়াল বেরোলো গন্ধযুক্তি ধরে
পাহারা হেঁকে
পাকড়াও করলে সহজে পাতিহাঁসটাকে
দাঁতিয়ার খাল বেঁকে।

এমনটা হয় কেন কৃষ্ণের জীবের বিদ্যে যদি সমান হয় ?'

'আহা দাদা, এটাও বুঝলে না, ছুঁচোটার নাকে তার নিজের গায়ের বিকট গন্ধে নস্যিঠাসা, প্যাঁচার গন্ধ পায় কখনো ?'

'পাতিহাঁসের ছানাগুলো—'

pathagar.net

'ওঃ, তাদের পুকুরে নেয়ে ছর্দি লেগে নাক বন্ধ ছিল, প্যাক্ করতে সময় পেল না।'

এমনি শকুনবিদ্যের পাঠ দিতে দিতে চাঁইবুড়োর নাকডাকা শুরু হয়ে যায়—'যাক্ থাক্ থাক্ প-ড়-আ' কামানের গাড়ি, তার পরে সরু সুরে সাইরিন—। 'শুঁ শুঁ শুঁই শাঁই'।

রোদ উঠোনের আড়াই ভাগ ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম দেয়ালে লাগে, আমিও সরি চাংড়াদির কাছে বিদ্যে ফলিয়ে টিফিন আদায় করতে।

'জানো চাংড়াদি, আমি বোবিদ্যে সাধন করেছি? বাগানের ওপার থেকে তোমার রান্নার গন্ধ পাই। চাঁইদাদা বলেছেন শিগ্গিরি বোবিদ্যেয় বিয়ে পাস করব ফাস্ কেলাস্।'

'ও দাদা, যেদিন বোয়ের হাতের চাপড়ঘণ্টো খেয়ে বলতে পারবে, তাতে কতভাগ তেল, কতভাগ লঙ্কা, কতভাগই-বা গুড়, তখন জানবে পাস করলে—ফাস্-কেলাস্ খাস্-গেলাস্। আগে নয়, জেনে রাখো।'

'চাঁইদাদু এ পরীক্ষায় পাস করেছিল, শুধিয়ে নেব তো—'

'ও মা ছিঃ, একথা শুধোতে নেই। বুড়ো চটে যাবে, বলবে, ছেলেমানুষকে জ্যাঠামো শেখানো হচ্ছে। রেগে শেষে খড়মপেটা করে হয়তো—'

'হয়তো কী করবে, চাংড়াদি?

'হাতের হাড় এমনি গুঁড়িয়ে দেবে যে আর কোনোদিন হাতাবেড়ি ধরতে হবে না, রান্না চড়ানো জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবে।'

'তা হলে এ কথা তুলে কাজ নেই, কী বলো?'

'দেখো, ভুলেও যেন এ কথা প্রকাশ না হয়—যা জানলে তুমি।'

'আমি আর জানলেম কী? তুমি শুধোতেই দিলে না।'

'দুঃখু কোরো না দাদা, বদলে সাতখানা আকের টিকলি নিয়ে লক্ষ্মীটি হয়ে নিজের ঘরে যাও। বুড়োকে আর ক্ষেপিয়ো না। খড়ম

pathagar.net

তো খড়ম, আবার যদি ভাস্কা লাঠি বেরোয় তো তুমিও গেছ আমিও গেছি।'

'ভাস্কা লাঠি। সে কেমন?'

'আবার সে কেমন। তুমি দেখছি ফ্যাসাদ বাধিয়ে ছাড়বে। ভাস্কা লাঠির কথা তুলো না যেন বুড়োর কাছে।'

'কেন?'

'আবার কেন। মানা করছি তুলতে। নাও আকের টিকলির সঙ্গে কুঁচো গজা একমুঠো—লক্ষ্মীটি হয়ে ঘরে যাও।'

মাসির কথামতো দুলালকে পত্তর দিয়েছিলেম কেষ্টনগর যাবে কিনা পরামর্শ নিতে। জবাব এল, দুলাল লিখছে, শ্রীশ্রীদুলাল ওরফে রামদুলাল লিখছে—

'অত্র অমঙ্গল বিশেষ। মাসিমাতা-ঠাকুরানী পাড়া ছাড়িয়া যাওয়াবধি শহরে তুম্বু-জুজুর ভয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শহরে লোক তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, নচেৎ তোমাকে বলিতাম শহরে আসিয়া তোমার নিজের গড়া পুতুলের একটা প্রদর্শনী খুলিতে। কিন্তু দেখিতেছি ফেলার মা'র ফেলাকে লইয়া বিপদ—তাহারা বাসা উঠাইয়া অন্তর্ধান করিয়াছে, কুত্র তাহা জানা নাই। কেহ বলিতেছে তাহারা মাসির বাড়ি গিয়াছে, কেহ বলিতেছে অন্য প্রকার। কবিরাজ বলিল, যাইবার কালে ফেলা বারবার বলিয়া গেল, 'নসিব ডেকেছে'; তিনি স্বকর্ণে ইহা শ্রবণ করিয়াছেন। ব্যাপারে কিছু জটিল বোধ হইতেছে। তুমি লিখিয়াছ মাসিমাতা-ঠাকুরানী তোমাকে কেষ্টনগরে আর্টশিক্ষার জন্য পাঠাইতে চাহেন। ইচ্ছা হয় যাইতে পার, কিন্তু বলিয়া আমি খালাস, যথা—

সেখানে মাটিতে গড়বে ঠিক সন্দেশ,
ঠিকঠাক সরভাজা, খৈচুর, জিবে-গজা—
বোধ হবে দেখে রস ভিজে,

pathagar.net

মুখে দিলেই বুঝবে কানা যা ভেবেছিল তা না—
পাতখোলার মতও না—খেতে সরেস।

—জলসাই দুলাল।

এরোড্রম সিনেমা, ট্রেঞ্চ গার্ডেন, ডিস্টিক্ গাঞ্জাম। পত্র দিয়ো। ইতি—

অবুবাবু—

মাসীমাতার বাসা, গুপ্তনিবাস,

পোঃ আলমবাজার, বরাহনগর বেলঘুরিয়া।

পুনশ্চ—মোলায়েম মুনশীর দেওয়া পুঁথিখানি আমার নিকটে ছিল, অত্র সহিতে ফেরত দিলাম।'

ব্যস্। চুকে গেল কেষ্টনগরের ল্যাঠা। দুলালের চিঠিখানা বালিশের তলায় রেখে মোলায়েম মুনশীর পুঁথি নিয়ে থাকলেম—

'পুকুরে ভরিছে জল, আঁখি ঝরায় পানি।
প্রাণরূপী পানকৌটি ডুবে মরে জানি॥'

পড়তে পড়তে চোখে জল আসে। পাতা ওলটাই উর্দু ফ্যাশানে—ডাইনে থেকে বাঁয়ে না বাঁয়ে থেকে ডাইনে, ঠিক করতে পারি নে। পড়ে যাই—

'কুমার কুসস্তু কাচ বিশেষ বিকাশ।
কান্দন শুকাত্রিক কিবা ভুবন প্রকাশ॥
মঙ্গল পঞ্চসিমউচ্চ হয় মহাসুখ।
মুঞি অতি ভাগ্যহীন, মরমে মোর দুখ॥'

মানে না বুঝেই কান্না পায়—

'ভাব সুখ খঞ্জরীট কুটায় সানন্দ।
ভেলা ভক্তি মিলনে করুণ অতি বন্দ॥'

গোটা গোটা অক্ষরে ছাপা পুঁথি; পড়তে কষ্ট নেই, মানে বুঝতে কথায় কথায় মিনিং বুক কন্‌সল্ট করায় না, পড়তে পড়তেই হাসি পায়, কান্না পায়, পেটে খিল ধরে, চোখের জল গড়িয়ে পড়ে,

pathagar.net

ঘাম ছোটে ; কেচ্ছা শেষ, জ্বরও ছাড়ে।

নতুন কেচ্ছা শুরু হয়, বেগুনা বেগমদম্পোক্তি চড়িয়ে ফোছনং মিঞার জন্যে হাহুতাশ করে চলছে—মন উদাস হয়ে গেছে, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। হঠাৎ মাসি এসে উদয় টিনের ঘরে।

'কী পড়ছিস্, অবু ? চোখ ছল্‌ছল্ করছে কেন ? আয় তো দেখি কপালটা, একটু যেন গরম ঠেকছে।'

'ও কিছু নয় মাসি, অনেকক্ষণ ধরে পুঁথি পড়েছি কিনা।'

'পুঁথি পড়তে পারিস ?'

'পারি, কিন্তু সব পুঁথি নয়। বটতলার পুঁথি পারি, কলুটোলার নয়।'

'এমন হয় কেন ?'

'মাসি, বটতলার পুঁথি গোটা গোটা কাঠের টাইপে ছাপা। আর কলুটোলার কলেছাপা পুঁথি—রোগা রোগা অক্ষর পড়তে মাথা ধরে যায়, পিপড়ের সারি যেন সব অক্ষর বিজবিজ করে পাতায়, একরকম চেহারা। বটতলার পুঁথি তেমন নয়।'

'তুই এখন কী পুঁথি পড়ছিলি ?'

'মসলম মসল্লা, মোলায়েম মুনশীর লেখা।'

'আচ্ছা, ছবি দিয়ে মাসিকপত্তর যেগুলো বেরোয়, সেগুলো ?'

'ছবিগুলো পড়তে পারি, প্রবন্ধগুলো নয়। থিয়েটারের বাংলা উর্দু ইঞ্জিলী খুব চট করে পড়তে পারি, বুঝতেও পারি।'

'তোর নিজের লেখা ছবি পড়তে পারিস ?'

'চেষ্টা করি নি মাসি, হয়তো পারি।'

'পুতুল যা গড়িস যেসব পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, দ্বিপদ-চতুষ্পদ —ওদের ?'

'ওদের আর পড়তে হয় না মাসি, গড়ে ছেড়ে দিতেই ওরাই পড়তে থাকে নানা বুলিতে নানা কথা। আমি খালি শুনি মজার মজার কল্পকথা, গল্পকথা।'

'দু-চারটে কথার নাম বল্‌-না শুনি।'

pathagar.net

'এই যেমন, হজ-ফেরত উটের কথা, গানবন্ধ পাখির কথা, টোটাচোর ইঁদুর ঝাঁটাখোর বেড়ালের সংগ্রাম, জস্টিস অ্যান্টি-ফোজেরস্টিনের জীবনচরিত, আমজাদ উজির ও ব্যাঙুমাস্টার, মিস্‌বেলা কাউটের দাস্তান, ঝারার পাখি কাব্য, তাম্বাক অসুরের দরবার।'

'আমার ভারি ইচ্ছে করে এমনি সব কথা শুনতে।'

'মাসি, চাঁইদাদুকে বলো-না কেন, সন্ধেবেলা তোমাকে পুঁথি পড়ে শোনায়।'

'বেই যে কার্তিক মাস ছাড়া পুঁথি ছোঁবেন না। আমি একটা কথকপুতুল গড়াব কেষ্টনগরে ফরমাশ দিয়ে। সে কথা কইবে, আমি রোজ শুনব।'

'সে কি হবে, মাসি? কথকপুতুল যেন কত কথকতা করছে এই ভাব দেখিয়ে বসে থাকবে তাক জুড়ে। মাসি, সে হবার জো নেই, আমার পুতুল-সব সেই বত্রিশ সিংহাসনের পুত্তলিকাদেরও কথার আগেকার, তারও আগেকার কথা কয়, আবার আজকের কথাও কয়; কথক সেজে বসে থাকে না। আবার ডাবুকে দেখ নি, মাসি?'

'না।'

'ভারি মিষ্টি কথাগুলি বলত সে। তার একটি হাত ছিল না, মাসি; ডাবগাছ থেকে তুম্বু-জুজু তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।'

'কোথা সে এখন? দেখা-না।'

'তাকে ঘাটশীলায় কাবুলিদের কাছে হাওয়া বদলাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুম্বু-জুজুর রাগ আছে তার উপর, এখন আর আনব না। সে তো তোমার ঘরের তাকেই শুয়ে থাকত, দেখ নি?'

'না তো, অবু?'

'আর লাট্টুরামের ভাইঝি?'

'তাকে দেখেছি।'

'তার নাম, মাসি, সেঁদুরিয়া বাই?'

'তা তো বলে নি সে।'

'তুমি শুধোলেই বলত। লাট্টু্রাম মাসে লাখ টাকার লাটিম আর কাটিম গড়ে চালান দেয় বর্মা থেকে চীনেতে সুতোর কলের জন্য ; তুম্বু-জুজু তাদের গদি পুরিয়ে মেয়েটাকে ফতুর করে ছেড়েছে। রাজমহিষীর টাকা ছিল সেঁত্থুরিয়ার। ওকে তোমার দয়া হবে ভেবে আশ্রয় দিয়েছি অনাথা বলে, সব, নীচের তাকে, তোমার ঘরের দেয়ালে। ভালো করিনি, মাসি ?'

'তা ভালো করেছ। কিন্তু উট ঘোড়া এ সব এনে আমার ঘরে ঢুকিয়ো না।'

'তা কি পারি, মাসি ? তাদের জন্যে আলমারির তাকে আস্তাবোল পিঁজরাপোল আছে, তাতেই থাকে তারা। আর-সব পুতুল নম্বরওয়ারি ঘরে থাকে—আলমারির গায়ে লেখা আছে ভোজ বিল্‌ডিং।'

'তুমি বুঝি তাদের বাড়িওয়ালা ?'

'না মাসি, আমাকে তারা ডাকে ল্যাণ্ডলর্ড বলে।'

'কত ভাড়া আদায় হয় মাসে বাড়ি থেকে ?'

'সে কি মাসি, তারা কি বাইরের কেউ যে ভাড়া চাইব ? এরা সব আমার কুটুম্‌কাটাম্‌। তুমি চাও আমার কাছে এই ক্যাবিন-ভাড়া ?'

'না চাইলেই দেবে তুমি, অবুচাঁদ ? দেখ অবু, পুরোনো বাড়ি ছাড়বার সময় রোগশয্যেতে পড়ে আমি ঠাকুরকে ডেকে বলেছিলেম, প্রভু, যেখানেই যাই যেন উদয়-অস্ত চাঁদ-সূর্যির আলো পাই ; আর সেখানে খেলাঘরে অবু আমার হেসে খেলে বেড়াবে দেখব।'

'তুমি যেমনটি চেয়েছিলে তেমনটি তো দিয়েছেন ঠাকুর, মাসি ?'

'দিয়েছেন অবু। দেখ, প্রথম-প্রথম এখানে এসে দেখতুম সারাদিনরাত সামনে দিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে-আসছে কত লোক নিয়ে ; তখন মনে হত, হায়, এই পথ দিয়ে আমার বাড়ি যাবার গাড়ি আর আসবে না। তার পর একদিন এই ঘরের দাওয়াতে বসে

pathagar.net

একলা, চাঁদ ছিল না আকাশে, তুইও ছিলি না কাছে, সেই কালে হাওয়া এসে যেন পর্দা সরিয়ে দিলে চোখের উপর থেকে, দেখলেম, আমি আমার সেই বাড়িতে বসে আছি।'

'মাসি, এখানে সেই বাড়িরই হাওয়া বইছে। আমি তো এখানে এসেই বলেছি তোমায়—সেই বাড়িই এটা মাসি ; মিছে তুমি উতলা হও নানাখানা ভেবে।'

'আর ভাবব না অবু, তোর কথাই ঠিক।'

'মাসি।'

'অবু।'

পশ্চিম বাগানের উপরে আকাশে ধরল চম্পাই রং। পুবধারে পুকুরের পারে সিমুগাছ নতুন পাতা ছেড়েছে, তারই ফাঁক দিয়ে উঠল চাঁদ ; পুকুরজলে তার ছাওয়া। শালুক পাতার কিনারায় যেন মাসির পোষা সাদা হাঁসটি ঘুমিয়ে যাবার আগে গা ভাসিয়ে চুপ হয়ে আছে। চাঁদের আলো পাতার ছাওয়া মাড়িয়ে মাসি চলে গেলেন নিজের ঘরে। যেন শ্বেতপাথরের পুতুল বাগান ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে। মাসির ঘরের আজন্মচেনা কতদিনের ঘড়ি সুর পাঠালে, যেন এক ছোট্ট মেয়ে সোনার মন্দিরাতে ঘা দিয়ে থামল।

pathagar.net

'আচ্ছা মাসি, তুমি যে সেদিন বললে আমার মতো তোমার আর-একটি ছিল, কই মাসি, তার কথা তো আর শোনালে না।'

'তার কথা তুমি তো শুধাও নি, অবু।'

'আজ শুধোচ্ছি।'

'আচ্ছা, কাছে বোসো, বলি। দেখো অবু, তুমি যেমন আমার দিদির ছেলে, তেমনি, আমাকে যে দিদি বলত তার কথা শোনো বসে থির হয়ে।'

'মাসি, তোমাকে যে দিদি বলত সেই তোমার ছোটোবোনের নাম কী ছিল, মাসি?'

'সে আমার মায়ের পেটের বোন ছিল না, অবু; তোমার মা আর আমি দুই বোন।'

'তবে?'

'সে আমাকে ভালোবেসে ডাকত দিদি বলে।'

'তার নাম?'

'বনলতা। —হাঁ অবু, এত খবর জানতে চাও কেন? চুপ করে শোনো বলি।'

'মাসি' বনলতা ডাকতেন তোমায় দিদি বলে? আমার মনে হচ্ছে আমি দেখেছি তাঁকে খুব ছোটোবেলায়?'

'না অবু, তুমি আসবার আগেই সে চলে গেল।'

'কোথায়?'

'রাজবাড়িতে।'

'আর ফিরল না?'

pathagar.net

'না। আর ফেরেনি বনলতা।'

'বেশ নামটি।'

'জান অবু, রাজার ভাই তাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল। সেখানে বনলতা নাম পালটে রাজপরিবারের সবাই তাকে অন্য নামে ডাকতে থাকল।'

'তার দরকার কী ছিল, মাসি। বনলতা তো বেশ নাম ছিল।'

'ওকে বলে রাজকায়দা। আদরের নাম উলটে বিজলি-বাতির মতো জমকালো নামই পছন্দ করলেন বুড়োরানী, বড়োরাজা, বড়ো-বউরানী সবাই। রাজবাড়িতে গিয়ে বৈদূর্যলতা নাম হল বনলতার; ফুলশয্যার রাতের গহনাগাঁটির ঝক্‌মকানি দিয়ে গড়া নাম।'

'কি করকরে নাম বৈদূর্যলতা, মাসি। বনলতার কথা বলো।'

'তাই বলব অবু, কিন্তু তুমি কথার পর কথা চাপা দিলে বলতে পারব না।'

'ব ন ল তা। আচ্ছা মাসি, তুমি যখন আমায় মায়ের কথা বল তখন তোমার কথার ফাঁকে ফাঁকে মাকে দেখতে পাই। বনলতার বেলায় তেমনটি হয় না, তাই তো বারে বারে শুধিয়ে চলতে হচ্ছে— কে ছিল কেমন ছিল সে-মানুষটি।'

'সে যেই থাক্‌, শোনো থির হয়ে। তোমার বয়সে আমাকে ডেকে বাবা একদিন বললেন, দামিনী, এই তোর ছোটো বোন বনলতা। সেই থেকে বনলতা রইল আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে। আমাকে সে জানল তার দিদি বলে। একটি কথাও শুধোতে হয় নি বাবাকে, বনলতা কার মেয়ে, কোথা থেকে এল।'

'মাসি, আমার মা তাকে দেখেছিলেন?'

'না।'

'কেন?'

'অবু. এইখানকার কথা এইখানেই রইল যাও খাওয়াদাওয়া করো।'

'না মাসি, আমি আর কোনো কথা তুলব না, সত্যি বলছি।'

pathagar.net

'দেখো অবু, কথা খেলাপ না হয়।'

'অবু, তুমি আমাদের ঘরে আসবার আগে এসেছিল সে বনগাঁ থেকে জয়নগরে বাবার কোলে চেপে ঘুমন্ত এতটুকুখানি ফুটফুটে একটি মেয়ে—বনলতা। সে যখন চোখ মেলে চাইত, দেখতেম যেন চাঁদের আলো দুটি পাতার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে, ভারী সুন্দরী ছিল মেয়েটা। বাহারবন্ধ-পরগনার বজরা যেদিন এল তাকে নিতে সেদিনের তার চোখের দৃষ্টি আমি ভুলব না কোনোদিন। সে বললে, 'দিদি, আমি তবে আসি।' আমি তাকে বুকে আগলে কেবলি কেঁদে ভাসালাম। 'আসি' এই কথাটি বলে যে গিয়েছিল, অবু; কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, রয়ে গেল সে বাহারবন্ধ-পরগনার রাজাদের অন্দরেই বন্ধ। বাবার মুখে শুনলুম তাদের অন্দরের বন্ধখানায় যে-মেয়ে যায় সে যায়, আর ফিরে আসতে পারে না; আপ্তজনের সাথে দেখাশোনা বন্ধ।'

'তুমি তো তাকে দেখতে যেতে পারতে, মাসি।'

'না অবু, সেও হবার জো ছিল না।'

'কেন মাসি?'

'তাদের রাজকায়দায় বাধত। আমরা কেউ যেতে পাব না এই জেনেশুনেই বনলতার খুড়ো তাকে রাজার ঘরে বিয়ে দিয়েছিল।'

'তারপর, মাসি, কী হল? আর কোনোদিন তার খবর পেলে না, বুঝি?'

'খবর আসত, অবু, গহনার নৌকোতে মহাজনের গোমস্তার কাছ থেকে। যখন জয়নগরের ঘাটে লাগত ফিরতি নৌকো বাহারবন্ধ থেকে ব্যাপারিদের নিয়ে, কত কথাই না বলত তারা—ভালো মন্দ, সুখের দুঃখের, সেখানের ছোটোরানীর। শুনতেম আর কাঁদতেম, আর মনকে প্রবোধ দিতেম নানা কথা ভেবে।'

'এমন জায়গায় কেন পাঠালে তাকে বিয়ে দিয়ে, মাসি?'

'বনলতার খুড়ো যে রাজাদের গরিব আত্মীয় ছিল, অবু।'

pathagar.net

'তোমাকে তো তিনি দিদি বলতেন।'

'অবু, মাসি বলে যে-জোর তোমার উপর করতে পারি, দিদি হয়ে সে জোর কি খাটে অবু?'

'তারপর কী হল, বলো।'

'তারপর অনেক সাল পরে এল একখানি ফটো, বনলতার কোলে একটি একমাসের খোকা, ফটোর উলটো পিটে বনলতার হাতের লেখা—'দিদি, আমার খোকাকে পুষ্যি নিয়ে এরা রাজগদি দিতে চাইছে, আমাকে আর খোকাকে লুকিয়ে তুমি জয়নগরে নিয়ে রাখো, লক্ষ্মীটি; আমি তোমার কাছে গেলে নির্ভয় হই।'—বাবাকে দেখালেম লেখাটা, বাবা বললেন, 'উপায় নেই দামিনী, এত সহজ ভাবিস নে তাকে নিয়ে আসা। বাহারবন্ধ বাড়ি তাদের, বেরিয়ে আসার কপাট খুলে বনলতাকে মুক্তি দিতে তোরও নেই আমারও নেই সাধ্য।'

'মাসি, তুমি আমাকে পাঠাও, আমি সেই অসাধ্যসাধন করব।'

'ভাবিসনে অবু, ছেলের জন্যে কেঁদে কেঁদে বনলতা অনেক দিন হল তোর মাকে বড়দিদি বলতে চলে গেছে রাজবাড়ি ছেড়ে। দুঃখ করিস নে।'

'মাসি, বনলতা-মাসিকে আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে-হচ্ছে।'

'ছবিতে দেখাব একদিন, আজ মন ঠাণ্ডা করে পড়তে বস গে।'

হাতে খড়ি

'মাসি, তুমি তো চমৎকার ছবি আঁকতে জান? কার কাছে শিখেছিলে আঁকতে, নন্দদার কাছে, না মুকুল দের কাছে, অসিতবাবুর কাছে, না দেবীবাবুর কাছে?'

'অবু, আমার আঁকা ছবি তুমি দেখলে কোথায়?'

'যদি না ধমকাও তো বলি।'

'বলে ফেল, ধমকাব না।'

'চাংড়াদিদি দেখিয়েছে ঠাকুরঘরে কুলুঙ্গিতে একটি টিনের বাক্সের মধ্যে তোলা ছিল লাল সুতোয় বাঁধা সোনার তাবিচ। তার মধ্যে কাঁচের ঢাকন দেওয়া ছুটি মুখ—একজন বাঁশি বাজাচ্ছে আর-একজন চেয়ে দেখছে তার দিকে।'

'অবু, সে ছবি দেখেছ তুমি।'

'চাংড়াদিদি ঢাকন খুলে দেখালে তাই তো দেখলুম; বললে, এ তোমার মাসির মা-বাপের ছবি, ছেলেবেলায় তুমি এঁকেছিলে। বলো না মাসি কে তোমায় আঁকতে শিখিয়েছিল।'

'চাংড়াদিদিকে শুধোলে না কেন, অবু? বলে দিতেন যিনি শিখিয়েছিলেন তাঁর নাম।'

'তুমি বলো না।'

'না অবু, গুরুজনের নাম মনে মনে জপ করতে হয়, মুখ ফুটে বলতে নেই।'

'আচ্ছা চাংড়াদিদিকে শুধিয়ে জানব।'

'শোনো অবু, ছবি আঁকা যদি শিখতে চাও নন্দদার কাছে, কি অসিতবাবুর কাছে, কি মুকুল দের কাছে শিখতে যেতে চাও তো বল

pathagar.net

আমি পত্তর দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দেব বিশ্বভারতীতে. নন্দদা ছবি আঁকতে শেখান খুব ভালো।'

'না মাসি, তোমাকে যিনি শিখিয়েছিলেন তাঁকে পাই তো তাঁরি কাছে শিখি।'

'তিনি যে অনেক দূরে গেছেন অনেক দিন হল। এখন আমার কাছে শিখবি, অবু?'

'শেখাও তো শিখি, মাসি।'

'তবে চাঁইবুড়োকে বল্ গা একটা ভালো দিন দেখতে। তোর হাতে খড়ি দিতে হবে।'

'ওরে বাবা ও মাসি, আবার হাতে খড়ি ক খ এইসব লিখেরস্ত আ করতে হবে?'

'তা হবে না, অবু? ছবিও যে লেখার শামিল।'

'থাক্ মাসি, তুমি তোমার ছবি লিখতে শেখার গল্প বলো, আমি শুনি। সেলেট পেন্সিল খড়ি তক্তি কাগজ কলম এসব হাতে নিলেই আমার ঘুম পায়।'

'তবে চুপ করে বসে শোন্-না বলি—দেখ্ অবু, আমাকে যে সবাই মাসি বলে ডাকে তার কারণ হচ্ছে আমার ডাক-নাম ছিল পূর্ণমাসী। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সবাই আমাকে মাসিই বলে আসছে। বাবা তখন নেই, মা আছেন। তোমার বয়সে একদিন মা বললেন, 'পূর্ণমাসী, শোন্, আমার একটি কথা রাখবি?' আমি হাঁ-না কিছুই বলিনে দেখে মা বলে চললেন: 'জানিস্ ছোটোবেলায় তুই ছবি দেখতে চাইতিস। বাইরের ঘরে একটা কী জানি কী কল ছিল তাতে চোখ দিয়ে বসলে কত দেশবিদেশের ঘরবাড়ি বাগান সব রঙিন ছবির মতো দেখা যেত। সে এক দিনের কথা, সেই কল নিয়ে তোকে নাড়াচাড়া করতে দেখে তোকে ভারি ধমকাই। দস্যি মেয়ে বলে পিঠে কিল বসিয়ে অন্দরে বন্ধ করি। সেই থেকে তোর মুখ দেখলেই কে যেন আমার মনে এসে ঘা দিয়ে বলে, ওকে ছবি আঁকা শেখানো চাই তোমার। কে এ কথা

বলে তা বুঝি নে—অবোধ নারী। বেঁচে থাকতে তিনিও এই কথাই বলতেন। হয়তো এ তাঁরি হুকুম, আসে-যায় এখনো, কে জানে। পূর্ণমাসী, বল্ তুই ছবি আঁকা শিখবি?'

—'শিখব মা।'

'মাসি, তুমি যে ছোটোমাসি বনলতার কথা বলতে বলতে সেদিন বললে তোমার নাম ছিল দামিনী?'

'অ, অবু, সেইটে বুঝি তুমি মনে করে রেখেছ। শোনো তবে বলি সে যে কাণ্ড হয়েছিল। বিয়ের রাতে ঐ পূর্ণ মাসী নাম নিয়ে মন্ত্র পড়তে গিয়ে আমার বর বেঁকে বসলেন, 'আমি মাসিবলে একে ডাকতে পারব না। পূর্ণমাসী নামটা যেন মাসি-মাসি শোনায়।' সেই রাত্রেই আমার নূতন নাম দামিনী দিয়ে বাপ আমাকে সম্প্রদান করেন।'

'এমন? আচ্ছা বলে যাও, মাসি।'

'মা বিলাসী-দাসীকে ডেকে বললেন, 'চৈতনকে বল, তস্‌বির-কামরা খুলিয়ে ঝাড়পোঁছ করিয়ে রাখে, আমি সে ঘরে পূর্ণমাসীকে ছবি দেখাব।' আমি বললেম, 'মা, ছবি লিখতে শেখাবে যে সে থাকবে না?' মা বললেন, 'পরে আসবে শিক্ষক, আগে নিজে নিজে দেখে শিখবে, তারপরে অন্যের কাছে বিদ্যে নিতে যাবে,—'

'আমারও ঐ মত, মাসি। তারপর?'

'তার পর তো মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈকাল উৎরে সাজগোজ করে ছবির ঘরে গেলেম। পুরোনো বাড়ির সে ঘর তো তুমি দেখো নি অবু—'

'দেখেছি বই-কি মাসি, সেই বাড়ির দখিন ধারে লম্বা ঘর, না, উত্তর ধারে।'

'না, তাও না, পশ্চিম বারান্দার ঠিক সামনে।'

'সে তো আমাদের পড়বার ঘর ছিল। তা হলে দেখি নি মাসি, তুমি বলো।'

'সে ঘর ছিল যেখানে সেখানটা হয়ে গেছে লোপ, খালি আছে

pathagar.net

একখানা ভাঙা কপাট ইঁটখসা একটুখানি দেয়ালে ঝুলে।'

'দেখেছি মাসি, আমি সে জায়গা দেখেছি মনে হচ্ছে। ঠাকুরঘরে ওঠবার সিঁড়ির গায়েই এতটুকু একটি কুলুঙ্গি, তাতে আঁটা একটা কুলুপ-দেওয়া দরোজা। হরিদাসী তার মধ্যে ঘুঁটে জমা করত।'

'না, অবু, না। আমার মায়ের বাপের বাড়িতে তুমি দেখো নি, অবু।'

'জয়নগরের বাড়ি দেখেছি আমি। থেকেছি সেখানে, জন্মেছি সেখানে, তুমিই ভুলে গেছ, মাসি।'

'জয়নগরের বাড়ি তো আমার মায়ের বাড়ি নয় অবু, সেটা তাঁর শ্বশুরবাড়ি।'

'তবে মাসি। আমার মায়ের বাপের বাড়ি ছিল ফুলতলায় রায়দিঘির পাড়ে। এখনো আছে সেটা ভাঙাচোরা অবস্থায় ঝাড়ে জঙ্গলে ঘেরা। তা হলে আর কেমন করে দেখব মাসি।'

'হাঁ, তাই বলছিলেম কি সেই পুরোনো বাড়ির পুরোনো ছবির ঘর—তার দেয়ালে ছবি, ছাতে ছবি, মেঝেতে ছবি; আনাচে-কানাচে যেদিকে চাই যেদিকে যাই সেদিকে ছবি ছিল। সেই ঘরের চাবি আমার হাতে দিয়ে মা বললেন, 'এই ঘর রইল তোমার। এই চাবি, এই রঙের বাক্স, তুলি, ছবি আঁকবার যা-কিছু দরকার, পাবে। এই আমি এখন দায়-খালাস হয়ে কাশীধাম করি গে যাই।'

'কাশীধাম কী, মাসি?'

'তা কী জানি, অবু।'

'আমি জানি, মাসি। চৈতন বারুইকে চন্দর-কবিরাজ বলেছিল, 'চৈতন দিন থাকতে কাশীধাম করো গে।' সেইদিনই পানের বোরজে আগুন ধরিয়ে চলে গেল, আর আসে না। দেখি, তার বৌ চন্দন-কবিরাজকে ধরে পড়ল। কাশীতে চৈতনের খোঁজ করার খরচা আদায় করে ছাড়ে আর কি। এমন সময় বারুই এসে উপস্থিত কাশী

pathagar.net

থেকে দিব্বি হিরিষ্টুপুষ্টু হয়ে। কাশীবাস করতে গিয়ে লোক প্রায় ফেরে না, ওই একটি মানুষকে দেখেছিলেম ফিরতে।'

'তবে চৈতন কী করে ফিরল, অবু?'

'সে এসে বলেছিল সবাইকে, নন্দি ভিরিঙ্গি তাকে ঘাঁড়ে চাপিয়ে কৈলেসে সিঙ্গির খোরাক জোগাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মা-অন্নপূর্ণার মন্দিরে কিছুকাল কলাভোগ খেয়ে গায়ে যখন বল পেলে তখন রাতারাতি গঙ্গা সাঁতরে উঠল গিয়ে বলরামপুরের রাজার বাড়ি। সেখানে দ্বারপালকে কুস্তিতে হারিয়ে বাহবা নিয়ে ফিরেছে দেশে চন্দর-কবিরাজকে হাতের কসরত দেখাতে।'

'তার পর কী হল, অবু, চন্দর-কবরেজের?'

'তা জানিনে মাসি। শুনেছি ঐ একটি মানুষ কাশীবাস করতে গিয়ে ফিরেছে, আর কেউ ফেরেনি। তোমার মা তোমাকে ছবিঘরের চাবি দিয়ে ভুলিয়ে কাশীবাস করতে গেলেন, তুমি এমন যে বুঝতেই পারলে না।'

'তোর কথাই ঠিক, অবু, আজ বুঝতে পারছি। আজ এইখানে গল্প থাক্, কাল শুনো, কেমন?'

'তাই হবে, মাসি।'

Book No 386
Date 14.6.2005

pathagar.net

সংযোজন

pathagar.net

Book No 386
Date 14.6.2005
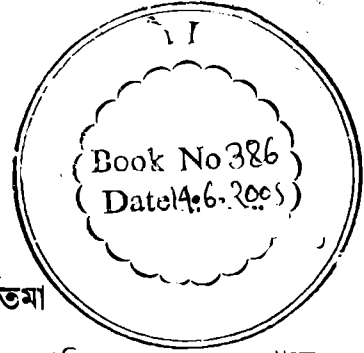
দেবীপ্রতিমা

একদা বিহগগীতে মুখরিত, পুষ্পসৌরভে মোদিত হেমন্তের অরুণোজ্জ্বল প্রাতঃকালে লোকলোকেশ্বরী মন্দিরের—চন্দ্রমণিমণ্ডিত শিশিরবিধৌত শীতল প্রাঙ্গণতলে,—গুরুদেব দেবীমন্দিরের সহস্র ভক্ত সেবকের সেবকাধম আমার হস্তে দেবীর আরতিভার অর্পণ করিয়া আমাকে বিজয়মাল্যে বরণ করিলেন।

আমি গুরুচরণে প্রণত হইয়া কহিলাম—গুরুদেব, তুমি স্বহস্তে যে কঠিন প্রাণহীন পাষাণকে কমনীয় দেবীমূর্তিতে অমর জীবনদান করিয়া করুণার উৎসের ন্যায় জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, সেই লোকেশ্বরীর আরতি তোমারই কাজ। প্রভু, তুমি যেমন অচলা ভক্তি-প্রগাঢ় উৎসাহ লইয়া অকম্পিত হৃদয়ে সেই সহস্রশিখামণ্ডিত স্বর্ণপ্রদীপে এতকাল মহাদেবীর মঙ্গল আরতি সমাধা করিলে, আজ এই দুর্বল হৃদয় ক্ষীণ উৎসাহ অল্প ভক্তি লইয়া মন্দিরপালিত পথের বালক আমি কেমন করিয়া কোন গুণে দেবীকে তুষ্ট করিব ?

গুরুদেব আশীর্বাদ করিলেন, বৎস, দুর্বলের বল, নিরুৎসাহের উৎসাহ, ক্ষীণ হৃদয়ের জীবনসঞ্চারিণী লোকেশ্বরী তোমার সহায় হউন! যে দেবী তোমার সুগঠিত সুদীর্ঘ নবীন দেহে অসীম বল দিয়েছেন তিনিই তোমার তরুণ হৃদয় ভক্তি-বলে সতেজ করুন।

দেবীর চরণামৃতে পবিত্র, গুরুর আশীর্বাদে সৌরভিত, ভক্ত-সহস্রের প্রীতিরসে প্রফুল্ল শুভ্র বিজয়মাল্য শিরে বহন করিয়া আমি নির্জন কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। মন্দারগন্ধা সেই অমলা মালা সমস্ত দেহে যেন অমৃত সিঞ্চন করিয়া—চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায়, বন্ধুর স্নেহের

ন্যায় সুখস্পর্শে আমার হৃদ্‌পদ্মকে পলকে পলকে বিকশিত করিল।

হেমন্তের দীর্ঘদিন আমার সেই নির্জন কক্ষে সুরভিত অন্ধকারে স্বপ্নে জাগরণের ন্যায় সুধীরে সুখে অস্ত গেল।

আমি সেই দিন সায়াহ্নে—ভক্তের ভক্তির ন্যায় নির্মল, নারীর স্নেহের ন্যায় কোমল, সঞ্চিত পুণ্যরাশির ন্যায়, যশস্বীর সুযশের ন্যায় অমল ধবল লঘুভার বিস্তীর্ণ উত্তরীয় যুগলে শোভিত এবং গুরুর প্রসাদচন্দনে চর্চ্চিত পবিত্র মাল্যদানে ভূষিত হইয়া গুরুদেবের পার্শ্বে, লোকেশ্বরী প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম।—পশ্চাতে লোক লোকেশ্বরী মন্দিরের মহা বিস্তীর্ণ স্তম্ভশ্রেণীবেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, জনতার কোলাহলে ভক্তির উচ্ছ্বাসে স্ফীত তরঙ্গিত পরিপূর্ণ ; আকাশ কলাপীর কণ্ঠের ন্যায় নীল মসৃণ কোটি তারকায় উজ্জ্বল, এবং সেই পূর্ণ সন্ধ্যায় অস্ফুট চন্দ্রালোকে ঈষদুদ্ভাসিত, নিঃশব্দ গম্ভীর পাষাণ-মন্দিরের গভীর অন্ধকারে, পাষাণময়ী লোকেশ্বরী-প্রতিমার চরণতলে স্বর্ণবিজড়িত রত্নখচিত আরতি-প্রদীপের সহস্রশিখা, সহস্র ভক্তের একাগ্রচিত্তের ন্যায়, নিষ্কম্প নিশ্চল নিষ্কলুষ জ্বলিতেছিল। আমি দেখিলাম লোকেশ্বরী প্রতিমার শ্বেত-কমলদলশুভ্র পাষাণগঠিতযুগল চরণের স্বচ্ছ শোভা সমস্ত বেদীতল যেন চন্দ্রকিরণে প্লাবিত করিতেছে। আর দেখিলাম পুষ্পভরে বৃন্তের ন্যায় কিঞ্চিৎ হেলাবনত সুগোল সুপুষ্ট সুদীর্ঘ পাষাণকঠিন গ্রীবার উর্দ্ধে দেবীর চিরবিহসিত কমলানন আজ যেন শিশিরজর্জ্জরিত শিথিলমৃণাল পদ্মের ন্যায় বিষাদভরে নম্র হইয়া কঠিনকটাক্ষে বিশালনয়নে গুরুদেবের বর্ষকুঞ্চিতবিশীর্ণ মুখে চাহিয়া আছে। মনে মনে বলিলাম—একী অভিমান ঐ পাষাণনয়নে, একী ভর্ৎসনা ঐ রুদ্ধঅধরে এতকাল কঠিন রোধে জলস্রোতের ন্যায় সুপ্ত ছিল! হে দেবী, হে অভিমানিনী, আজ তাহা কোন্ মর্ম্মপীড়ায় সহসা প্রবলবলে মর্ম্মরবন্ধ বিদীর্ণ বহির্জগতে বিক্ষিপ্ত হইল! জগদম্বে, কাহার উপর তোমার এ অভিমান, কাহাকে এ ভর্ৎসনা! পাষাণময়ীর স্থির অভিমান অশ্রুজলে বিগলিত হইল না—নীরব ভর্ৎসনা

মর্ত্যভাষায় প্রকাশিত হইল না, কেবল দেবীর সেই পলকহীন স্থির নয়নে ভাষাহীন রুদ্ধ অধরে গভীর হইতে গভীরতর, তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইয়া আমার মর্মস্থলে শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইল, আমি তীব্র বেদনায় অন্তরে বাহিরে অভিভূত হইলাম।

সহসা, সবলে তাড়িত স্বর্ণশৃঙ্খলে লম্বমান দেবীমন্দিরের বৃহৎ তাম্রঘণ্টা, সেই স্থির অন্ধকার পাষাণ-মন্দিরের প্রতি কক্ষে, অনন্ত উদার নীল আকাশের স্তব্ধ বক্ষে ধ্বনি প্রতিধ্বনি জাগাইয়া, মর্মাহত দেবীর গঞ্জনার ন্যায় আমাকে ব্যথিত বিচলিত করিয়া কঠোর ঝন্‌ঝনায় বাজিতে লাগিল। আমি স্বপ্নভঙ্গে ভ্রান্তের ন্যায় বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

গুরুদেব বলিলেন, বৎস, শুভ মুহূর্ত আগত। আজ এই পুণ্যক্ষণে প্রজ্বলিত প্রদীপের সহস্র শিখায় দেবীর চরণাগ্র হইতে কিরীট পর্যন্ত আরতি-রচনায় এমনি করিয়া অর্চনা যেন জগতে আজ তোমার শিষ্যত্ব এবং আমার গুরুগৌরব ধন্য হয়!

গুরুর এই প্রিয় সম্ভাষণে, দেবীর রোষকটাক্ষে মূৰ্ছিতপ্রায় আমার অন্তরাত্মা, অরুণস্পর্শে শীতরজনীর শিশিরমীলিত কমলের ন্যায় নবীন উৎসাহে প্রফুল্ল হইল।

আমি সবলে দৃঢ় মুষ্টিতে গুরুভার সুবর্ণগঠিত আরতিপ্রদীপ গ্রহণ করিলাম। যেন কোন্ মহৎ উল্লাসে সেই পুণ্য প্রদীপের সহস্র শিখা সহসা চঞ্চল হইল। পরে সেই পাষাণময়ীর কমলচরণতলে রাগোজ্জ্বল শিখা, সহস্র পরাগরঞ্জিত লুব্ধ ভ্রমরপঙ্‌ক্তির ন্যায় বারংবার বিঘূর্ণিত করিয়া ধীরে ধীরে উঠিলাম। উত্থানবেগে পীতসোম আর্যমণ্ডলীর ভক্তিবিহ্বল লোচনসহস্রের ন্যায় আরক্তিম আলোল শিখা-সমূহ ক্ষণস্তিমিত ক্ষণঃপ্রকাশিত হইয়া মিলিত জ্যোৎস্না সন্ধ্যারাগে সেই দেবীর আরতি করিল। পরে ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বে লোকেশ্বরীর শুভ্র কিরীটের সর্বোচ্চশিখরে সেই স্বর্ণময়ী শিখাময়ী জ্যোতির্ময়ী আরতি-অর্চনা সম্পূর্ণ স্থির করিলাম। অচঞ্চল

pathagar.net

শিখাসহস্র অনাবিল আলোকধারায় সেই দেবীমূর্তিকে যেন তীর্থজলে অভিষেক করিয়া স্থিরদীপ্তি তারকাপুঞ্জের ন্যায় প্রতিমার মুখচন্দ্র বেষ্টন করিল।

আমি সাগ্রহে ব্যগ্রনয়নে চাহিলাম,—দেবী নাই, চণ্ডী নাই,—আজ সেই অভিমানিনী পাষাণী মহাদেবী লোকেশ্বরী কোথাও ছিল না! সেই পাষাণ প্রতিমার অন্তরে ছিল না, বাহিরে ছিল না,—কায়ায় ছায়ায়, মন্দিরের অভ্যন্তরে, বহির্জগতে নভস্তলে চরাচরে কোথাও ছিল না; কিন্তু সেই ধূপামোদিত মণিমণ্ডিত দেবীমণ্ডপে সেই মানময়ী মহাদেবীর গভীর অন্তরে এতকাল এ কোন্ বিস্মৃত জগতের বর্ণহীন স্পর্শহীন পাষাণসুন্দরী, দিবালোকে গ্রহনক্ষত্রমালিনী রজনীর ন্যায় গরীয়সী মহাদেবীর মহীয়সী মহিমা প্রভায় লুপ্ত ছিল। আজ সন্ধিক্ষণে দেবীত্ববিমুক্ত অক্ষয়যৌবনা এই সুন্দরী পাষাণী মূর্তিমতী বাসনার ন্যায় কি মোহিনী মায়ায় প্রকাশিত হইল! আমি সভয়ে চলিতচিত্তে সেই নববিকশিত পাষাণসৌন্দর্যের চারুচরণতলে লোকলোকেশ্বরীর পুণ্য আরতি পূর্ণ করিলাম। আজ প্রাচীন মন্দিরে দেবীর সেই অকারণ অভিমান, আর পাষাণে সেই নববিকশিত ললিত যৌবন আমার ভক্তহৃদয় অপূর্ব বেদনায় অপূর্ব বাসনায় পূর্ণ করিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বেদনবিজড়িত পুলক-শিহরিত অঙ্গে আরতিশেষে মুক্তজনতা দেবীমন্দিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিলাম।

তখন আকাশপ্রসরে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোবিলম্বিত শ্রেষ্ঠ মণির ন্যায়, বিকশিত পূর্ণচন্দ্রের রজতচ্ছটায় সেই মণিমণ্ডিত বৃহৎ প্রাঙ্গণ যেন চন্দনরসে ধবলিত হইয়াছিল; এবং ঘনীভূত হেমন্ত রজনীর শিশির-চুম্বন, তপ্তধরণীর দগ্ধবক্ষ যেন বধূর আদরে স্নিগ্ধ করিতেছিল।

সেই সময় কী ক্ষণে, হে চন্দ্রবদনা, শুক্লবরণা নীলাম্বরধারিণী মনোরঞ্জিনী রঞ্জনা; হে আমার আরতিমুগ্ধা নবযৌবনা নৃত্যকুশলা কুমারী নর্তকী—তোমার রাজেন্দ্রবন্দিত কমলচরণের কোমল

pathagar.net

বিক্ষেপে, মৃদুশিঞ্জিত স্বর্ণনূপুরের সুবর্ণভাষায়, আমার প্রথম রচিত সন্ধ্যারতির বিজয়বন্দনা করিতে করিতে কী সহজ শোভন মনোহর ভঙ্গিতে আমার চরণদ্বয় চুম্বনাঙ্কিত করিয়া বিলোলকটাক্ষে চঞ্চলচরণে চলিতদুকূলের সূক্ষ্ম সুবাসে, কিঙ্কিত নূপুরের উদ্দাম সংগীতে সেই বিজন প্রাঙ্গণ সুরভিত গুঞ্জরিত করিয়া চলিয়া গেলে। রজতরজনীর পূর্ণমিলনে অলসিত সরসিত পুলকাঞ্চিত সুবিশাল জগতের সুনিবিড় স্তব্ধতায় তোমার সেই সভয়কম্পিত চকিত চুম্বন, মধুবাসিত নূপুর-কিঙ্কণ, মৃদু হইতে মৃদুলে, ভাষা হইতে ভাবে বিগলিত হইয়া আমার বেদনাবিদ্ধ বাসনাদগ্ধ শুষ্কহৃদয় প্রণয়সুধায় সরস করিল—যেমন করিয়া দিনান্তে বিগততাপ হেমন্তের সিক্ত সন্ধ্যায় বিন্দু বিন্দু বিগলিত হিমানী তপ্ত ধরণীর দগ্ধ বিস্তার নবরসে নবীন করে।

নবাগত বিরহের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ শিশিরকাল তুষারতাড়নে দিক্‌বিদিক্ শিহরিত করিয়া সমাগত হইলে, হে রঞ্জনা, তোমার কাণ্ডার-মণ্ডিত সুবর্ণশকট দক্ষিণপথে চালিত হইল এবং তোমার বিরহে হতশ্রী রাজধানী যেন বিষাদে মলিন বেদনায় স্তব্ধ হইল। আর বিদায়ের অবসানে প্রগাঢ় আলিঙ্গনভরে ত্রুটিত মুক্তাহারের ন্যায় হতভাগ্য আমি তোমার কমনীয় কণ্ঠ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিশান্তে তোমার সেই শেফালিবাসিত নিকুঞ্জভবনপথে শূন্যমনে পাষাণমন্দিরের শূন্যকক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। হে রঞ্জনা, শিশিরকাল তোমার বিরহ-বেদনায় কত না সুদীর্ঘ, কত সুতীব্র, কতই অসহ্য! আমি কী যন্ত্রণায় তোমার বিরহ-রজনী বঞ্চনা করিলাম—হে প্রেয়সী, হে সহচরী, আমার প্রণয়কুঞ্জের অধিদেবতা, মনোরঞ্জিনী রঞ্জনা। শেষে যে রাত্রে আমার গৃহদ্বারে, মুকুলিত রসালের সুরভিত পল্লবশয়নে, মধুমত্ত বধূসহায় পরভৃৎ, তাহার মধুকষায় পঞ্চমস্বর সুপ্তজগতে বারংবার কুহরিত করিল;—যে রাত্রে, তোমার সববিরহে অতিবিকল আমার নিদ্রাহীন নেত্রদ্বয় নববসন্তের ময়লচুম্বনে সুখালসে নিমীলিত হইল, সেই রাত্রে হে রঞ্জনা, হে তরুনী তন্বঙ্গী, আমার শিশিরকাতরা ভীরু বিহঙ্গী, তুমি দেশান্তরে, নীলাম্বু-চুম্বিত সিন্ধুতীরে, তোমার সেই উত্তরে রোপিত তমালশ্রেণী, দক্ষিণে

বিস্তৃত পুষ্পকুঞ্জের মধ্যস্থলে, অগুরুবাসিত আতপগৃহে, শিশিরভয়ে নিবিড়-বিলম্বিত স্থূল যবনিকার পটান্তরে বাতায়ন-শ্রেণী অবিচ্ছেদে রুদ্ধ করিয়া এবং অবিরলবিস্তৃত লোম-কোমল আস্তরণে গৃহতলের তুহিনতা হরণ করিয়া দিবারাত্রি কখনো সংগীতচর্চায় কখনো কাব্যালাপে কখনো বা মৃগচর্মনির্মিত তপ্ত শয্যায় অলসলুণ্ঠিত দেহে কনকপাত্রে অনলোজ্জ্বল মদিরা পানে সমস্ত শিশিরকাল বঞ্চনা করিয়া আমাদের দেবদারুচ্ছায় নিবিড় উত্তর জনপদে তোমার জলরাশিবেষ্টিত কুঞ্জভবনে আবার ফিরিয়া আসিলে।

মনে পড়ে সেইদিন, হে রঞ্জনা, তোমার স্বভাবপাণ্ডু স্নিগ্ধ কপোল দীর্ঘকাললবণাম্বুশীকর সংশ্রবে পাটলশোভায় নিরতিশয় শোভমান এবং পথশ্রমে সাতিশয় উত্তাপিত হইয়াছিল, এবং মনে পড়ে সেই রাত্রে, হে নিরুপমে, আমার তৃষাতুর সুদীর্ঘ চুম্বনে বারংবার ব্যথিত হইয়া তোমার পদ্মরাগবিনিন্দিত বিম্বাধর, লুণ্ঠিতমধু রক্তোৎপলের সকরুণ শোভাকে তুচ্ছ করিয়াছিল।

তোমার ও আমার নবযৌবনে সেই অবিরল বিকশিত কুসুমকুঞ্জে, মধুঋতু কখন তোমার বীণাতন্ত্রীর মৃদুঝংকারে, কখনো ঐ মধুকণ্ঠের কলহাস্যে ঝংকৃত কুহরিত হইয়া—অবশেষে পূর্ণ হইল ; এবং প্রতিদিন রমণীয় সন্ধ্যাকালে চন্দনবারিবিধৌত শিলাতলে সুখাসীনা বিগলিতবসনা তোমার স্বেদাঙ্কিত আনগ্ন শ্রীঅঙ্গের সুখস্পর্শলাভে সন্তাপহীন অতি প্রচণ্ড গ্রীষ্মমাস তোমার কবরীবিরাজিত যূথিকাদামের মৃদুগন্ধবাহী উষানিলে মন্দ মন্দ বাহিত হইয়া দিনে দিনে নবঘনশ্যাম স্নিগ্ধ বর্ষায় উপনীত হইল।

সেই নববর্ষায় একদিন ঘনান্ধকার স্তব্ধ সন্ধ্যায় আমরা বিজনকক্ষে প্রজ্বলিত গন্ধপ্রদীপের মৃদু আলোকে তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলাম ;—অদূরে বনান্তে প্রস্ফুটিত কেতকী কদম্বের প্রগাঢ় গন্ধ বর্ষাবিধৌত সিক্ত পবনে স্নিগ্ধ হইয়া দিগ্বিদিকে প্রসারিত হইতেছিল। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকাশ মানিনী রমণীর কজ্জলমলিন বেদনাবনত নয়ন-পল্লবের ন্যায়, জলভরে নম্র ছিল, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎকটাক্ষ—অপরাধী

নায়কের ন্যায় পদলুণ্ঠিত বিস্তীর্ণ জগতের অন্ধকার বক্ষ বজ্রবর্ষণে বিদীর্ণ করিতেছিল। আমি একাকী ভাবিতেছিলাম তোমারি মুখ, তোমারি নববিকশিত কান্ত তনু, নবযৌবনে কোথাও কঠিন কোথাও কোমল। আর ভাবিতেছিলাম এই নূতন প্রথম অভিসারনিশায় বাসরসেবার সহস্র আয়োজন আর কোন্ দুষ্প্রাপ্য মদিরায়, আর কোন্ প্রফুল্ল কুসুমে, কোন্ নীললোহিত সরস জম্বুস্তবকে কোমল শ্যামল মধুময় করিব।

সহসা রজনীর অন্ধতমসাবৃত সুপ্ত রাজধানীর জনহীন রাজবর্ত্ম হইতে তুমি হে লাবণ্যময়ী কুমারী নর্তকী, কেবলমাত্র তোমার রূপযৌবনে ভূষিত হইয়া আমার সেই বাসরগৃহে গন্ধপ্রদীপের মৃদু আলোকে প্রকাশিত হইলে, হে প্রকাশভীরু নব অভিসারিকা! সেদিন তোমার কটিতট কাঞ্চীহীন, বাহুলতা ভ্রষ্টকঙ্কণ, চরণকমল হৃত-মঞ্জীর হইয়া নিস্তব্ধ ছিল। তুমি তোমার বারিবিন্দুসিক্ত গন্ধলিপ্ত নীলবসনে নিদ্রামণ্ডিত স্বপ্নের ন্যায় আমার গোপন গৃহে সন্তর্পণে পদার্পণ করিলে। সেই রাত্রে ঘনবর্ষায় নিরুদ্ধকবাট আমার সেই বাসরগৃহে সুরচিত শয়নতলে তোমার ঐ বিকশিত রূপরাশি পুষ্পস্তূপের ন্যায় বিকীর্ণ হইল। হে জগৎবাঞ্ছিতা অনিন্দিতা। তুমি স্বেচ্ছায় এই বাহু-বন্ধনে বদ্ধ হইলে। বাহিরে বর্ষাপীড়িত সমস্ত রজনী কোন এক অতি অপূর্ব ধারাগৃহের ন্যায় বিস্তৃত রহিল।

ক্ষিতিতল নববারিসিঞ্চনে সুকোমল, উষানিল শীকরসম্পর্কে সুস্নিগ্ধ, পুষ্পকুঞ্জ নবলাবণ্যে বিকশিত ;—তুমি সেই সিক্তকোমল ধরাতল কমল-চরণের বিকচ শোভায় বিচিত্র করিয়া সেই শীকরস্নিগ্ধ উষানিল আলোল কবরীর অমল গন্ধে আকীর্ণ করিয়া শ্রীঅঙ্গস্পর্শে পুলকিত কুঞ্জপথে রজনীশেষে গৃহে ফিরিলে, হে জাগরণপাণ্ডুবদনা স্রস্তকুন্তলা বিবসা নর্তকী!

pathagar.net

শ্রাবণের অবসানে অর্ধরাত্রে নক্ষত্রালোকিত স্তব্ধ রজনী সহসা কলকাকলীতে পরিপূর্ণ হইল। লঘুগতি হংসশ্রেণী শরতে বারিবিহীন

মেঘখণ্ডের ন্যায় নীলাকাশে শঙ্খশোভা বিস্তার করিতে করিতে হিমানী-শীতল উত্তরপবনে শুভ্রপক্ষ বিস্তার করিয়া দক্ষিণমুখে প্রস্থান করিতেছে। এস তুমি হে রঞ্জনা, গভীর নিশায় নগরোপকণ্ঠে উপবনপথে কনকপক্ষ মরালীর ন্যায় মণিবিচিত্র সুবর্ণ শকটিকা প্রস্তুত ; এস সহযাত্রী সহচরী, হংসপক্ষের ন্যায় সুকোমল শকটপৃষ্ঠে আরোহণ কর। নগরীর ভূষা, রাজার আদরিণী, রত্নস্বরূপিণী নবযৌবনা নর্ত্তকী, আজ তোমাকে লইয়া বনপথে বহুদূরে প্রস্থান করি।

দিবাবসানে মরুমধ্যে তোমার সুবর্ণ শকটিকা পূর্বমুখে দীর্ঘচ্ছায়া বিস্তার করিয়াছে ; এস হে পথশ্রান্তা তপক্লান্তা, এই শ্যামচ্ছায়ায় স্নিগ্ধপবনে, ধেনুচতুষ্টয়ের শুভ দৃষ্টিপাতে ক্লিষ্টতনুর পথক্লান্তি দূর করিবে।

হে ভীরু, দিগন্ত বন-রেখায় মলিন ; রাজ-আজ্ঞায় অনুগামী-সৈন্যদলের গমনবেগে বালুকারাশি উৎক্ষিপ্ত হয় নাই ; বৃথা আশঙ্কা! এই ভীতিবিহীন উদার মরু আজ তোমাকে অতিথিরূপে বরণ করিল। এই রৌদ্রবর্ণ খর্জুরগুচ্ছের মধুরস, এই বালুকানিহিত বিমল সলিল পান করে, পরে এই সুকোমল বালুশয্যায় স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় খরতাপে সন্তাপিত বৃন্তের ন্যায় শিথিল বিবশাঙ্গ তুমি আমার অনাবৃত বক্ষে সেইরূপে মিলিত হইয়ো, যেরূপে পুরাকালে বাসনালোলুপ ব্রহ্মলোক হইতে পলায়নপরা কুমারী সন্ধ্যা শুভ মুহূর্তে মর্ত্যলোকে ব্রহ্মষির শ্রেয় বক্ষে আশ্রয় লাভ করিলেন।
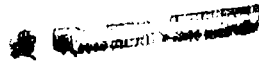
স্তব্ধরাত্রে গগনমণ্ডলে নক্ষত্রসকল অমঙ্গলের সূচনা করিল ; মরুবক্ষে কর্ণপাত করিয়া শুনিতে পাইলাম উত্তরে অশ্বগণের পদধ্বনি। উঠ উঠ হে প্রিয়ে, হে বালুশয়নে অবলুণ্ঠিতা নিদ্রাতুরা। ধেনুচতুষ্টয় অন্ধ আশঙ্কায় সহসা চঞ্চল হইল ; বালুরাশি রথচক্র গ্রাস করিয়াছে ; অন্ধকারে মরুপথ দুর্নিরীক্ষ্য, রাজসৈন্য অনুগামী, পলায়নপথ সুদূর। তবে এস দৃঢ় আলিঙ্গনে হৃদয়ের অতি নিকটে! দেখিয়ো তোমায়

pathagar.net

আমায় বিচ্ছেদ না ঘটে,—দেখিয়া আমাদের এই শুভযাত্রা অর্ধপথে শেষ না হয় ; এস হে জীবনপথে চিরসঙ্গিনী চিরান্ধকার মৃত্যুপথে আজ চিরসহচরী হইয়া চল ! সেই অন্ধকারে তুমি আমার ধ্রুবতারা, সেই চিরবাসরে একমাত্র রত্নপ্রদীপ !

হে রঞ্জনা, শার্দূলাঙ্কিত পতাকাশ্রেণী বহ্নিশিখার ন্যায় ক্রমশই অগ্রবর্তী। এস সুষুপ্তা বিষধরীর ন্যায় এই মরুলতিকার বিষরস পান করি, গভীর সুখে জীবনবন্ধ শিথিল হইবে—আজ এই নূতন পথের শেষ কোথা ! কোন্ সুরপুরে ! যেখানে গুরুর আজ্ঞা নাই রাজার শাসন নাই।

প্রিয়ং মে প্রিয়ং হে প্রিয়ে। অয়ি কল্যাণী ! উত্তরে তোমার জন্মনক্ষত্র সহসা শুভ আলোকে উদ্ভাসিত হইল,—রাজদূত আজ রাজার অভয়বাণী, গুরুর শুভাশীর্বাদ বহন করিয়া আনিয়াছে; প্রলয়মেঘ আজ পুষ্পবৃষ্টি করিল ; বিষপাত্র অমৃতরসে পরিপূর্ণ ; হে বরাঙ্গনে। মরুগৃহে শ্যামাঙ্গী এই নবলতিকা আজ সখীর ন্যায় তোমাকে এই অমৃতাঞ্জলি উপহার দিল ; এস উষার ন্যায় তরলবর্ণ মধুরস নির্ভয়ে পান কর, পরে সুখবাহিত সুবর্ণশকটে জীবনপথে অগ্রসর হও।

কাল বহুদিন পরে স্বপ্নলোকে মহিমান্বিতা মহাদেবী লোকেশ্বরী আমাকে করুণাময়ী মাতৃরূপে দর্শন দিলেন ; হে রঞ্জনা আজ উষানিলে অঙ্গে অঙ্গে পুলকিত হইয়া প্রবাসভবনের প্রস্তরময় বিস্তৃত সোপানে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম—হে জন্মদাতা লোকেশ্বরী, সেই আরতির প্রথম রাত্রে তোমার অন্তর হইতে যে পাষাণসুন্দরী বাহিরে আসিল সে কে ? তাহার অর্থ কী ? সহসা মহাদেবীর মূর্তিমতী ভাষার ন্যায় শুক্লাম্বরবেষ্টিতা প্রাতঃস্নাতা তোমাকে দেখিলাম ; সিন্ধুতীরে করবীকুঞ্জে যেন মর্মরবিরচিতা পাষাণসুন্দরী—চরণতলে আকীর্ণ আহরিত পুষ্পরাশি, —উষালোকে নিরতিশয় পাণ্ডুবর্ণা—বুঝিলাম সে কে। আর বুঝিলাম সে একই দেবতা, কোথাও লোকেশ্বরী কোথাও হৃদয়েশ্বরী।

বল হে প্রেয়সী লীলাময়ী নবীনা নর্তকী, তোমার হৃদয়কুঞ্জে সে দেবতা কে ? যাহার অর্চনায় তুমি প্রতিনিয়ত বর্ণে ছন্দে গীতে গন্ধে

অহর্নিশি বিকশিত। যাহার চারিদিকে পুষ্পকুঞ্জের ন্যায় তোমার বিচিত্র শোভা বিস্তৃত, এবং যাহার চরণতলে তোমার এই তরঙ্গিত নব যৌবন গঙ্গা-স্রোতের ন্যায় নানা রঙ্গে নানা ভঙ্গে উচ্ছ্বাসে আবর্তে দিবারজনী লুণ্ঠিত উচ্ছ্রিত উদ্বেলিত হইয়া এক উন্মত্ত উদ্দাম বিচিত্র বন্দনায় অবিরত প্রবাহিত রহিয়াছে। কে সে দেবতা তোমার দুর্গম হৃদয়তীর্থে, তোমার সুশোভন যৌবনমন্দিরে, তোমার সৌন্দর্যস্বর্গনিকেতনে, হে বরবর্ণিনী বরাঙ্গনা।

pathagar.net

সেবারে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়া যেখানে বাসা করিয়াছিলাম ঠিক তার সম্মুখে বাদশাহি আমলের একটা বাগিচা ছিল। প্রকাণ্ড বাগান; পাথরের প্রাচীরে চারিদিক ঘেরা, তারি মাঝে পাথরে গাঁথা গোল-গম্বুজ তিনটা কবর। বাগানের স্থানে স্থানে লাল পাথরে বাঁধান হৌজ তার মাঝে জলের ফোয়ারা; বড়ো বড়ো নিমগাছের তলায় শ্বেতপাথরের চাতাল। স্থানটা জনশূন্য এবং অযত্নে এখন নষ্টশ্রী। বাগিচার খবরদারি করতে কোম্পানি বাহাদুরের নিযুক্ত একজনমাত্র বৃদ্ধ মালী ছিল এবং তাহারই যত্নে দুইচারিটা ফুলগাছ ও কতকটা সবুজ ঘাস সেই স্থানটাকে মনোরম এবং সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাইয়া বেড়াইবার মতো করিয়া রাখিয়াছিল।

আমার বাসার ত্রিসীমানায় আর জনমানব ছিল না। খবরের কাগজ এবং দুই একখানা চিঠি লেখা ছাড়া হাতে কাজও বড়ো একটা ছিল না, সুতরাং সেই বৃদ্ধ মালীর সঙ্গেই বন্ধুতা পাতাইলাম ও সিকি দুয়ানির লোভ দেখাইয়া তাহাকে আমার বাংলা ঘরের এক কোণ দখল করিতে রাজি করিলাম। সন্ধ্যাবেলা ঠিকা চাকর দুইজন কাজ শেষ করিয়া যখন আমায় একলা রাখিয়া চলিয়া যাইত তখন মালী আসিয়া গল্প জুড়িয়া দিত। আমি তাহার মুখে সিফাইবিদ্রোহ, কমিশনার সাহেবের বাঘ শিকার শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। শীতকালের সন্ধ্যাটা তামাকের ধুম আর গল্পের পর গল্পে বেশ গরম থাকিত।

নিষ্কর্মা মানুষের অনেক রকম বাতিক আসিয়া জোটে; আমারও তেমনি অনেকগুলা ছোটো-খাটো বাতিক দেখা দিল; তার মধ্যে লেখা

বাতিকটা সর্বপ্রধান। আমি প্রথম প্রথম ছোটো গল্প এবং খণ্ড কবিতা লিখিয়া মাসিকপত্রে পাঠাইতে লাগিলাম। ছোটো করিয়া লেখা যে সহজ নয় এ কাণ্ডজ্ঞান তখন আমার জন্মে নাই। যাই হোক নেশা ক্রমে জমিয়া উঠিল। ডিকিনসনের দোকানে রীতিমতো হিসাব খুলিয়া মাসিকপত্রের জন্য আর একটা উপন্যাস আরম্ভ করিয়া দিলাম। উপন্যাসটা যে সেই সাহি-বাগের কবর তিনটার চারিদিক বেড়িয়া বেড়িয়া গজাইয়া উঠিতেছিল তাহা আর বলিতে হইবে না। কলসের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো গল্পটা আমার তিনটি মাত্র পরিচ্ছেদের ভিতরে দিবারাত্রি খাটিয়া বেশ ফেনাইয়া তুলিতেছিলাম।

সেই সময় একদিন বাদলার পরে দারুণ শীত পড়িল,—ঘরে আর বসিয়া থাকিবার যো রহিল না। উপন্যাসটার একটা পরিশিষ্ট সেই সাহি বাগিচার কবরের উপরে বসিয়া লিখিব মনস্থ করিয়া খাতা হাতে বাহির হইলাম।

উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে বরফের মতো তীক্ষ্ণ হাওয়া বহিতেছিল। ঘাসের উপরে মেহুদী গাছের বেড়ার গায়ে গায়ে শিশিরের জাল পড়িয়াছে। বেলা আটটা ; তখনও সূর্যদেবের দর্শন নাই। বাগিচার সান্‌বাঁধা রাস্তায় চলিতে পা যেন হিম হইয়া গেল। আমি নিঃশব্দে গিয়া বাগিচার মধ্যে বড়ো কবরটায় আশ্রয় লইলাম। কবর-স্থানের দেওয়ালের একদিকে আনার ফুলের জালি দিয়া বাহিরের আলোক আসিতেছিল, আমি তাহারই কাছে বসিয়া লিখিতে লাগিলাম। দিবসের আহার সঙ্গে লইয়া ঠিকা চাকরদের ছুটি দিয়া আসিয়াছিলাম। সুতরাং বাসায় যে ফিরিতে হইবে তাহা মনেই ছিল না। লেখা শেষ করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন সমাধি-গৃহটা অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে ;—চারিদিকের দেওয়ালে নানা বর্ণের প্রস্তরে লেখা বিচিত্র লতাপাতা, কানিসের কোলে কোলে পাথরে খোদাই করা আল্লার স্তোত্র স্পষ্ট আর দেখা যায় না। জালির ভিতর দিয়া একটুখানি চন্দ্রালোক কবরের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে

pathagar.net

—ঠিক যেন কে সেখানে বড়ো বড়ো রূপার ফুল ছড়াইয়া গিয়াছে।

আমি বাহির হইবার জন্য দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলাম দ্বার বন্ধ। মালী ঠিক নিয়মিত সময়ে বাহির হইতে শিকল টানিয়া চলিয়া গিয়াছে। শীতকালে জলে পড়িলে যেমন হয়, হিম অন্ধকারের ভিতর প্রাণটা আমার তেমনই হাঁফাইয়া উঠিল। পকেট হইতে দেশলাই লইয়া একটা জ্বালাইলাম এবং তাহারই ক্ষীণ আলোকে পথ চিনিয়া যেখানে বসিয়া লিখিতেছিলাম সেইখানে আসিয়া বসিলাম। অন্ধকার কবরে চামচিকা বাদুড় এবং কে জানে আরো কাহাদের সহিত একা প্রাণী রাত কাটাইতে হইবে ভাবিয়া মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আজ রাত্রিটা জাগিয়া কাটাইবার মতলব করিয়া একটার পর একটা সিগারেট ধরাইতে লাগিলাম। এভাবে কতক্ষণ কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। হঠাৎ এক সময়ে একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। প্রথমটা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, ক্রমে সকল কথা মনে আসিল।

মালী খুব প্রাতে আসিয়া কবরের দরজা খুলিয়া দিত, আমি ভাবিলাম সেই বুঝি শিকল খুলিল। তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পারিলাম না,—হাতপা যেন অবশ হইয়া গিয়াছিল। ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। পকেটে হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিলাম, আন্দাজে আন্দাজে একটা কাঠি ঘসিলাম, —খস্ করিয়া বাক্সের গায়ে শব্দ হইল কিন্তু আলোটা যেরূপ হইল তাহাতে আমি অবাক হইলাম ;—দেশলাই কাঠিকে এরূপ ব্যবহার করিতে জন্মে দেখি নাই! কাঠিটার মাথায় অগ্নিশিখা নাই অথচ সমস্ত গৃহটা যেন দিনের মতো স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

আমি দেখিলাম চারিদিকে শ্বেত পাথরের দেওয়ালে লেখা বিচিত্র বর্ণের লতা, পাতা, ফুল, ফল, মণিমাণিক্যের মতো ঝক্‌মক্ করিতেছে। দিনের বেলায় কতদিন এই কবরের ভিতর বেড়াইয়া

pathagar.net

গিয়াছি কিন্তু এত কারুকার্য তো কোনো দিন চোখে পড়ে নাই। দেওয়ালগুলো যেন আয়নার মতো মসৃণ—কোথাও বিন্দুমাত্র ময়লা ছিল না। বোধ হইল যেন আজ প্রস্তুত করিয়াছে। এক মুহূর্তে আমার চোখের সম্মুখে মোগল শিল্পের সমস্ত গৌরব উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সামান্য একটা দেশলাই কাঠি যে এরূপ কাণ্ড ঘটাইবে আমি আশা করি নাই। সোনার কাঠির স্পর্শে যেন একটা মায়ারাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেছে মনে হইল। বাহিরে বাগিচায় গোলাপ ফুল ফুটিয়াছিল কিনা কে জানে, কিন্তু একটা মৃদু গোলাপী গন্ধ এবং জলের ফেয়ারায় একটা শীতল ঝর্ঝর সংগীত স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। কেবলি মনে হইতে লাগিল এখনি আমার চোখের সম্মুখ হইতে অতীতের একখানা পর্দা সরিয়া যাইবে। আমি একটা অনাবিষ্কৃত রহস্যের এক অঙ্ক পাঠ করিবার আশায় লোলুপ চিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। কতক্ষণ এরূপ অবস্থায় কাটাইয়াছিলাম বলিতে পারি নাই। হঠাৎ এক সময়ে সমস্ত আলোক নিভিয়া গিয়া চারিদিক অন্ধকার হইয়া একটা দারুণ শীত ও সঙ্গে সঙ্গে কম্প হাড়ে হাড়ে বিঁধিতে লাগিল আমি গায়ের লুইখানা টানিয়া মুড়ি দিলাম এবং যে অভিনয়টি দেখিবার আশা করিতেছিলাম তাহাতে নিরাশ-হইয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার খাতাখানার কথা মনে পড়িল—সেটাকে উপাধান করিব বলিয়া। কিন্তু খাতা নাই! অন্ধকারে আশপাশ হাতড়াইয়া দেখিলাম খাতার চিহ্নমাত্র নাই! তখনই একটা দেশলাই জ্বালিয়া খাতার সন্ধানে উঠিলাম। এবার দেশলাইটা আর পূর্বের মতো ব্যবহার করিল না—সহজভাবেই জ্বলিতে লাগিল।

আমি যেখানে বসিয়াছিলাম তাহার এককোণে অনতিগভীর একটা শূন্য কবর ছিল, আমি সেই স্থানটায় ভালো করিয়া খুঁজিবার জন্য আলোক হাতে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সহসা সেই সময় কে যেন পশ্চাত হইতে আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল এবং চমৎকার উর্দুতে বলিয়া উঠিল—বাবুজী এই যে তোমার কেতাব! আমার শিরায়

শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। চিৎকার করিবার শক্তি ছিল না—কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। যন্ত্রচালিতের মতো আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। মাথার ভিতরটা ঝাঁঝাঁ করিতেছিল, চোখে ভালো দেখিতে পাইতেছিলাম না। সম্মুখে দেখিলাম অস্পষ্ট ছায়ার মতো মোগলাই পাগড়ি এবং জামাজোড়া পরনে এক পুরুষমূর্তি! সে ধরনের কাপড় এবং শিরস্ত্রাণ এখন চলিত নাই কিন্তু তবু লোকটি যেন চেনাচেনা বোধ হইল। তাহার শ্মশ্রুহীন মুখে এমন একটা কমনীয়তা ও রাজভাব বিদ্যমান ছিল যে, তাহাকে দেখিয়াই আমি বুঝিলাম, ইনি কোনো বড়ো লোক হইবেন।

পশ্চিমে অনেক দিন থাকিয়া আমার মুসলমানি আদব কায়দা ও উর্দু ভাষাটায় বিলক্ষণ দখল জন্মিয়াছিল। আমি লোকটিকে রীতিমতো সেলাম ও সম্ভাষণ করিয়া খাতাখানির জন্য হাত বাড়াইলাম।

লোকটি একটু হাসিয়া বলিলেন—খাতাতে কী লিখিয়াছেন পড়িয়া শুনাইতে আপত্তি আছে কি?

রাত্রি এখনো অনেক আছে---খাত শুনাইতে আমার আপত্তি দূরে থাক্ শুনাইবার লোক পাইলে বাঁচি, তবু ভদ্রতার খাতিরে বলিলাম—যদি আপনার বিরক্তি না হয়—।

'তবে আসুন' বলিয়া লোকটি আমাকে লইয়া সেই সমাধিগৃহের পূর্বদিকের এক অংশে প্রকাণ্ড একখানা শ্বেত পাথরের চৌকির উপরে গিয়া বসিলেন। ধরিয়া ধরিয়া লেখা শুনাইয়া অনেক মানব-আত্মাকে আমি নির্ভয়ে যন্ত্রণা দিয়াছি, এবার প্রেতাত্মার সঙ্গে আলাপটা এই সূত্রে কীরূপে জমিবে সেটি একটা ভাবনার বিষয়। যাহা হউক গল্প শুরু করিয়া দিলাম এবং যত শীঘ্র পারা যায় তিনটা পরিচ্ছেদ শেষ করিলাম। গল্পের পরিশিষ্টটাও শুনাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শ্রোতার মুখে উৎসাহের লক্ষণ বড়ো একটা দেখা গেল না, সুতরাং খাতা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—গল্পটা আপনার কেমন লাগিল। উত্তর হইল—মন্দ নয়। কিন্তু সাহিবাগের ইতিহাসটা আপনি যেরূপ

pathagar.net

দিয়াছেন সত্য ইতিহাসটা তাহা অপেক্ষা আরও হৃদয়বিদারক এবং আমিই সেই বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান অভিনেতা ছিলাম। তবে বলি শুনুন :

'দিল্লীর রাজ-তক্তের ঠিক নীচেই আমার আসন ছিল। হিন্দুস্থানের বাদশাহি একদিন আমাকেই করিতে হইবে এ কল্পনাও সময়ে সময়ে করিতাম। বাদশাহি প্রথামতো এক হিন্দু রাজকুমারীর সহিত আমার প্রথমে বিবাহ হয়। আমি ২১ বৎসরে ছয়-হাজারি শাসনকর্তার পদ ও হিন্দুবেগমকে লইয়া বাঙলা দেশে গেলাম। সেইখানে আমাদের নব অনুরাগের মাঝখানে গোপন বিচ্ছেদের প্রথম সঞ্চার। যে মোগলকুমারী আমাদের দুই হৃদয়ের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার রূপের সীমা ছিল না, আর যে রাজসুতাকে আমি আল্লার নাম লইয়া বরণ করিয়াছিলাম, তাঁহার গুণের স্মৃতি প্রেতলোক হইতে আজিও আমায় আকর্ষণ করিয়া আনে। বাঙলাদেশে আসিয়া কেবল যে রাজ্য শাসনে ব্যস্ত নই একথা কে জানে কেমন করিয়া দিল্লীতে পৌঁছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দারিয়াগঞ্জ ও তৎসন্নিহিত ভূখণ্ডের শাসনভার অনতিবিলম্বে লইবার জন্য জরুরী পরোয়ানা আমার নিকট পৌঁছিল। আমি বাধ্য হইয়া বাঙলা দেশের বসন্তলীলা অসময়ে এবং অতি অশোভনরূপে অসমাপ্ত রাখিয়া সপরিবারে এই নিমগাছের দেশে চলিয়া আসিলাম। মনটা আমার যে নিমের মতনই তিক্ত হইয়া গিয়াছিল সেটা অধীনস্থ সকলে কিছু দিন ধরিয়া বেশ অনুভব করিতে থাকিল। ভাবিয়াছিলাম শাসনকার্যে আমার অতি মনোযোগ, শীঘ্রই দিল্লী দরবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং অচিরে পুনরায় আমাকে বাঙলাদেশে নির্বাসনে যাইতে হইবে। কিন্তু যেরূপটা চাহিয়াছিলাম সেরূপটা ঘটিল না। স্থান বদলের তাগিদ না আসিয়া উল্টিয়া বরং দরিয়াগঞ্জে নৌ-সেতুটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া গঙ্গাযমুনার সংগম স্থলে প্রাচীন কেল্লাটাকে সুদৃঢ় ও নিজের বাসোপযোগী করিয়া লইবার জন্য তিন গাড়ি মোহর আসিয়া হাজির হইল। আমি বেশ বুঝিলাম দিল্লী হইতে আমার জন্য সোনার শৃঙ্খল আসিল

এবং আমার নিজের কারাগার নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। বাঙলা দেশ ছাড়া দুর্দমনীয় সাহাজাদাদিগের জন্য অন্য স্থানও ছিল, সেটা আমি বেশ জানিতাম। সুতরাং সেই তিন গাড়ি মোহরের জন্য দিল্লীতে একটা বিশেষ রকম ধন্যবাদ প্রেরণ করিয়া যতটা সম্ভব প্রফুল্লচিত্তে কাজে লাগিয়া গেলাম। হিন্দুবেগমের অনুরোধে যমুনা তীরে একটা হিন্দুর দেবমন্দির ঘিরিয়া আমি কেল্লা ও আমার মণি-মাণিক্যে বিচিত্র অপূর্ব প্রাসাদ গাঁথিয়া তুলিলাম। সেখানে সেই গঙ্গা-যমুনার চির মিলনের তীরে আমার বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় অঙ্কটা আরম্ভ করিলাম এবং সেটা যে চোখের জলে চিরবিরহের করুণ ক্রন্দনের মাঝখানে শেষ করিয়াছিলাম তার সাক্ষী এই কবর তিনটি। তারপর আমি ওই দক্ষিণ দিকের কবরটায় আমার হিন্দু বেগমকে বামদিকের ছোটো গম্বুজটার নীচে আমাদের চারি বৎসরের স্নেহের ধনকে ফেলিয়া রাখিয়া দিল্লীর রাজতক্তে গিয়া বসিলাম। সেখানে ঐশ্বর্যের নেশা, রূপের লালসা কোনোটাই অতৃপ্ত রহিল না। যাহার জন্য বাঙলা দেশে নির্বাসনকামনা করিয়াছিলাম; সেই মোগল-কন্যাকে একদিন সুতীক্ষ্ণ ছুরির বিদ্যুদ্দাম করিল রুধির বর্ষার অভিসার রজনীতে হিন্দুস্থানের অধীশ্বরীরূপে বাদশাহি তক্তে আমার পাশে আনিয়া বসাইলাম। তারপরে অভাবনীয় ভোগ এবং পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃহন্তা, সন্তানগণের হাতে মর্মান্তিক শোক ও যন্ত্রণার মাঝে জীবনের আমার তৃতীয় অঙ্কটা হঠাৎ একদিন শেষ করিলাম। এই যে মাঝের কবরটা দেখিতেছ এটা আমি নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলাম। কিন্তু কে জানে, কেন তাহারা আমাকে এখানে আনিল না। লাহোরের আনারবাগে আমায় নিয়া সেই রূপবতী মোগল-কুমারীর পাশে রাখিয়াছে, আর আমার প্রেতাত্মা এই সাহিবাগের শূন্য কবরটায় স্থানলাভ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গঙ্গা যমুনার চিরমিলনের মাঝে যেমন রেখামাত্র ব্যবধান কিছুতে মুছিবার নয়, আমি তেমনি মোগল সম্রাট আর আমার হিন্দুবেগম যমুনার দুই জনের মাঝে শূন্য কবরের বিচ্ছেদ চিরদিন অপূর্ণ রহিয়া

pathagar.net

গেছে ! ওই ঘোড়া আসিয়াছে, আমি তবে চলিলাম, আপনি বিশ্রাম করুন।'

আমি কী একটা বলিতে যাইতেছিলাম, হঠাৎ বিজাতীয় ভাষায় Well, good morning শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম ঘোড়ায় চড়িবার সাজ পরিয়া দারাগঞ্জের ডাক্তারসাহেব। ইনি মাঝে মাঝে সকালবেলা অশ্বারোহণে সাহি-বাগিচায় বেড়াইতে আসিতেন।

pathagar.net

ডাঙায়

মীরবহর ঘাটের কাছে মহাজন-পটি থেকে কাঠগোলা পর্যন্ত বাঁশ-তলার গলি আঁকা-বাঁকা, সরু, অন্ধকার, নর্দমার পাঁক আর কাদায় পিছল। দুধারে চারতলা পাঁচতলা বাড়ির দেওয়াল সোজা উঠেছে; জানালা নেই, বারাণ্ডা নেই, পায়রার খোপের মতো এখানে-ওখানে দু-একটা কেবল ঘুলঘুলি, তার থেকে ময়লা চটের পর্দা ঝুলছে। মুটে-মজুর, গরীব ফেরিওয়ালা, দোকানী-পশারী-এরাই সব এখানে থাকে অল্প ভাড়ায়। বাড়িগুলোর একতলায় মুদীর দোকান, কাফি-খানা, মদের আড্ডা, চালের আড়ৎ, ফল-ফুলুরীর বাজার—এমনি সব দু সারি। রাস্তায় সারি-সারি গোরুর গাড়ি দিনরাত চলেছে; ভদ্রলোক মোটেই চলে না; যত কুলি-মজুর বদমাস-গুণ্ডা, কেউ লাঠি, কেউ ছেঁড়া কম্বল, কেউ খালি ঝুড়ি নিয়ে চলাচল করছে। মাসের পয়লা, তাই আজ বাড়িওয়ালা মাড়োয়ারি দুচার জন গরীব ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া আদায় করতে, আর যারা অনেক দিনের ভাড়া বাকি ফেলেছে সেই সব নিরুপায় লোকগুলোকে স্ত্রী পুত্র নিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিতে হাজির হয়েছে। কেউ এপাড়া থেকে ওপাড়ায় উঠে যাচ্ছে—ছেলে-কোলে বাক্স-মাথায়; কেউ একটা গোরুর গাড়িতে ভাঙা-চোরা ফুটো-ফাটা মাদুর, তক্তা, ময়লা কাঠের সিন্দুক, ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি বোঝাই করে চলেছে, এক আঁটি খড় কিনে যে ঢেকে-ঢুকে যত্ন করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাবে এমন পয়সা তাদের নেই। এমনি অযত্নে এপাড়া-ওপাড়া এবাড়ি-ওবাড়ি এ-সিঁড়ি ও-সিঁড়ি এ-ঘর ও-ঘর করতে-করতে, এই সব একে ভাঙা

জিনিস ক্রমে আরো-ভাঙা, আরো-ময়লা আরো-পুরনো হচ্ছে দিনে-দিনে। সন্ধ্যে বেলাতেই রাস্তার আলো জ্বেলেছে, কিন্তু এমন ধোঁয়া আর ধুলো যে আলো মিটমিট করছে। জলে-কাদায়-পিছল রাস্তায় একটা-একটা জায়গা দোকানের আলো পড়ে চিকচিক করছে--আর সব অন্ধকার। আলো-আঁধারের মধ্যে দিয়ে লোক-গুলো হুনহন করে চলেছে কোথায় যে তার ঠিকানা নেই। এই গলির মধ্যে একটা কাফিখানায় মাল্লা মাচারু আর সুঁদরী কাঠের ব্যাপারী মোটাপেট চামারু, দুজনে সবুজ আর লাল কাঁচের দুটো বোতল নিয়ে বসেছে। মাচারু একগাল হেসে বললে—'তাহলে নৌকোতে যত কাঠ বোঝাই আছে এই দামেই তো নেবে!' চামারু ঘাড় নেড়ে বললে—'বহুত আচ্ছা, তাই হবে।'

দোষ নেই এমন মানুষ কোথায়! মাচারু লোক ভালো, কেবল আরক এক-আধ বোতল ঢক-ঢক করে যে না খেত এমন নয়; কিন্তু তাই বলে মাতাল হতে কেউ তাকে দেখে নি। আর মাতাল হবার জো কি?—তার বৌ জুমনী বড়ো কড়া গিন্নি! মাচারুর পা যাতে না টলে সেদিকে যেমন, ব্যাপারীগুলো তাকে ঠকিয়ে না নেয় সেদিকেও তার তেমনি নজর ছিল; তবে রোদে জলে সারাদিন খেটে যদি মাচারু কোনোদিন একটু-আধটু আরক খেয়ে তেষ্টা ভাঙতে চাইত তাতে মানা ছিল না।

আরকের গুণে মাচারুর চোখ ক্রমেই লাল ঘোরালো হয়ে এল; সেই সঙ্গে মালগুলো দাঁও-মাফিক বেচে মনটাও তার ক্রমে দরাজ হতে থাকল; আর পাওনার হিসেবগুলো মাথার মধ্যেটা তার বেশী করে ঘুলিয়ে দিতে চলল। চামারু দাঁড়িয়ে উঠে বললে—'তবে কাল ভোরেই কাঠগুলো ফিরিস্তি করে গোলাতে তোলাই ঠিক?'

মাচারু জড়িয়ে বললে—'খুব ঠিক; কোনো ভাবনা নেই।'

'রাম রাম ভাই!' বলে দুই বন্ধু রাস্তায় বেরিয়ে যে যার ঘরে চলল।

মীরবহর ঘাটে বাঁধা নৌকোটা হচ্ছে মাচারুর ঘর-বাড়ি, কাঠের

pathagar.net

গোলা, অফিস, অফিস-গাড়ি সমস্তই ; নৌকোখানা ভারি পুরোনো হয়ে প্রায় অচল হয়েছে এই যা দুঃখ। এবার যে দাঁওটা মারা গেল। এমনি আর দু-এক ক্ষেপ কাঠের চালান বেচতে পারলেই পুরোনো নৌকোর জায়গায় একটা নতুন নৌকো হতে পারবে, এই ভাবতে ভাবতে মাচারু গঙ্গার দিকে চলেছে—বুক ফুলিয়ে, কোমর দুলিয়ে। যেতে-যেতে মাচারু দেখলে, একটা বাড়ির দরজায় গোটা কতক লোক জড়ো হয়েছে, হাত পা নাড়ছে, কথা-বলি-বলি করছে, পুলিসের এক বাবু কাগজ পেন্সিলে কী কী লিখে নিচ্ছে। স্রোত যেখানে বাধে, সেখানে যেমন যত কুটো-কাটা এসে জমা হয়, তেমনি গলির এইখানটাতে লোক ক্রমেই জমা হচ্ছিল। একটা কুকুর চাপা পড়ল বা গাড়ির চাকা ভেঙে পড়ে সরকারি রাস্তা লোকসান করলে, কি একটা মাতাল খানায় পড়ে বা পাঁকে ডুবে মলো—এই ভাবতে ভাবতে মাচারু রাস্তার ওধারটায় গিয়ে দেখে, একটা অন্ধকার বাড়ির দরজায় একটা ঝাঁকড়া-মাথা এতটুকু ছেলে ধুলো কাদা আর মুখে-হাতে খানিক চিটে গুড় মেখে বসে দুই চক্ষের জলে ভেসে যাচ্ছে ; আর পুলিশের বাবু গম্ভীর হয়ে তাকে এক-একটা সওয়াল কচ্ছেন আর জবাবটা কাগজে টুকছেন।—'নাম কী?' 'নোটো।' 'নটবর না নটবেহারি? ছেলেটা কোনো উত্তর দিলে না ;—'এ মায়ি!' বলে কেঁদেই অস্থির। একটা মজুরনী দুটো ছেলের হাত ধরে টানতে-টানতে এসে বললে—'বস্নুন বাবু, আমি একবার পুছ করে দেখি।' তারপর ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আঁচলে তার নাক-মুখ মুছিয়ে দু গালে চুমু দিয়ে শুধোলে—'তেরা মায়িকা নাম বোলো বেটা!' ছেলেটা শুধু ঘাড় নাড়লে। এই সময় বাড়িওয়ালি-বুড়ীকে দরজায় দেখে পুলিসবাবু তাকে শুধোলেন, সে কিছু জানে কী না। বাড়িওয়ালি জবাব দিলে—'কে জানে বাবা? কত ভাড়াটে আসে যায়, নাম মনে নেই। তবে এই একতালার ঘরখানায় এক মাস ছিল ওরি বাপ মা। একটি পয়সা ভাড়া দেয় নি। কাজ তো কী করত জানিনে, তবে রোজ সন্ধ্যেবেলা দুটোতে

গালাগালি চুলোচুলি করত আর ছেলেগুলোকে ধরে-ধরে পেটাত, তার মধ্যে বড়ো দুটো ছেলে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করত, ওর মধ্যে এই ছেলেটা ছিল ভালো, তাই এটাকে তারা ফেলে গেছে।'

পুলিসবাবু বললে—'ছেলেটাকে তুমি রাখো,—যদি তারা খুঁজতে আসে।'

'পোড়াকপাল! তারা আবার ওর খোঁজ নেবে? একটা পেট কমে গেল না তারা বাঁচল! আর দুটো ছেলেকেও হয়তো কোন্ দিন মেরে নর্দমায় ফেলে দেবে। এখন তো রোজই গলিতে গলিতে হচ্ছে!'

এই ছেলের বাপ-মাকে কেউ যাবার সময় দেখেছে কিনা, পুলিস-বাবু শুধোলে। সামনের বাড়ির মেথরানী বলে উঠল—'হাঁগো বাবু-সাহেব, মরদটা একটি টিনের পেটারি আর তার বৌ একটা ঝুড়িতে কী-সব নিয়ে আগে গেল। সঙ্গে বড়ো ছেলে দুটো একটা বেরাল-ছানার গলায় দড়ি দিয়ে টানতে টানতে চলল হাম দেখা। আরো বহুত আদমি দেখিস্, লেকেন কোই কুছ্ না বোলিস্! ও তো তামাম দিনভর্ ওখেনে বোসে রয়েছে বাবু! ভুখ যেমন লাগল ওই রাস্তার ওধারে দোকানী একটা বাতাসা দিল, আবার এখন ভুখ্ লেগেছে তাই চিল্লাচ্ছে।'

নোটো যে শুধু ক্ষিধের জ্বালাতেই কাঁদছিল তা নয়; ভয়েতে বেচারা সারা হচ্ছে—রাস্তার খেঁকি কুকুরটা তার গা শুঁকে বেড়াচ্ছিল এতক্ষণ। রাত্তির আসছে, সে-ভয়ও একটা রয়েছে; তার উপর সব অচেনা লোকের মুখ। বুকের মধ্যে নোটোর প্রাণ-পাখিটি এই সব দেখে-শুনে ভয়ে যেন ধড়ফড় করছে, উড়ে পালাতে চাচ্ছে!

বাজে লোকের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে দেখে পুলিসের বাবু ছেলেটাকে নিয়ে বললেন—'কেউ যদি এ ছেলেটাকে চাও তো বল বাবু এইবেলা, না হলে আমি একে থানায় নিয়ে চললুম।' সেই সময় মাচারু হাসতে হাসতে এসে বললে—'থানায় যাবে কেন? গরীব বলে কি ওর কেউ নেই নাকি? আমি নেব, দ্যান ছেলেটা আমায়!'

pathagar.net

ছেলেটা থানায় যায় এটা কারুর ইচ্ছা নয়—যদিও কেউ তাকে নিয়ে মানুষ করতে একেবারেই নারাজ ছিল। সবাই 'সাবাস, আচ্ছা কিয়া!' বলে উঠল। মাচারু-বুড়ো একেই আরক খেয়ে দিল-দরিয়া, তার উপর লোকে তাকে বাহবা দিতে থাকল, সে বুক ফুলিয়ে বললে—'এতগুলো ছেলে-মেয়ে আমার, বৌ এই একটা ছেলে মানুষ করতে পারবে না!' এই বলে মাচারু পুলিস-বাবুর সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে দারোগার কাছে চলল—জোড়াবাগান থানায়! সঙ্গে তার কতক লোক ভিড় করে মজা দেখতে এল।

দারোগা দস্তুরমতো মাচারুকে তার নাম-ধাম শুধোতে লাগলেন। মাচারু বললে—'নাম মাচারু, মশায়! আমার বিয়ে হয়েছে; সে খুব চালাক মেয়েমানুষ, আমিই বরং তার কাছে বোকা বনে যাই! আর হুজুর যদি তাকে দেখতেন তবে বুঝতেন সে পাকা মেয়েমানুষ বটে!' একেই আরক খেয়েছে, তার উপর দাঁওমাফিক সওদা শেষ করে আর এই ছেলেটাকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়ে মাচারু একেবারে বে-পরোয়া! যা-তা বকে যেতে লাগল দারোগার সামনে। দারোগা শুধোলেন—'তোমার পেশা?' 'হুজুর আমি লৌকোর মালিক, মাল্লা, কর্তা। এক দাঁড়ি কিস্তি কাঠ চালান দিই। লৌকোর নাম—কোট্‌রা। এখান থেকে আসামের জঙ্গল পর্যন্ত দুপারের লোক কোট্‌রা আর মাচারু মাঝিকে চেনে!' মাচারুর রকম দেখে লোকগুলো যতই হাসতে লাগল সে ততই বকে যেতে লাগল।

'হুজুর যদি একবার আসামে চলেন তো দেখবেন কেবল শাল আর সুঁদরীর বন; কেবল চকোর কাঠ,—এক একটা মোটা এই হুজুরের দেড়া হবে। গাছ আমি এমন চিনি যে দেখেছি কি বলে দিয়েছি গাছের বয়েস কত। এই এমনি করে দড়িগাছটা চারদিকে একপাক-দুপাক-তিনপাক জড়িয়ে গাছটার বেড় মেপে নিয়ে হিসেব করতে বসি।' বলেই মাচারু গাছ-মাপার দড়িটা একটা পাহারোলার

কোমরে ধাঁ করে তিন পাক কসে জড়িয়ে ফেললে। পাহারোলাটা বলে উঠল—'দেৎতোর! ক্যা করতা? ছোড়ো! মাচারু গম্ভীর হয়ে বললে—'রোসোনা বাপু, দারোগা-মশায়কে দেখাই গাছটা কেমন করে মাপা হয়। জানেন হুজুর, তিনপাক দিয়ে যে ক-হাত হল তাকে আর ক-হাত দিয়ে—কী জানি আমার বৌ সে কাটাকালি হিসেব করে গাছটা ঠিক কত বছরের বলে দিতে পারে। জুমনীটা ভারি হিসেবি মেয়েমানুষ, হুজুরের দপ্তরে মহুরী হবার লায়েক!'

মাচারুর রকম দেখে দারোগা-সুদ্ধ হেসে অস্থির! তিনি বললেন—'ছেলেটা নিয়ে তুই করবি কী?'

মাচারু বললে—'ওকে কি আর চাকরি করাব? আমাদের বংশে কেউ চাকরি করে নি। ওকে মাল্লাগিরি শেখাব, ব্যাপার করবে।' 'তোর নিজের ছেলে-পুলে নেই বুঝি? 'ছেলে আবার নেই হুজুর! মা ষষ্ঠীর আশীর্বাদে বড়ো মেয়েটি চলতে শিখেছে, তার পরের ছেলেটা এখনো দুধ ছাড়েনি, আর আর-একটি আসছে। আর এটিকে নিয়ে হল, এক, দুই, তিন, চার। একরকম ঠাসাঠাসি করে নৌকোর খোলের মধ্যে কুলিয়ে যাবে। খরচের একটু টানা-টানি হবে, একটু চড়া দরে এবার থেকে কাঠ বেচব, আর না-হয় বুঝে-সুঝে কম-সম করে খাওয়া-দাওয়া করব তা হলেই সব দিক কুলিয়ে যাবে।'

মাচারুর হিসেব শুনে সবাই হাসতে লাগল। দারোগা তার সামনে একটা খাতা দিয়ে বললেন,—'সই কর্।' মাচারু লেখাপড়া কোনো দিন শেখে নি, কাজেই খাতার পাতায় মস্ত একটা ঢেরা টেনে তার পাশে বুড়ো-আঙুলের ছাপ দিয়ে দিলে। দারোগা নোটোকে মাচারুর কাছে দিয়ে বললেন—'এ ছেলের দায়ী তুমি রইলে, যদি এর মা-বাপ খোঁজ করে তোমাকে হাজির করে দিতে হবে। তোমার বৌ খুব চালাক বললে না? তারি কথা-মাফিক চোলো। আর দেখ, বেশি আরক আর খেও না। যাও!'

pathagar.net

লোকগুলো যে-যার চলে গেছে, অন্ধকারে থানা থেকে নোটোর হাত ধরে বেরিয়ে এসে মাচারু একবার ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে চাইলে; কেউ কোথাও নেই, কেবল ছেলেটা তার পাশে। মাচারুর বুক দমে গেল। ছেলেটাকে নিয়ে সে করবে কী? নিজেরাই খেতে পায় না তার উপর একটা পরের ছেলে ইচ্ছে করে ঘাড়ে নেওয়া যে কতটা মুখ্খুমি এবার মাচারু বুঝলে। হাজার লোক রাস্তা দিয়ে যায়-আসে, কেবা কার খোঁজ রাখে? পরের ছেলেটার জন্যে তারই বা এত মাথা-ব্যথা কেন? সোজা গিয়ে নৌকোয় উঠলেই হতো! এ ছেলেটাকে নিয়ে নৌকোতে গেলে জুমনী তাকে কী-রকম খাতিরটা যে করবে, সেটা ভাবতেই মাচারুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল! ঘরে যেতেও মাচারুর মন সরছে না, এইরাতে থানায় গিয়ে যে আবার সে দারোগাকে বিরক্ত করবে সে সাহসও নেই। মাচারু নোটোকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে বিড়বিড় করে আপনার মনেই বকতে-বকতে আর জুমনীকে গিয়ে কী বলবে সেটাও আঁচতে-আঁচতে চলল। নোটো কাদায় হাঁটতে থেকে-থেকে পড়ে যাচ্ছে; তখন মাচারু মুস্কিলে পড়ে তাকে কোলে নিয়ে নিজের চাদর দিয়ে জড়িয়ে হনহন করে ঘাটের দিকে চলল। নোটো যখন ছোটো হাতদুটি দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে, তখন মাচারুর মনটা যেন কতক হাল্কা হয়ে গেল।

সে ভাবলে, না হয় জুমনী যদি বলে তো কাল ছেলেটাকে থানায় ফিরিয়ে দেব, আজ রাতটা তো ছেলেটা কিছু খেয়ে আর ঘুমিয়ে বাঁচবে! ভাবতে-ভাবতে হাবড়ার পুলের ধারটিতে যেখানে জলের উপরে তার পুরোনো কোট্রাখানি ভাসছে, মাচারু সেখানে এসে উপস্থিত হল। নতুন-কাটা সুঁদরী আর শাল কাঠের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে! সারি-সারি নৌকো জলের ধারটিতে কালো ছায়া ফেলে আস্তে-আস্তে হেলছে দুলছে। বাঁধা নৌকোর লণ্ঠনগুলো ঢেউয়ের তালে-তালে দোল খাচ্ছে আর শিকলিগুলো এটায় ওটায় লেগে এক-একবার কড়কড় শব্দ করছে। দুখানা গাধাবোটের উপর দিয়ে

pathagar.net

পাতা সরু তক্তায় ভয়ে-ভয়ে পা ফেলে নোটোকে কোলে নিয়ে মাচারু আস্তে-আস্তে চলল। অন্ধকার হয়েছে; কেবল কোট্‌রার ছোটো আলোটা বন্ধ-ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে জলের বুকে সরু একটু সোনালি আভা ফেলেছে। জুমনীর গলা শোনা গেল, উনুনের ধার থেকে মেয়েকে ধমকাচ্ছে—'চেচ্চাস কেনরে লছমিয়া?' আর এখন ফেরার উপায় কি! মাচারু আস্তে-আস্তে নৌকোর পর্দাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল। জুমনী উল্টোদিকে মুখ করে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে পেঁয়াজের তেল-ফুলুরী ভাজছিল; সে মুখ না ফিরিয়ে শুধোলে—'এত রাত যে?' ফুলুরীর গন্ধ আর উনুনের ধোঁয়া এসে মাচারুর মুখে লাগল, সে আস্তে-আস্তে নোটোকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে। আগুনের তাত আর ফুলুরীর গন্ধ পেয়ে নোটো বলে উঠল—'বেশ গরম!' জুমনী ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে নোটোকে দেখিয়ে মাচারুকে শুধোলে —'এ কে?'

মাচারু খানিক ঢোঁক গিলে বললে—'তোমার জন্যে একটা নতুন সামিগ্রি এনেছি।' বলেই মাচারু একমুখ কাষ্ঠহাসি হাসলে; কিন্তু তার মন বলতে লাগল নৌকোতে পা না দিলেই ভালো ছিল। ওদিকে জুমনী হাতা-হাতে কটমট করে চেয়ে আছে। তখন বেচারা মাচারু আস্তে-আস্তে ভয়ে-ভয়ে সব কথা বলে বললে—'আহা ওর কেউ নেই, রাস্তায় বসে কাঁদছিল, কেউ নিতে চায় না, শেষে আমিই নিলুম, দারোগাও বললেন নিয়ে যাও। কেমনরে বল্ না, দারোগা বললে না তোকে নিয়ে আসতে?' এইবার জুমনী একেবারে ঝড় বইয়ে দিলে— 'তুমি মাতাল না পাগল! এমন কাণ্ড তো কখনো দেখিনি! আমরা আধপেটা খেয়ে মরি এই বুঝি তোমার ইচ্ছে! তোমার সিন্দুকভরা টাকা আছে না মস্ত কোটাবাড়ি আছে যে রাস্তা থেকে ছেলে এনে পুষবে!'

মাচারুর আর কথা নেই, কেবল ময়লা কাপড়টা দিয়ে মুখ মুচছে। নৌকোখানা তো ফুটে ঝরঝরে! সেটা সারাবার নাম নেই, স্ত্রী পুত্তুর খাবে কী সে খবর নেই, বাবুয়ানা করে ছেলে

pathagar.net

পুষতে চাচ্ছেন ! তাও আবার পরের ছেলে, কোথাকার কে তার ঠিক-ঠিকানাই নেই !

পরের ছেলে আর তার যে কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই মাচারু তা বেশ জানত। সে চোরের মতো চুপটি করে সব শুনতে লাগল। জুমনী বললে—'এখনি ছেলেটাকে থানায় দিয়ো এসো। দারোগা কিছু শোধালে বলবে জুমনী পরের ছেলে মানুষ করতে পারবে না,—বুঝলে ?' জুমনীকে হাতা-হাতে এগিয়ে আসতে দেখে মাচারু বললে—'যা বললে তাই হবে ; আমারি ভুল, মরতে ছেলেটাকে এনেছি। এখনি কি থানায় দিয়ে আসব ?' মাচারু নরম হল দেখে জুমনীর রাগ পড়ল ; হয়তো বা নোটোর শুকনো মুখটি দেখে তার মায়ের প্রাণে একটু ভয় জাগাল—কোন্ দিন হয় তো তার ছেলে-মেয়ে অমনি করে রাস্তায় রাস্তায় অনাথ হয়ে পেটের দায়ে ভিক্ষে করবে সে-সময়ে যদি কেউ তাদের না দুমুঠো খেতে দেয় ? জুমনী ঘুরে বসে কড়ায় ফুলুরী ভাজতে-ভাজতে বললে—'এই রাতে আর ছেলেটাকে কোথায় ফেলবে, আজ থাক, কিন্তু কাল সকালে…' বলেই জুমনী উনুনে এক খোঁচা দিয়ে কয়লাগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে বললে—'…নিশ্চয় ওকে বিদেয় করব, বুঝলে ?'

মাচারু চুপ করে রইল। জুমনীও একটা কাঁসিতে ফুলুরীগুলো ঝেড়ে ফেলে কোমর-বেঁধে হাঁড়ি থেকে ডাল ভাত গোছাতে বসল। ধমকধামক শুনে লছমিয়া চুপ হয়ে গিয়েছিল ; জুমনীর ছোটো ছেলেটাও একধারে কাঁথায় মুখ লুকিয়ে চুপচাপ পড়ে ছিল ; আর নোটো মাঝখানে পা ছড়িয়ে হাঁ করে বসে ভাবছিল—কী হচ্ছে এ সব ! জুমনী ভাত আর ডাল কাঁসিতে ঢেলে মাচারুকে ডাক দিলে—'খেয়ে নাও।' তারপর থাবা-থাবা ডালমাখা ভাত নোটোর নাকে-মুখে গুঁজে দিতে লাগল। নোটোর খাওয়া দেখে জুমনী অবাক হয়ে গেল। তার নিজের ছেলেমেয়েকে ফেলে সে কেবল নোটোকেই খাওয়াতে ব্যস্ত রইল। বেচারা কত দিন ডাল-ভাত খেতে পায় নি : খেয়ে পেটটি ধামা করলে। এমন করে চেঁচেপুঁছে

pathagar.net

তার নিজের ছেলে-মেয়েটা যদি খেতে পারত তবে আর ভাবনা ছিল না। মাচারু কিন্তু মনে-মনে নোটোর খাওয়া দেখে কেবলি ভয় পেতে লাগল—কাল জুমনী এটাকে বিদেয় করবে! সে আর কথাটি না, মুখ-গুঁজে খেয়ে চলল। খাওয়া হলে জুমনী নোটোকে টেনে নিয়ে বেশ করে হাত-পা ধুইয়ে দিলে। নোংরামি জুমনী আদপে দেখতে পারত না। সাফ-সোফ করে দিতে নোটো যেন ভদ্রলোকের ছেলেটি দেখাল। জুমনী একটু খুশি হয়ে বললে—'ছেলেটির বয়স কত গা?'

মাচারু এইবার একটু কথা বলবার সুবিধা পেয়ে হুঁকো-কল্‌কেটা তাড়াতাড়ি একধারে রেখে বললে—'রোসো, কত বয়েস এখনি বলে দিচ্ছি।' বলেই মাচারু গাছমাপা দড়িটা নিয়ে নোটোকে ঝাঁ করে জড়িয়ে ফেললে। জুমনী অবাক হয়ে শুধোলে—'ও কী হচ্ছে?'

মাচারু গম্ভীর হয়ে বললে—'মাপছি এটা কত বড়!'

জুমনী দড়িগাছটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বললে—'এ কি গাছ পেলে যে দড়ি দিয়ে মাপতে চলেছ? তোমার বুদ্ধিকে ধন্যি! যাও ওকে ঘুমোতে দাও, পাগলামি করো না বলছি।' মাচারুর অদৃষ্ট মন্দ; সে আস্তে-আস্তে নিজের মাদুরে চাদর-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

জুমনী নোটোকে লছমিয়ার বিছানায় শুইয়ে গোটা-কুড়ি ফুলুরী চিবোতে বসল। লছমিয়া হাত মুঠো করে ঘুমচ্ছে—কাঁথাটি জুড়ে; ঘুমের ঘোরে বোধ করলে কী যেন পাশে এল, সে একবার নোটোর চোখের উপর একটা হাত ফেললে, তার খানিক পরে বুকের উপর এক লাথি বসিয়ে অন্য পাশে ঘুরে শুল। জুমনী ফুলরীগুলো শেষ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। নদীর ঢেউ নৌকোখানিকে একটি দোলনার মতো দোল দিতে থাকল, নদী কুলকুল করে কী যেন ঘুম-পাড়ানো ছড়া বলতে লাগল, ঘুমে নোটোর চোখ ঢুলে পড়ল আর সেই অন্ধকারে জুমনী আস্তে-আস্তে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। নোটো সকালে ডাঙায় থেকেও যেন অগাধ জলে পড়েছিল; এখন জলের উপরে এসে সে যেন ডাঙা পেয়েছে মনে হচ্ছে।

এতটুকু বটে, কিন্তু ঘুম লছমিয়ার সব আগে ভাঙত। ইস্টিশানের পাঁচটার গাড়ি ছেড়েছে কি সে আজ চোখ মেলেছে দেখে মা কাছে নেই, তার জায়গায় আর একটা ঝাঁকড়া মাথা। লছমি দু হাতে চোখ রগড়ে খপ করে পাশের মাথাটার চুলগুলো মুটিয়ে ধরে এক টান দিলে। নোটো হঠাৎ জেগে উঠে বোধ করলে, কে তার ঘাড়ে শুড়শুড়ি দিচ্ছে, নাকটা খামচাচ্চে। স্বপ্ন দেখছে ভেবে নোটো চারিদিক চাইতে লাগল। এত বড়ো স্বপ্ন সে কোনো দিন দেখে নি—সেই এক সকাল থেকে আরম্ভ হয়ে আর-এক সকাল পর্যন্ত চলছে স্বপ্নটা! মাথার উপরে নৌকোর ছাদের উপর ধুপধাপ দুমদাম মাল নামানো আর মানুষদের চলে-বেড়ানোর শব্দ হচ্ছে। লছমিয়াও একটু অবাক হল। এ কোথায় এসেছি, ও কিসের গোল যেন শুধিয়ে সে একটি ছোটো আঙুল ছাদের দিকে তুলে নোটোর মুখে চাইলে।

ভোর না হতেই কাঠের ব্যাপারী চামারু মাল নিতে এসেছে। মাচারুও আজ এমন কোমর বেঁধে মাল নামানোর কাজে লেগেছে যে যেন তার কথাটি কবার সময় নেই—বিশেষত জুমনীর সঙ্গে। বেচারা মাচারু সকালে উঠেই নোটোকে নিয়ে দারোগার কাছে যেতে হবে ভেবে রাতের মধ্যে একটি বার চোখ মোদেনি। মাচারু ভেবেছিল সকালে উঠেই জুমনী খিচিমিচি বাধাবে কিন্তু কে জানে জুমনি কী ভেবেছিল, সে নোটের নামটি পর্যন্ত করলে না। রেহাই পাবে না মাচারু জানত তবু খানিকটা ফুরসুৎ পাওয়া গেল—সেই লাভ ভেবে সে দোমারে হাঁক-ডাক এটা-ওটা-সেটা করতে থাকল— জুমনীর কাছ থেকে যতটা পারে দূরে দূরে। জুমনী যেন নোটোর কথা বলবার ফাঁক না পায় তাই মাচরু কাজে আজ আর কামাই দিচ্ছে না। মাল-নামানো কাজ আজ হু-হু করে চলছে। নৌকোর

বোঝা ক্রমেই হালকা হচ্ছে। চামারু তিন ক্ষেপ মাল গাড়ি বোঝাই করেছে, জুমনী হালের কাছটায় ছেলে কোলে দাঁড়িয়ে গুণে চলেছে। ক'বোঝা কাঠ নামানো হল। আজ মাচারু কাজ দেখাতে ব্যস্ত; বেছে-বেছে বড়ো বড়ো শালের কচা একাই নিজের কাঁধে নিয়ে গাড়িতে তুলছে; কেবল খুব যখন ভারি বোধ হচ্ছে তখন তার একমাত্র দাঁড়ী তাকে ডেকে নিচ্ছে। কোট্‌রার একটি মাত্র দাঁড়ী তাও আবার তার একটি পা কাটা আর পায়ের জায়গায় একটা কাঠের গোঁজ। নোটোর মতো অতটুকু বেলায় একেও মাচারু একদিন কোথা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। এই দাঁড়ীর দেড়খানা আর মাল্‌লা মাচারুর ছুখানা এই সাড়ে তিনখানা পা ক্রমাগত নৌকো থেকে উঠছে নামছে—সরু তক্তা বেয়ে মোটা মোটা কাঠ বয়ে! এ অবস্থায় জুমনী কেমন করে নোটোর কথা পাড়ে? সে হালের কাছটায় রোদে বসে কোলের ছেলেটাকে দুধ দিতে লাগল। মাচারুর যেমন আরকের তেষ্টা তার এই ছোটো ছেলেটারও তেমনি দুধের তেষ্টা কেবলি! কিন্তু মাচারু আজ আরকের নামটি করছে না, কেবল কপালের ঘাম মুছছে আর একটা করে বিড়ি দু-এক টান টানছে আবার কাজে লাগছে। বেলা এগারো, চামারু একবার আরকের কথা পাড়লে মাচারু বিড়ি ধরিয়ে বললে—'হোগা ভাই, কাম তো হোনে দেও!'

মাচারুর আজ হল কী, জুমনী তাই ভাবতে লাগল। আরক খাওয়াতে চাইলে বলে—না! এ যেন সে মাচারুই নয়! ওদিকে লছমিরও সাড়া-শব্দ নেই, এত বেলা পর্যন্ত একটুও না-কেঁদে সে যে লক্ষ্মীটি হয়ে বসে আছে ঘরের মধ্যে, এরি বা মানে কী? জুমনী উঠে ঘরের মধ্যে গেল, আর জুমনীকে ঘরে যেতে দেখেই মাচারু ভাবলে—হয়েছে এইবার! মাচারু নৌকোর খোলটার উপর দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে আর ভাবছে নোটোকে নিয়ে এইবার জুমনী এল বলে, থানায় শেষ যেতেই হল দেখছি! ঠিক সেই সময় জুমনী হাসতে হাসতে বেরিয়ে বললে—'মজা দেখবে।' মাচারু জুমনীর

pathagar.net

হাসি দেখে এমনি অবাক হয়ে গেল যে, সে ডাঙায় আছে কি জলে আছে বুঝতে পারলে না, কলের পুতুলের মতো জুমনীর সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলে লছমি একমুঠো মুড়ি কোথা থেকে সংগ্রহ করে বিছানার উপর ছড়িয়ে বসে নোটোর গালে এক-খাবল দিচ্ছে সে, তার গালে এক খাবল দিচ্ছে নোটো। হাঁড়িকুড়ি কিছু ভাঙা নেই, মারামারি নেই, কান্না-কাটি নেই। জুমনী হেসে মাচারুকে বললে—'দেখেছ, ছুটিতে কেমন জমিয়ে বসেছে। থাক্ অমনি বসে, চল আমরা কাজে যাই।'

মাচারুকে আর দুবার বলতে হল না, সে ভারি খুশি হয়েই এবারে কাজে লাগল—বোধ হয় আর থানায় যেতে হল না। আগে-আগে মাল-নামাবার সময় দুপুরবেলা মাচারু কাজে ছুটি দিয়ে কাফি-খানা টেরিটিবাজারে মুর্গিহাটায় ঘুরে-ঘুরে কাটাত; কাজেই দুদিনের কাজ হতো দশ দিনে, আর জুমনীকে কেবল বকাবকি খোঁচাখুঁচি করতে হতো—যাতে মাল চটপট খালাস হয় সেজন্যে। কিন্তু এবারে আরক নেই কাজও জলের মতো চলেছে। ওদিকে নোটোও বোধ হয় বুঝেছিল তাকে নৌকোটা দখল করতে হবে; সে লছমিকে এমনি বশ করে নিয়েছে যে সেদিন সারাবেলাটা লছমি না কেঁদে, কাপড় না ছিঁড়ে, জলে পড়ো-পড়ো না হয়ে, কেবল নোটোর ঝাঁকড়া চুল মুঠো-মুঠো ছিঁড়ে বেড়াল-ছানার মতো টিপে-টুপে চটকে উল্টে পাল্টে ছেলেটাকে নিয়ে খেলে কাটিয়ে দিলে। জুমনী দূর থেকে এই রঙ্গ দেখে ভাবলে ছেলেটা আর কিছু না হোক ছেলে মানুষ করতে, ছেলে ভোলাতে কাজে লাগতে পারবে। যতদিন মাল-নামানো চলে ততদিন ওটাকে রাখলে সুবিধে; দেশে যাবার দিন ওকে থানায় দিলে চলবে। এইভাবে নোটো রয়ে গেল—আরো কটা দিনের জন্যে—জুমনীর হাতে থাবা-থাবা ভাত ডাল খেয়ে, লছমিকে নিয়ে খেলা ক'রে। এখন আর নোটোকে দেখে কে বলবে পরের ছেলে, যেন লছমির আদরের ভাইটি নোটো!

মাল সমস্ত নামাতে তিন দিন গেল। তিন দিনের হাড়-ভাঙা

pathagar.net

খাটুনির পর বেলা তিনটেয় শেষ কাঠের বোঝা চালান দিয়ে মাচারু কপালের ঘাম মুছে গুণছুঁচ নিয়ে নৌকোর পালটায় মস্ত-একটা তালি দিতে বসে গেল। ভোরের আগে জোয়ার নেই, এরই মধ্যে যতটা পারে কাজের ছুতোয় কাটিয়ে দেবার চেষ্টা, পাছে জুমনী ফাঁক পেয়ে থানায় যাবার কথাটা পেড়ে বসে। এই নৌকোখানার মধ্যে দারোগার ভয় মাচারু লছমি আর ওই নোটোর যেমন হয়েছে, জুজুর ভয়ও ততটা কেউ করে না। জুমনী একবার দারোগার কথা বললে হল, লছমি অমনি চুপ, মাচারু অমনি কাজে লেগেছে আর নোটো বেচারা তো ভয়েই মরে যায়! বোঝে না দারোগা কী, কিন্তু সে বোঝে দারোগার কাছে গেলেই সে লছমিকে হারাবে; তারপর ভাতও নেই, ডালও নেই, আদর নেই, খেলা নেই, বুড়ো মাচারু নেই, জুমনী মা নেই, দাঁড়ী মাঝি নেই, আছে কেবল কান্না, পেটের জ্বালা, ধুলোয় পড়ে ছটফট করা! যখন নৌকো ছাড়বার সময় এগিয়ে এল তখন কে জানে কেমন করে নোটো সেটা বুঝলে আর জুমনীকে সে ছাড়তে চায় না, কেবলি তার আঁচল ধরে ঘুরছে! মাচারু যতক্ষণ পারে পালে তাল দিয়ে নৌকোর ফাটলে পেরেক মেরে কাটিয়ে দিয়ে যখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে তখন উঠে বললে—'থানায় যেতে হয় তো বলো ছেলেটাকে দিয়ে আসি!' জুমনী গম্ভীর হয়ে বসে রইল,—কী ছুতোয় নোটোকে রাখা যায় তাই ভাবছে। ওদিকে লছমি অমনি কান্না ধরলে—এমন কান্না যে ভয় হল বুঝি-বা দম বন্ধ হয়ে মরে! জুমনী তখন বললে—'দেখছ তো যেমন বোকামি তার ফল এখন ভোগো! মেয়েটা ওর ন্যাওটা হয়েছে—এখন আর ছাড়বে কেন? রইল নোটো এইখানেই, একে আমি মানুষ করে তুলব যেমন করে পারি; কিন্তু বলে রাখছি, যেদিন লছমিয়া কান্না ধরেছে আর তুমি এককোঁটা আরক খেয়েছ কি নোটোকে দারোগার কাছে পাঠিয়েছি!'

মাচারু বললে—'এই কথা তো? বস্। আজ থেকে দিব্যি করছি—যে রাস্তায় আরকের দোকান সে রাস্তায় মাচারু চলবে না।'

pathagar.net

বলেই মাচারু নৌকো খুলতে আরম্ভ করলে—'হেঁইও টানে হেঁইও।'
লছমি চোখ মুছে উঠে বসল ; খোঁড়া দাঁড়ী বাঁশের লগিটা দিয়ে সারি-সারি নৌকোর গায়ে ঠেলা দিতে-দিতে পায়ে পায়ে নৌকোর কিনারায় হাঁটতে আরম্ভ করলে। কিনারার ভিড় কাটিয়ে কাদা-জল ছাড়িয়ে কোট্‌রা জোয়ারের টানে ভেসে পড়ল।

ভরা জোয়ার

ছুপ্‌ ছুপ্‌ করে জল কেটে ভরা পালে কোট্‌রা চলেছে—নোটোকে নিয়ে শহর ছাড়িয়ে, পাড়াগাঁয়ের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের দিকে। দুধারে খড়ের চালা, সবুজ মাঠ, তরকারির ক্ষেত, নিঝুম বন, নীল আকাশ জলে ছায়া ফেলেছে, ঘাটে ঘাটে মেয়েরা নাইতে নেমেছে, খালে বিলে জেলে ডিঙ্গি জাল ফেলে চুপটি করে আছে। মাচারু হাল ধরে বসে রয়েছে—ঘাটে-ঘাটে শুঁড়িখানার দিকে চেয়েও দেখছে না। নৌকোটা এতবার এই সব ঘাটে-ঘাটে শুঁড়িখানার কাছে ভিড়েছে যে আজও যেন সেই দিকেই এক-একবার সে নাকটা ফেরাচ্ছে, আর অমনি মাচারু তার উল্টোদিকে হালে মোচড় দিচ্ছে। খোঁড়া দাঁড়ী লোহার আঁকসী পরানো লগিটা ক্রমাগত ঠেলে চলেছে—রোদে তার পিঠ চকচক করছে—আর নৌকোর তক্তায় সারাদিন তার কাঠের পা খটখট শব্দ করছে। বেচারা খোঁড়া, তার মুখে কথাটি নেই। ছেলেবেলা থেকেই সে দুঃখী। ছোটোবেলায় জমিদারের দুষ্টছেলে একটা পাথর ছুঁড়ে তার একটি চোখ কানা করে দিয়েছে ; কুলি হয়ে কলে খাটতে গেল, সেখানে একটা করাতকলে তার পা'টা উড়ে গেল একদিন ; তারপর জাহাজের খালাসী হল, কিন্তু একদিন বয়লারের গরম জল ছিটকে সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এল যখন তখন খেতে পায় না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। সেই সময় মাচারু তাকে দেখলে ; যেমন দেখা কোট্‌রায় এনে হাজির করা ;—নোটোর চেয়ে একটু বড়ো। সেদিনও জুমনীর সঙ্গে ঝগড়া বেঁধেছিল আর নোটো যেমন,

তেমনি এই খোঁড়া দাঁড়ী নৌকোতে রয়ে গেল—পোষা কোকিল আর কালো বেড়াল-ছানার সঙ্গে !

পাকা মাঝি মাচারু আর খোঁড়া দাঁড়ী এমনি কায়দায় নৌকো চালিয়ে চলল যে, পঁচিশ দিনে কোট্‌রা বানচাট্‌কি, তেলিখাল, ইল্‌সে ঘাট, কাজীর হাট, সুবর্ণখালি, সাধুগঞ্জ হয়ে সিংরি হাট, গাজিখাল, দৌলতপুর, নন্দি-বাজার, সন্ন্যাসী-হাট ঘুরে বেত গাঁ, কাকচিরা, ডাকেটিয়া, আমড়াজুড়ি, চিলমারি, হাড়গিল-বর, সোলাডাঙা, বেঙধুই, মোরেলগঞ্জ পেরিয়ে পোড়াবাড়ি, শিরিশদিয়া, লাঙল বাঁধের ধার দিয়ে আশাশূন্যির ঘাটে ভিড়ল। শীতের ক-মাস জল শুকিয়ে নদীর বুকে চড়া পড়েছে ;—গোরুগুলো হেঁটে এপার ওপার করছে। একমাস বোঝায় নৌকো চলাচল বন্ধ। এখন বন কাটবার সময় ; কাঠ শস্তা ; এই সময়টা একটু আরামের আর ছুটির দিন। কোট্‌রার মাস্তুল নামিয়ে বাঁশ দড়ি-দাড়া একদিকে সরিয়ে নৌকোখানিকে দেখতে হয়েছে যেন একখানি চালাঘর ডাঙা ছেড়ে কালো আর খয়েরী হাঁসের মতো নদীর জলে খেলা করতে নেমেছে। নোটো এই তার নতুন বাসার ঝাঁপ খুলে সারাদিন বসে আছে—জলের দিকে একখানি হাত, আর ওপারের বনের দিকে —সূয্যি-ওঠার দিকে, সন্ধ্যে আসার দিকে মুখটি বাড়িয়ে চুপটি ক'রে। সে যেন হঠাৎ খাঁচা-থেকে ছাড়া-পাখি ; ডানার খেলা, সুরের খেলা সবই ভুলে কেবল আকাশের দিকে চেয়ে মনে করবার চেষ্টা করেছে উড়তে হয় কেমন করে, গাইতে হয় কী সুরে। জুমনী নোটোকে চুপচাপ থাকতে দেখে স্থির করে নিয়েছে, সে বোবা কালা। কিন্তু শহুরে ছেলে নোটো যেমনি নিশ্চয় করে জানলে আর তাকে থানায় যেতে হবে না, শহরেও থাকতে হবে না, আর জুমনী-মায়ি মাঝে মাঝে ভয় দেখালেও দারোগা সত্যিই আসছে না, তখন তার বড়ো-বড়ো চোখে সুন্দর মুখে ভয় যেটুকু ছিল মুছে গেল ; সে আর চুপ করে তরাস-পাওয়া কাঠবেড়ালীর মতো একটি কোণে পড়ে রইল না ; দিনে দিনে তার কথাও ফুটল, হাসিও দেখা

pathagar.net

দিল মুখে। লছমির সঙ্গে নোটোর খেলা, ঝগড়া, আবার ভাব আবার আড়ি এমনি সারাদিন চলছে বাঁশের ছৈ মোড়া কোট্‌রায়। নোটো যেন অন্ধকার কোণের ফুলের চারা, হঠাৎ কে তাকে আলোয় রেখেছে—আর দেখতে-দেখতে সে ফুলে পাতায় ভরে উঠেছে।

আশাশূন্যিতে পৌঁছবার পরেই জুমনীর আর একটি মেয়ে হল। কোলের ছেলেটা তখন হামাগুড়ি দিচ্ছে। তিনটি ছিল, হল চারটি, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের টানাটানিও বাড়ল, কাজও বাড়ল; ছেলেদের শোয়াবার যে বাক্সের মত খোপটা, তাতেও জায়গা আর কুলিয়ে ওঠে না। এর উপর আবার সেই খোঁড়া দাঁড়া ছোকরা! যদি কারু অন্ন ওঠে তো তারই! বেচারার কাঠের পা হলেও ভয়ে কেবলি আজকাল কাঁপছে ঠকঠক করে! মাচারুর কোনোদিকে খেয়াল নেই। কিন্তু আর সবাই তো চুপ করে থাকে না, তারা বলছে নিজেরই ভাত জোটে না আবার দুটো ছেলে পুষেছ কী করতে? আশাশূন্যির পোস্টমাস্টার—তিনি একধারে গাঁয়ের গুরুমশায়, উকিল, ডাক্তার, আচায্যি-ঠাকুর, সবই। যার যা মনের কথা সব তাঁর কাছে। সকালে একঘণ্টা কাঠুরে আর মাঝি মাল্লার ছেলেদের তিনি পড়ান। তারপর তাঁকে হাত দেখে জিভ দেখে—কারু জ্বর হয়েছে, কারু পিলে বেড়েছে, কারু পা দায়ে কেটেছে এমনি নানা রোগের ডাক্তারি করে বেড়াতে হয়; তারপর দাওয়ায় বসে কী দায়ে ঠেকেছে, কাঠের দর কোথায় চড়েছে কোথায় কমেছে, কার ছেলেকে কী চাকরি দিলে ভালো হয়, এমনি সব সংসারের বিষয়-কর্মের পরামর্শ দিতে হয়; তারপর ঘটকালি হাত-গোনা এমনি কাজ সারা দুপুরবেলা। সন্ধেবেলা অফিসের হিসেব রাখা নিজের লেখাপড়া। পাড়ার লোকের মুখে মাচারুর মুখ্যুমির কথা শুনে পোস্টমাস্টার প্রথমটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি মাচারুকে চিনতেন; কিন্তু মাচারুর বৌ চালাক বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল—সে কি এমনটা হতে দেবে! তিনি ঠিক খবরটা নিতে একদিন আস্তে-আস্তে বাঁধা কোট্‌রায় হাজির হলেন। জুমনী বসে

pathagar.net

মাচারুর একটা পুরোনো নীল ফতুয়া কেটে নোটোর জন্যে ছুটো কোর্তা সেলাই করছিল। মাস্টার-বাবুকে দেখে সে তাড়াতাড়ি একটা মোড়া এগিয়ে পায়ের কাছে টিপ করে একটা পেন্নাম করে বসল। মাস্টারমশায় কথায়-কথায় নোটোর কথা পেড়ে বললেন —'জুমনী যদি ইচ্ছে করে তো লাল-গঞ্জে পাদরী সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেই তারা নোটোকে এখনি ইস্কুলে ভর্তি করে নেবে। এরপর ভালো চাকরি হতেও পারে।' জুমনী সাফ জবাব দিলে— 'জানি তো বাবু আমরা গরীব, পরের ছেলে পালা কি আমাদের কাজ! মাচারু চিরকালই আমায় জ্বালাবে। মনটা ওর নরম, কারুর ছুঃখু দেখতে পারে না। ছুঃখু দেখলে ছুঃখু তো আমারও হয়, কিন্তু আমি হলে কি নোটোকে নিতে চাইতুম, না সঙ্গে করে এখানে আনতুম, আমার আর পাঁচটা পেটের ভাবনা ভাবতে হয় বাবু, ওর তো তা নেই, কেবল তুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। কী করি বাবু, ছেলেটা এসে পড়েছে ঘাড়ে, এখন তো ওকে ফেলতে পারি নে, আমাদের যদি ছুমুঠো জোটে তবে ওরও জুটবে; ওকে আমি কারু ভিক্ষে-পুত্তুর করে দিতে পাঠাব না বাবু।'

এই সময় নোটো জুমনীর আঠারো মাসের ছেলেটিকে কোলে নিয়ে তার মায়ের কাছে এল। ছেলেটার নতুন দাঁত উঠেছে, তাই সে এক-একবার নোটোর কানটা কুটকুট করে কামড়াচ্ছে; নোটোর গাল আর কান লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে হাসছে দেখে মাস্টারমশাই বললেন— 'জুমনী, তুই খুব ভাল কাজ করেছিস রে, দেখিস ভগবান তোর ভালো করবেন।' মাস্টারমশাই সব কথায় শোলোক আওড়াতে ভালোবাসেন —'যে করে পরের ভালো তার হয় পরে ভালো।' বলে তিনি খুশি হয়ে ঘরে গেলেন। জুমনী যদিও মাঝে-মাঝে এখনো দারোগার ভয় দেখাতে ছাড়ে না, কিন্তু সত্যিই নোটোর উপর তার মায়া পড়েছে; এই সুন্দর-মুখ কোঁকড়া চুল পরের ছেলে ঘরে এসে গেছে, আর পর নেই; এ যেন তারি আঁচলের একটুখানি সোনা।

pathagar.net

মাচারু বরং এখন এক-একদিনে বলে—'জুমনী, ছেলেটাকে বেশী আদর দিচ্ছিস্!' জুমনী তাতে জবাব দেয়—'আদরই করবে না তো এনেছিলে কেন?'

জুমনী নোটোকে আর লছমিকে মাস্টার-বাবুর কাছে লেখা-পড়া শিখতে দিলে। দুই ভাই-বোনের মতো দুটিকে ঘাটের সরু রাস্তাটি দিয়ে রোজ সকালে আঁচলে মুড়ি আর হাতে সেলেট বই দিয়ে পাঠশালে পাঠিয়ে দেয়। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে নোটোর চোখে কত জিনিস পড়ে! ভাই-বোনে কত খেলাই হয়! খানার ধারে, করঞ্জা গাছে কোথায় একটা পাখি বাসা বেঁধেছে, সাঁকোর ধারে কোথায় ব্যাংগুলো মস্ত একটা ছাতার কারখানা খুলে বসেছে, রাস্তার ধারে কোন্ পুকুরটায় একটা বোয়াল মাছ তুড়ি দিলেই কাছে আসে, কোন্ তেঁতুলগাছে বাদুড় সব নীচের দিকে ঝুলেছে, কোন্ বনের ধারে বেতগাছ আছে যার খুব ভালো ছিপ হয়, কোথায় কুমোরের চাকা ঘুরছে আর তা থেকে হাঁড়ি কুঁজো সব হঠাৎ বেরিয়ে আসছে, কোন্ ফাটা দেয়ালের উপর একটা বহুরূপী রোদ পোহায় আর মিনিটে দশরকম রং বদলায়, কাঁটাল-গাছের কোন্ কোটরে কাঠবেড়ালী দুটো ছানা দিয়েছে—সব নোটোর জানা আছে। তা-ছাড়া লেখা-পড়াতে নোটো সবাইকে হারিয়ে দিলে। খালি শীতকালটা ইস্কুল বসে, তারপর নৌকো-সব ব্যাপারে চলে যায়; ফিরে যখন আসে তখন মাস্টারমশায় দেখেন প্রায় সব ছেলে পড়া ভুলে গেছে, কেবল নোটো আর-এক পাতা এগিয়ে গেছে। পাঠশালা থেকে ফেরবার সময় দুটিতে বনের মধ্য দিয়ে ঘুরে আসত। যেখানে কাঠুরেরা বড়ো-বড়ো গাছ পাড়ছে, দেখেই গাছের আগ-ডালে দড়ি বাঁধতে নোটো সরসর ক'রে গাছে উঠে যেত আর নীচে দাঁড়িয়ে লছমি চেঁচাত—'সিয়ারে সিয়ারে!' এমনি করে নোটোকে একবার পাঠশালে পৌঁছে দিয়ে আবার দেশ-বিদেশে টেনে নিয়ে দু-বছর নৌকো এল আর গেল। বাঁশের ছৈ-ঢাকা কোট্‌রায় দু বছর থেকে নোটো আট-বছরে পা দিলে।

pathagar.net

মুকুন্দিলাল বলে লোকটা ডিগডিগে রোগা, যেন শুকনো কাঠ। গ্রাম ছাড়িয়ে বনের মধ্যে এক কাঠগোলা বানিয়ে বসেছে। কারুর সঙ্গে বড় একটা দেখা-শোনা করে না, একা-একাই থাকে। পশ্চিম থেকে লোকটা এসে, এখানে একা কেন যে বনের মধ্যে গোলা বানিয়ে বসে আছে তা গাঁয়ের লোক অনেক চেষ্টা করেও আন্দাজ করতে পারে নি। ছ' বছর ধরে লোকটা বৃষ্টি নেই বাদলা নেই ক্রমাগত কাজ করে চলেছে, একটি দিন ছুটি নেয় না। অথচ লোকটার যে পয়সা-কড়ি নেই তা নয়, ফলাও কারবার; রুরুলীতে গিয়ে মাঝে-মাঝে উকিল বাবুর সঙ্গে বিষয়-আশয়ের পরামর্শ করে, আর জমি-জমা প্রায়ই তো কিনছে। পোস্টমাস্টার-বাবুর কাছে সব খবর; কিন্তু মুকুন্দির পেট থেকে কেবল যে তার স্ত্রী নেই এই খবরটা ছাড়া আর-কিছু তিনি আদায় করতে পারেননি। মুকুন্দি লোক ভালো এটা কিন্তু সবাই বলে থাকে। যে বনের রাস্তা ধরে নোটো আর লছমি খেলা করতে-করতে কোট্‌রায় ফিরত, সেই রাস্তা থেকে দেখা যেত, মুকুন্দি কাঠগোলার একপাশে দাঁড়িয়ে কোনোদিন কাঠ চালাচ্ছে কখনো বা করাত দিয়ে তক্তা চিরছে। ছেলেদের দেখলেই সে কাছে ডাকত আর নোটোর মাথায় হাত বুলিয়ে বলত—'আমার ছেলেটা থাকলে ঠিক এত বড়টি হতো, তোকে ঠিক তার মতো দেখতে—' কী জানি কী ভেবে এইটুকু বলেই মুকুন্দি চুপ করত। ছেলে-মেয়েটা জানবার জন্যে পেড়াপেড়ি করলে সে কোনো দিন নোটোকে খেলার নৌকো কাটতে শিখিয়ে দিত, নয়তো লছমিকে লজেঞ্চুস কি একটা মাটির পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে দিত। মাচারুর সঙ্গে দেখা হলে মুকুন্দি প্রায়ই বলত—'দেখো, নোটোকে যদি কোনোদিন তোমাদের না রাখার মতলব হয় তবে আমাকে দিও। আমার ছেলে নেই, আমি ওকে

pathagar.net

কলেজে পড়িয়ে, সরকারী জঙ্গলের যে অফিস তারি হেড-বাবু করে দিয়ে তবে ছাড়ব,—তাতে যতই খরচ হোক।' কিন্তু তখনো মাচারুর সংসার সমান ভাবে চলছে—কম্‌তি কিছুই নেই, আনন্দের জোয়ার বইছে। সে নোটোকে ছাড়তে নারাজ হল। মুকুন্দি নিশ্বাস ফেলে অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানত যেদিন মাচারুর সুখের নদীতে ভাঁটা পড়বে, সেদিন আর নোটোকে দুবার করে চাইতে হবে না, ওরা আপনি এসেই দিয়ে যাবে।

হলও তাই। যেদিন মাচারু নোটোকে মুকুন্দির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল, সেইদিন থেকে যেন দুঃখু-কষ্ট তার সঙ্গে কোট্‌রায় এসে সেঁধোল। কাঠের বাজার হঠাৎ পড়ে গেল, তার খোঁড়া দাঁড়ী মাল-চালান দেবার সময় পড়ে গিয়ে একটা হাত মচ্‌কে নিষ্কর্মা হয়ে গেল, অর্ধেক মাল খালাসই হল না, এর উপর সেবার কাঠ নিয়ে নৌকো ছাড়বার ঠিক আগেই জুমনী এমনি জ্বরে পড়ল যে, বাঁচে কিনা! মাচারু রোগী দেখবে, না ছেলেদের দিকে নজর দেবে ঠিক পাচ্ছে না। রান্নায় নুন দিতে দিচ্ছে সে কুইনাইন। রোগীকে সোডা দিতে দিলে এক মোড়ক চূন। জুমনী দেখে-শুনে বললে—'তুমি থাকো, নোটোকে বলো, ওই সব দেখুক-শুনুক।' জীবনে এই প্রথম মাচারু নিজে হিসাব মাপ-জোপ করে কাঠ কিনলে। তিন পাক দড়ি গাছে জড়িয়ে যে ক'হাত হল তার বেশী মাচারুর হিসেব আর এগোতে পারল না—কাজেই কাঠ কিনতেও ঠকে গেল আবার একলা সেই কাঠ শহরে বেচতে গিয়েও মাচারু আরো বেশী ঠকে এল। সে শুকনো মুখে জুমনীর কাছে বসে বললে—'একটু চট্‌পট্‌ সেরে ওঠবার চেষ্টা করো, না হলে কারবার মাটি হল।' জুমনী যতটা চট্‌পট্‌ সেরে উঠল অন্য কেউ তা পারত না। সে টায়ে-টোয়ে সংসার চালাতে লাগল। হাতে কিছু যদি জমা থাকত আর-একখানা নতুন নৌকো কিনে নিশ্চয় কারবার আবার জাঁকিয়ে তুলতে পারত; কিন্তু যা টাকা ছিল জুমনীর অসুখে খরচ হয়েছে, বাকি যা আছে তাতে কোট্‌রার ফুটো মেরামত চলতে পারে।

ওদিকে নোটো এখন আর তেমন ছোটোটি নেই যে পুরোনো কাপড়ে, যা হোক দু-মুঠোয় তার চলে যেতে পারে। এদিকে আবার নোটো বড়ো হল বটে কিন্তু গায়ের শক্তি যে সেই সঙ্গে বাড়ল, তা নয়; খোঁড়া দাঁড়ী এক পা নিয়ে যতটা কাজ দেয়, নোটো তার অর্ধেকও দিতে হলে হাঁপিয়ে পড়ে। সে চেষ্টা করে কাজে লাগতে, কিন্তু হাড় মজবুত নয়। কাজেই দিন-দিন সংসারের টানাটানি বাড়তে লাগল বৈ কমল না। সেবারে শহরে কাঠ বেচে লাভ তো হলই না, উলটে বরং কোট্‌রার খোলে এমন জল উঠতে আরম্ভ হল যে ভয় হল মাঝ-পথে বুঝি বা নৌকোটা ডুবে যায়। হয় নৌকোর খোল আগাগোড়া নতুন, নয়তো পুরোনো কাঠের দরে এতদিনের কোট্‌রা বেচে আবার নতুন নৌকো করতে হবে।

সেবারে বর্ষার আগে নৌকো বোঝাই করে মাচারু মুকুন্দিকে কাঠের দাম চুকিয়ে সন্ধেবেলা ফিরে আসবে, মুকুন্দি মাচারুকে ডেকে বললে—'চলো এক ছিলিম তামাক খাবে, দু একটা কাজের কথা আছে।' মাচারুকে তামাক দিয়ে মুকুন্দি বললে—'বলি শোনো। এখন আমি যেমন একলা, এমন বরাবরই যে ছিলেম, তা ভেবো না। দেশে আমার জমি-জমা ছিল, স্ত্রী-পুত্তুরও ছিল! নিজের দোষে সব হারিয়েছি—' বলে মুকুন্দি খানিক চুপ করে রইল, কথা বলতে তার বাধোবাধো ঠেকল। সে দু চারবার ঢোক গিলে শুরু করলে—'আমি কোনোকালে বদলোক নই জানো, —কিন্তু একটা দোষ আমার ছিল।' মাচারু অবাক হয়ে বলে—'তোমার আবার দোষ!'

মুকুন্দি বললে—'সে দোষ আমার এখনো আছে—পয়সা ছিল আমার প্রাণ, পয়সার জন্যে আমি সব করতে রাজি। এই পয়সা জমাবার পাগলামি কেমন যে আমাকে পেয়ে বসেছিল, তা বলা যায় না, কেবল জমা, জমা, জমা! কলকাতায় দাদাগিরি করলে পয়সা আসবে বলে একটি মাত্র কোলের ছেলেকে নিয়ে স্ত্রীকে

সেখানে পাঠাতে আমার একটুও মায়া হল না। বেচারার যাবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না; সে বার-বার বলেছিল—একমাত্র ছেলেকে ছেড়ে সে একদিনও থাকতে পারবে না; কিন্তু আমি তাকে জোর করে পাঠালুম—নিজের ছেলেকে দুধ না দিয়ে পরের ছেলেকে মানুষ করে পয়সা আনতে। নেহাৎ গরীব যে, সেও এমন কাজ করে না; তাদেরও দয়া-মায়া আছে—যাক্ সে কথা। তারপর যা ঘটবার তাই ঘটল। জমিদারের বাড়ি আমার স্ত্রী চাকরি পেল কুড়ি টাকার। সে এক দালালনীর হাতে নিজের ছেলেকে দেশে পৌঁছে দেবার সব খরচ দিয়ে ইস্টিসান্ পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দিয়ে গেল। কিন্তু ছেলে আমার দেশে পৌঁছল না; দালালনী তাকে নিয়ে কোথায় যে পালাল তার আর সন্ধান হল না।'

মাচারু তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'তারপর তোমার স্ত্রী কী কল্‌লে?'

'কী আর করবে? যেদিন এই খবর তাকে দিলুম সেইদিনই তার সমস্ত দুধ শুকিয়ে গেল, বুকের ধনকে হারিয়ে সে বুক ফেটে মারা গেল। তারপর থেকে লোকালয় ছেড়ে এই বনে এসে আমি সেই পাপের শাস্তি দিনরাত ভোগ করছি। হারানো ছেলের জন্যে বুকটা আমার জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে ভাই। বারো বছর এই যন্ত্রণায় ভুগছি—আর পারিনে। বুড়ো হয়ে একা মরতে হবে ভেবে আমি ভয়ে মরছি। আমাকে দয়া করো, নোটোকে আমায় দাও, আমার হারানো ছেলের জায়গায় তাকে বসিয়ে যে ক'দিন বাঁচি বুকটা জুড়িয়ে নিই।'

মাচারু বড়ো বিপদেই পড়ল। নোটো বড়ো হয়ে উঠেছে, সঙ্গে খরচও বাড়ছে সত্যি, কিন্তু ঠিক যে-সময়টিতে সে যা হোক দু পয়সা আনবার মতো হয়ে উঠল, ঘরের কাজেও হাত লাগাতে লাগল, সে সময়ে তাকে ছেড়ে দিলে এতদিনের যা-কিছু খরচ আর পরিশ্রম সব বৃথা হয়ে যায়।

মুকুন্দি তার মনের ভাব বুঝেই বললে—'ছেলেটাকে আমি

pathagar.net

অমনি চাই নে, ওর জন্যে এ-পর্যন্ত যা-কিছু তুমি খরচ করছ সব আমি ধরে দেব। আর ছেলেটার এতে ভাল বই মন্দ হবে না। আমি বলছি তাকে সরকারী জঙ্গলের হেড-বাবু যদি না করে দিই তো আমার নাম মুকুন্দি নয়! নোটো যে-রকম বুদ্ধিমান তাতে আমার খুবই আশা হচ্ছে পরে ও একটা মানুষের মতো মানুষ হবে। তোমার কোনো ভয় নেই, ওকে আমি নিজের ছেলের মতো দেখব। কেমন রাজি তো? আমাকে নিরাশ কোরো না, তোমার স্ত্রীকে সব কথা বুঝিয়ে যাতে সে রাজি হয় তাই করো।'

সেই রাত্রে যখন সব ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়েছে, তখন মাচারু কথাটা পাড়াতে জুমনী বললে—'কথা তো ঠিক, নোটোর জন্যে যা করবার তা আমরা তো করলেম, ওকে রাখতে পারলে তো ভালো হত, কিন্তু তার যখন উপায় নেই, তখন ওর যাতে ভালো হয় তাইতো দেখতে হবে! আমাদের মনে কষ্ট হবে বলে ওর যদি সুরাহা হয় তাতে নারাজ তো হতে পারি নে! ভালোবেসেছি, ছেলেটা গেলে দুঃখু হবে। কিন্তু কী করব? ভগবান কাছে রাখতে দিলেন না! যেখানে ও সুখে থাকবে সেখানেই পাঠাই।'

এ কথা বলাবলি হচ্ছে আর দুজনেরই চোখ যেখানে নোটো ছোটো ছেলে দুটির সঙ্গে এক-বিছানায় অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে, ফিরে-ফিরে কেবলি সেই দিকে যাচ্ছে। দুজনে নিঃশ্বেস ফেলে বসে রইল—চুপটি করে, মুখোমুখি, কতক্ষণ ধরে। নদীর জল পুরোনো নৌকোটাকে কেবলি দোল দিচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে। কোট্‌রার পুরোনো তক্তাগুলো খিচখিচ করছে কেবলি ঢেউয়ের ধাক্কায়। শেষে মাচারু আস্তে আস্তে বললে—'ছেলেটা কি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে?'

জুমনী আঁচলে দুচোখ মুছে বললে—'যা করেন ঠাকুর, নোটোকে আমি ছাড়তে পারব না। ও এখানেই থাকবে মুকুন্দিকে বলে দিও!'

pathagar.net

নোটো পনেরো বছরে পড়েছে। এই তিন বছরের মধ্যে সে যেন দেখতে-দেখতে বেড়ে উঠল। এখন আর সে পাঙাস মুখ রোগা ছেলেটি নেই, চাওড়া বুক জোয়ান জোরোয়ার হয়ে উঠেছে।

হাল ধরতে, দাঁড় টানতে, রসি ফেলে পাকা খালাসীর মতো এক বাঁও তুই হাত, তুই বাঁও তিন হাত!' বলে জল মেপে চলতে, চর বাঁচিয়ে জলের টান বুঝে মেঘ-হাওয়া দেখে দিনে রাতে নৌকো চালিয়ে যেতে, পাড়ি দিতে, ঘাটে ভেড়াতে, ভিতে-ভিতে চলতে সে এখন মজবুৎ হয়ে উঠেছে। এখন পাকা মাঝির মতো কোর্তা লাল রুমাল গলায় বেঁধে নৌকোর ছাদের কিনারা দিয়ে নির্ভয়ে যাওয়া-আসা করতে লেগেছে।

মাচারু আজকাল নোটোর হাতে নৌকোর হাল ছেড়ে দিয়ে কেবল ঘুমোচ্ছে, খাচ্ছে আর হুঁকো টানছে। লছমিও বড়ো হয়ে উঠেছে। সে এখন রান্নার কাজে সেলায়ের কাজে মায়ের সঙ্গে সমান হয়েছে।

এ-বছর ভাদরের গঙ্গায় বিষম ঢল নেমেছে। বানে আর তুফানে নদী ভীষণ মূর্তি ধরে তুধারের গ্রাম ভাসিয়ে, পাড় ধসিয়ে, বাঁধ ভেঙে ওলোট-পালোট করতে করতে যেন পাগলীর মতো সমুদ্রের দিকে ঝাঁপিয়ে চলেছে। ব্যাপারীরা তাড়াতাড়ি নৌকো থেকে মাল খালাস করে দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে। গঙ্গার জল এত বেড়েছে যে, শহরের ঘাটের রানা সমস্তটা ডুবে গেছে; আর-একটু জল বাড়লেই শহরের রাস্তায় জল উঠবে। ক্রমাগত খবর আসছে এ ঘাট ভাঙল, ও গ্রাম ভাঙল। তার উপর বর্ধমান থেকে তার এল দামোদরের বাঁধ ভেঙেছে, গ্রাম নগর ডুবে গেছে, জল বাড়ছে বই কমছে না। গোরুর গাড়িতে জেটি-ঘাট থেকে ক্রমাগত মাল চলেছে। দালাল ব্যাপারীর ভিড় লেগেছে। কপিকলগুলো

pathagar.net

কেবলি মাল উঠিয়ে চলেছে। রাস্তার ওপারেই যে-সব দোকানী, তারা জল বাড়বার ভয়ে এরই মধ্যে দোকান-পাট বন্ধ করেছে—ঘাটের পাহারোলা, জাহাজের টিকিট-ঘরের বাবু—কারু দেখা নেই। গঙ্গার ধারে লোক ক্রমেই কমছে। কালো তিরপল-ঢাকা মাল-বোঝাই গাড়িগুলো সারি-সারি নদী থেকে দূরে গাড়িগুলোর মধ্যে গিয়ে সেঁধোচ্ছে।

মাচারু জল নেই রোদ নেই যত পারে মাল ডাঙায় তুলছে; রাতেও ঘুমোবার সময় নেই,—গ্যাসের আলোতে তেল-বাতি জ্বালিয়ে—কাজ চালাচ্ছে মাচারু। রাত এগারোটার মধ্যে কোট্‌রার পনেরো-আনা মাল খোলোসা হয়ে গেল। চামারু শেষ গোরুর গাড়িখানার উপরে বসে চলে গেল দেখে, সবাই কোট্‌রার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ল চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিয়ে। সে রাতে নৌকোখানা এমনি দুলতে লাগল, বাতাস এমন বইতে থাকল, শিকল কাঠ দড়িদাড়া এমনি মচমচ ঝনঝন করতে আরম্ভ করলে যে, কারু আর চোখ বুজতে হল না; মনে হল পুরোনো তাদের কোট্‌রাখানি যন্ত্রণায় বুড়োমানুষের মতো উঁ আঁ করে কেবলি এপাশ ওপাশ করছে।

ভোরে ছেলেরা না জাগতেই মাচারু, জুমনী, নোটো আর সেই খোঁড়া দাঁড়ী উঠে আবার বাকি মাল গাড়ি-বোঝাই করতে শুরু করে দিলে। গঙ্গা আরো ফেঁপে উঠেছে। হাবড়ার পুল বেঁকে একখান যেন ধনুক হয়েছে। পুলের নীচে দিয়ে, মেঘলা আকাশের রং ঘোলা জলে মাখিয়ে নিয়ে, স্রোত চলেছে বেগে তীরের মতো! রাস্তায় একটিও গাড়ি চলছে না, মাঝ-নদীতে একখানি পান্সি কি ডিঙি পর্যন্ত নেই, কেবল টানের মুখে কালো হাঁড়ি, ডুবো নৌকোর তক্তা, ভাঙা খাঁচা, মরা গোরু, বোঝা-বোঝা ভিজে খড়, ভাঙা গাছের ডাল—এমনি সব নানা জিনিস হুহু করে ভেসে আসছে কোথা থেকে কে জানে। পুলের ওপারে জাহাজের মাস্তুল, পোর্ট অফিসের বাড়িগুলো ঝাপসা দেখা যাচ্ছে।

pathagar.net

ঘাটের সব-উপরের ধাপটা ডুবে রাস্তায় এক হাত জল উঠেছে। চামারু হাঁকছে—'জলদি ভাই, জলদি!' মাচারু, জুমনী আর চামারু জলে কাদায় তিনজনে ঠেলাঠেলি করে গাড়িতে মাল বোঝাই দিচ্ছে, এমন সময় দমাস করে একটা শব্দ শুনে তারা চমকে দেখলে, ইট-বোঝাই একখানা কিস্তি নঙর ছিঁড়ে ঘাটের রানায় এসে পড়ে চুরমার হয়ে একেবারে ডুবে গেল, আর সেখানকার জলটা তোলপাড় হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। এরা তিনজনে কাঠের পুতুলের মতো সেইদিকে চেয়ে আছে, এমন সময় পিছনের দিকে চিৎকার উঠল —'গিয়ারে গিয়া!' মুখ ফিরিয়েই তারা দেখলে জলের তোড়ে কোট্‌রা রশি ছিঁড়ে মাঝ-গঙ্গার দিকে হুহু করে বেরিয়ে চলেছে! জুমনী 'ওরে কী হল রে' বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সেই সময় জুমনী দেখলে নৌকোর মধ্যে থেকে নোটো তার ছোটো মেয়েটাকে আর লছমিও তার মেজো ছেলেটাকে নিয়ে নৌকোর ছাদে উঠে ডাঙার দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে। মাচারু চেঁচিয়ে বললে—'দড়ি! একটা দড়ি ফেলে দে!'

চামারু বললে—'ওরে একটা পান্‌সী কি ডিঙি নিয়ে ধর নৌকোখানা!' ডাঙার লোকগুলো ছুটোছুটি চেঁচামেচি কচ্ছে, ও দিকে নৌকো ভেসেই চলেছে দেখে নোটো হেঁকে বললে—'দাওনা একটা কাছি ফেলে।'

তিনবার ডাঙা থেকে লোকেরা কাছি ফেললে, তিনবারই ফসকে জলে পড়ল,—কোট্‌রা ডাঙ্গা থেকে অনেক দূরে পড়েছে। নোটো বুঝলে এখন তার হাতে নৌকোখানা আর ছেলে-মেয়েগুলোর বাঁচা না-বাঁচা নির্ভর করছে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে হাল ধরে চেঁচিয়ে বললে—'কোনো ভয় নেই!'

নৌকোখানা স্রোতের ঠেলায় পাশ হয়ে ভেসে চলেছিল, নোটো হাল মুচড়ে তাকে স্রোতের টানের মুখে সোজা ঘুরিয়ে দিলে। ওদিকে ডাঙার উপরে মাচারু পাগলের মতো জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, চামারু দু'হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে, আর জুমনী

pathagar.net

কাদায় বসে চোখ ঢেকে কেবলি চেঁচাচ্ছে—'এ লছমি, এ বেটা, এ মেরা পুত!'

এদিকে কোট্‌রা স্রোতের মুখে পড়ে পানসীর মতো তীরবেগে সোজা হাওড়ার পুলটার দিকে চলল। নোটো হাল ধরে, ছেলে-মেয়েদের ঘরে যেতে বলে, খোঁড়া দাঁড়ীকে কাছি লগী নিয়ে ঠিক থাকতে হুকুম দিয়ে, পুলের মধ্যের খিলেনের উপর যে লাল নিশেন সেইদিকে নৌকো ফিরিয়ে দিলে। পুলটা ক্রমে কাছাকাছি আসছে, কিন্তু জল বেড়েছে, পুলের নীচে দিয়ে নৌকো গলতে পারবে কিনা সন্দেহ, যাঃ! এখন তো ফেরা চলে না! নোটো হাঁকলে 'এ মাঝি, কাঁটা কাছি লগী ঠিক!'

নোটো সজোরে হাল টেনে রয়েছে—পুলের নীচে দিয়ে জলের বাতাস এসে তার মুখে লাগছে, খোলা খিলেন হাঁ-করে যেন নৌকো সুদ্ধ তাদের গিলে ফেললে। স্রোতের টানে কোট্‌রা সাঁ সাঁ করে পুলের নীচে দিয়ে বেরিয়ে চলল। পুলের উপর থেকে লোকগুলো দেখলে খোঁড়া দাঁড়ী কাঁটা ফেলে পুলের সঙ্গে নৌকোটা আটকাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাত-ফসকে হুমড়ি খেয়ে নৌকোর খোলের মধ্যে পড়ে গেল। বড়ো বড়ো লোহার কড়িকাঠের খোঁটা সব বাঁচিয়ে নৌকো পুলের ওপারে মুখ বার করলে, নোটোর চোখে ওধারের বাড়ি-ঘর জাহাজ পরিষ্কার পড়ল। সেই সময় এক খালাসি পুলের উপর থেকে একগাছা রসি কোট্‌রার উপর ফেলে দিলে। নোটো সেটা জড়িয়ে নৌকোর খোঁটায় বেঁধে দিলে। উপর থেকে হাজারো লোক 'সাবাস সাবাস, বেঁচে থাকো বাবা!' বলে চিৎকার করতে থাকল। নৌকোটা হঠাৎ একবার থেমে, ঠাণ্ডা ঘোড়া যেমন রাশ মেনে চলে তেমনি সেই পনেরো বছরের ছোটোছেলের হাতের ইশারায় মুখ ঘুরিয়ে আস্তে-আস্তে কুলপি ঘাটে ভিড়ল। নোটো-মাঝি এক-নৌকো ছোটো ছেলে নিয়ে বানের মুখে নৌকো বাঁচিয়ে যমের দুয়োর থেকে ফিরে এল দেখে দুপারের লোক পিলপিল করে ঘাটের দিকে চলল। মাচারু আর জুমনী হাঁপাতে-হাঁপাতে

pathagar.net

নৌকোয় উঠেই নোটোর গলা জড়িয়ে আনন্দে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।

সেদিন সন্ধেবেলা মাচারু এক-ঠোঙা তেলে-ফুলুরী, ভালো সন্দেশ আর গোটা-দুই তাল, এক বোতল আরক বাজার থেকে সংগ্রহ করে এনে সবাইকে নিয়ে খেতে বসল। তার আজ যে আনন্দ, ঘোড়দৌড়ে লাখটাকা পেলেও তেমন হয় না। ফাটা-ফোটা পুরোনো কোট্‌রা আজ তার কাছে বাদশার সোনার ময়ূরপঙ্খীর চেয়ে চমৎকার বোধ হল। নোটোর উপরে মাচারুর ভালোবাসা আজ দুগুণ বেড়ে গেছে, তাই সে কেবলি তাকে কাতুকুতু চিমটি দিয়ে আদর করে বলছে—'তোকে সেদিন যদি দারোগার কাছে ফিরে দিতুম, তবে আজ কী সর্বনাশটা হত বল দেখি? আঃ, কী কায়দা করেই নৌকোটা চালিয়ে এলিরে নোটো! এই খোঁড়া! শিখে নেরে নোটোর কাছে কেমন করে হাল ধরতে হয়। আমি যে আমি, আমিও অমন বানের মুখে নৌকো ছেড়ে দিতে এখনো সাহস পাইনে!' তারপর একপক্ষ ধরে বুড়ো মাচারু যাকে দেখে তাকেই কী কায়দায় যে নোটো নৌকোখানাকে চালিয়ে গেল, তাই দেখিয়ে বেড়াতে লাগল—'জানো, নৌকোটা তীরবেগে চলেছে আর নোটো এই এমনি করে যেমন হালে মোচোড়—অমনি ওঃ, একেবারে নৌকো সোজা চলছে, বুঝলে··· ?'

এদিকে প্রতিপদ থেকে জল কমতে সুরু হল, নৌকা নিয়ে দেশে ফেরবারও সময় এগিয়ে এল। সেই সময় একদিন মাচারু নৌকোর জল ছেঁচচে। এমন সময় দারোগার লোক তাকে ডাকতে এল। 'দারোগা আবার ডাকেন কেন!' বলে মাচারু নোটোকে জল ছেঁচতে বসিয়ে পেয়াদার সঙ্গে থানায় গেল। মাচারু সারাদিনের পরে থানা থেকে যখন ফিরে এল তখন তার মুখ শুকিয়ে গেছে, ভুরুদুটো যেন রেগে কুঁচকে রয়েছে।

জুমনী বললে—'হল কী তোমার?'

মাচারু বললে—'আর পারি নে, নোটোকে নিয়ে হদ্দ হয়েছি!'

pathagar.net

জুমনী ভয়ে-ভয়ে শুধোলে—'কেন গো, আবার কী গোল হল ?'

মাচারু বলে চলল—'যে মাগী নোটোকে ফেলে গিয়েছিল, সেটা তার মা নয়, ছেলেটাকে চুরি করে এনেছিল, মরবার আগে হাসপাতালের ডাক্তার-সায়েবকে সব কথা খুলে বলে গেছে, দারোগা আমায় ডেকে সেই-সব কথা বললেন ।'

জুমনী বললে—'তবে নোটোর বাপ-মায়ের নাম তুমি জেনেছ তো, এখন তাদের চিঠি দাও !'

মাচারু চমকে উঠে জিভ-কেটে বললে 'রামোঃ ? বাপ-মায়ের নাম কি পুলিশে কাউকে বলে থাকে !'

'তবে তোমাকে ডাকলে কী করতে তারা ?' জুমনী বলে উঠল ।

মাচারু চটেই লাল ! হাত-মুখ নেড়ে বললে—'নাম জানলে কি তোমাদের বলিনে ! ভালো আপদ, ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কোরো না বলছি ।' মাচারু বিড় বিড় করে বকতে-বকতে নৌকোর নাকটার উপরে উঁচু হয়ে বসে কেবলি হুঁকো টানতে থাকল ।

জুমনী অবাক হয়ে বললে—'এর আজ হলো কী ? খেপে গেল নাকি ?'

বাস্তবিক সেইদিন থেকে মাচারুর ঘুম নেই, মুখে অরুচি ; ঘুমিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে বিড়-বিড় করে বকতে আরম্ভ করলে ; জুমনীর সঙ্গেও কথায়-কথায় চোপা ধরলে । নৌকোর কারু সঙ্গে তার বনছে না, সে যেন সে মাচারু নয় ! নোটোকেও সে কথায় কথায় দাবড়ি দিচ্ছে ।

জুমনী যদি শুধোয়—'ওগো, তুমি দিন দিন এমন হচ্ছো কেন ?'

মাচারু চটে উত্তর দেয়—'হবে আবার কী ? আমার কি রোগ হয়েছে না কি যে কেবলি শুধোচ্ছ কেমন আছ ? দিনরাত টিক-টিক কোরো না বলছি ! আমি আর এক দিনও এখানে থাকব না, কালই নৌকো ছেড়ে দেশে যাব, জ্বালাতন হয়েছি !'

pathagar.net

তার পর দিন সত্যিই নৌকো খুলে মাচারু আবার শহর ছেড়ে চলল।

কাণ্ড দেখে জুমনীর মুণ্ডু ঘুরে গেল। সে গালে হাত দিয়ে জলের দিকে চেয়ে চুপটি করে সারা পথ ভাবতে-ভাবতে চলল—বুড়ো বয়সে মাচারুর মাথা খারাপ হল নাকি?

কোট্‌রা প্রায় আশাশুন্নির কাছে এসে পড়েছে; লছমি আবার নোটোর কাছে ইস্কুলের পড়া জেনে নিচ্ছে খানিক-খানিক। সেই সময় নোটো কথায়-কথায় বলে উঠেছে—এবার গিয়েই মুকুন্দির কাঠ-গোলায় সে কাজ শিখবে। যেমন মুকুন্দির নাম শোনা অমনি মাচারু অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠল—'ফের তার নাম করছিস? মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব! মুকুন্দির নাম আর করিস নে, তার সঙ্গে আমি আর কারবারও রাখব না!'

জুমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'কেন, মুকুন্দি আবার কী করলে?'

মাচারু চোখ দুটো লাল করে বললে—'জানিস নে সে আমার—যাক ও কথা। আমি যা খুশি করব, তোরা কথা কইবার কে?'

মাচারুর যা-খুশি তাই হল। সে আশাশুন্নির ঘাটে না ভিড়ে নৌকো নিয়ে একেবারে বনের মধ্যে মুকুন্দিলালের কাঠগোলা থেকে দু কোশ তফাতে অন্য গ্রামের সামনে নৌকো ভেড়াল। শুধোলে বলে—মুকুন্দি কেবল তাকে এ-পর্যন্ত ঠকিয়ে এসেছে: এ গাঁয়ের ব্যাপারী শস্তায় কাঠ দেবে! এখানে বনগাঁয়ে ইস্কুল নেই—কিছুই নেই; নোটো আর লছমি বনে-বনে সারাদিন জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে জড়ো করতে লাগল। আর কখনো-কখনো কাজের অবসরে নালার ধারে ঘাসের উপরে বসে বই নিয়ে দুটিতে পড়া আর ছবি দেখা, আর গল্প বলাবলি করতে থাকল। ঘন বনের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে নালার জলে পড়েছে, সেখানে ছোটো ছোটো মাছ কিলবিল করছে, গহন বনের মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, পাখি গান গাইছে, হনুমান গাছে-গাছে লাফিয়ে চলেছে, সবার উপরে বনের অন্ধকার গমগম করছে—আরো

pathagar.net

কত কী দেখে-শুনে ছেলে-মেয়ে ছুটি দিন কাটাচ্ছে। সন্ধেবেলা কাঠের বোঝা মাথায় তারা বনের তলা দিয়ে রোজ ফেরে ; তখন দেখে বিকেলের রোদ গাছের তলায় চাকা-চাকা ছাওয়া ফেলেছে, বনের ফাঁক দিয়ে কোট্‌রার সরু মাস্তুলটা দেখা যাচ্ছে—দূর থেকে ; আর চড়ার উপরে আগুন জ্বালিয়ে জুমনী-মা রাঁধতে বসেছে ; কাছে ছোটো ছেলেটা বালির উপর পা ছড়িয়ে আঙুল চুষছে, কোলের মেয়েটা বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করছে আর নৌকোর ছাদে বসে মাচারু আর খোঁড়া দাঁড়ী হুকো টানছে।

একদিন রেঁধে-বেড়ে তারা আবার উদ্যোগ করছে এমন সময়ে বনের মধ্যে থেকে মুকুন্দি হাঁটতে-হাঁটতে উপস্থিত।

মাচারু তাকে দেখেই মুখটা ভারি করে বললে—'এই যে আসছে!'

মুকুন্দি কাছে এসে বললে—'তবে একেবারে আমাকে ভুলে গেলে ভাই!'

মাচারু আম্‌তা-আমতা করে বললে—'না, ভুলব কেন?'

মুকুন্দি আর সে মানুষ নেই, যেন বুড়ো হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সে একটা লাঠি ধরে নৌকোতে উঠে এল। জুমনী তার দশা দেখে তাড়াতাড়ি তাকে বসবার একটা বৈঠে এগিয়ে দিয়ে বললে—'কিছু অসুখ হয় নি তো? বড়ো রোগা দেখাচ্ছে!'

মুকুন্দি ঘাড় নেড়ে আস্তে-আস্তে ভাঙা গলায় বললে—'আর এদেশ ছেড়ে চললুম! বোধ হয় এ জন্মে আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় কিনা! কারবার গুটিয়ে নিয়েছি, পয়সাও জমিয়েছি, কিন্তু কী হবে এত পয়সা নিয়ে? যাদের হারিয়েছি তাদের তো আর ফিরে পাব না, বেঁচে আর সুখ কী!'

মাচারু চোখ-বুজে শুনে যাচ্ছে, একটি কথা কইছে না।

মুকুন্দি বললে—'আহা, আজ যদি আমার ছেলেটা কাছে থাকত তো ভাবনা ছিল কী? সবই আমি নিজের দোষে হারিয়েছি।' বলে মুকুন্দি মস্ত একটা নিঃশ্বেস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে

pathagar.net

নোটোর মাথায় হাত বুলিয়ে বললে— মন দিয়ে লেখা-পড়া কাজকর্ম- শিখো, বেঁচে থাকো আশীর্বাদ করি। আঃ আমার ছেলেটা থাকলে তোরই মতো আজ এত বড়োটি হত।'

মুকুন্দিকে ঘাড় ধরে নৌকো থেকে নামিয়ে দিতে মাচারুর হাত নিস্‌পিস করতে লাগল—বুড়ো আবার ছেলের কথা পেড়েছে। কিন্তু মুকুন্দি যখন আপনিই লাঠি ধরে আস্তে আস্তে চলল, তখন মাচারু তাকে বললে—'একটু তামাক…' এখনি কড়া সুরে এ-কথাটা মাচারু বললে যে মুকুন্দি ঘাড় নেড়ে বললে—'না ভাই, আর কাজ নেই ; মন বড়ো খারাপ, তোমরা সুখে থাকো, আমি চললুম।'

মুকুন্দি চলে গেল। মাচারু গোঁ হয়ে কী ভাবতে লাগল। সে-রাতে আর তার ঘুম এল না ; একলাটি নৌকার ছাদে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিলে। ভোর না হতে মাচারু কাউকে কিছু না বলে সোজা পোস্টমাস্টারবাবুর কাছে আশাশূন্যিতে হাজির।

সবে সকাল হয়েছে। পোস্ট-আফিসের দরজা এখনো খোলে নি। বাগানে গোটাকতক হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে ঘুরছে। ঘরের মধ্যে থেকে মাস্টারবাবুর গড়গড়ার ভুর ভুর শব্দ আসছে। ফটক ঠেলে মাচারু আস্তে আস্তে ঢুকল। দূর থেকে মাস্টারবাবু তাকে দেখে ডাক দিলেন—'এসো, এত সকালে যে! কী মনে করে! বোসো!'

মাচারু একধারে বসে বললে—'একটা কথা শুধোব। আপনি তো জানেন মুকুন্দির স্ত্রীপুত্তুর কেউ নেই, পনেরো বছর হল সে তার স্ত্রীকে দাইগিরি করতে শহরে পাঠায়। মুকুন্দির স্ত্রী তার কোলের ছেলেকে ডাক্তারকে দেখিয়ে, এক দালালনীর হাতে ছেলেটিকে দেশে মুকুন্দির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই দালালনীটা বজ্জাত ছিল। সে ছেলে চুরি করে তাদের দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করিয়ে দিন চালাত। মুকুন্দির ছেলেটাকে সে চুরি করে পালাল, চার বছর তাকে মানুষ করলে, কিন্তু ভদ্রলোকের

pathagar.net

ছেলেকে ভিখিরি করে তুলতে পারলেন না। তারপর তাকে সে রাস্তায় বসিয়ে সরে পড়ল। মরবার আগে তার সুমতি হয়েছে, তাই দারোগার কাছে সে বলেছে যে নোটো—'

পোস্ট-মাস্টার হুঁকো রেখে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—'বলো কী? নোটো তাহলে মুকুন্দির হারানো ছেলে?'

মাচারু উত্তর দিলে—'হ্যাঁ। সেই কথাই দারোগা আমায় বললেন।'

পোস্ট-মাস্টার মাচারুর হাত ধরে বললেন—'এ কথা এতদিন বলতে হয়! আজই তো মুকুন্দিকে এ খবর দেওয়া চাই,—সে চলে যাচ্ছে।'

মাচারু চোখ মুছে বললে—'এই দুমাস ধরে বলব-বলব করছি; বলতে পারি নে। ছেলেটাকে ছাড়তে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে মাস্টার-মশায়। কত করে তাকে যে মানুষ করেছি, কত যে ভালো তাকে বেসেছি দুজনে, কী বলব! ছেলে-মেয়েগুলো পর্যন্ত তার বশ হয়ে গেছে। ফিরে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে বাবু! বড়ো দুঃখের ধন আমার নোটো!'

মাচারুর মুখ দেখে পোস্টমাস্টারের চোখে জল এল; তিনি বললেন—ফিরে তো দিতেই হবে মাচারু! আমি যদি তোর অবস্থায় পড়তুম তবে তুই কি আমাকে বলতিস-নে এখনি নোটোকে তার বাপের কাছে দিতে?'

মাচারু কেঁদে বললে—'সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আহা, কাল মুকুন্দি আমার ওখানে এসেছিল; তার দুঃখ শুনে, দশা দেখে আমার বুক ফেটে গেল; সারারাত ঘুম এল না। নোটোকে আর রাখতে পারব না বুঝেছি।'

পোস্টমাস্টার বললেন—'তবে চলো, মুকুন্দির ওখানে আমিও যাই।'

মাচারু বললে—'আর একটা দিন নোটোকে কাছে রাখতে দাও মাস্টারবাবু!'

pathagar.net

মাস্টার ঘাড় নেড়ে বললে—'আর দেরি না মাচারু, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে !'

মাচারু কাঁদছে দেখে আবার তিনি বললেন—'শুভকাজে দেরি নয়রে মাচারু ! আমার কথা শোন্, দেরি করিস নে !'

মাচারু কাঁদতে-কাঁদতে মাস্টারবাবুর সঙ্গে মুকুন্দির কাঠগোলায় চলল।

ইস্কুলবাড়িতে

হারানো ছেলে নোটোকে নিয়ে মুকুন্দিলাল, কোম্পানির জাহাজে করে, শহরের দিকে এমনিভাবে কাউকে কিছু না বলে চলেছে, যেন মনে হচ্ছে, সে আর কারু ছেলেকে নিয়ে পালাচ্ছে।

এ যেন গরীব-গৃহস্থ হঠাৎ মাটি খুঁড়ে লাখ টাকা পেয়ে গেছে ! তার নোটো যে আর কাউকে ভালোবাসবে, সেটা তার সইবে না, তাই সে জুমনীর আর মাচারুর আর লছমির আর তার ভাই-বোন আর সেই ছৈ-ঢাকা ছোটোখাটো কোট্‌রার থেকে অনেক দূরে নোটোকে নিয়ে একা থাকতে চাচ্ছে। আগে যেমন সে পয়সার জন্যে পাগল ছিল, কাউকে ভাগ দিতে চাইত না, আজও তেমনি এই ছেলেকে নিজের করে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

কলের জাহাজ যেমন ছুটেছে হুহু করে, বাঁশি বাজিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে, নোটোর দিকে চেয়ে-চেয়ে মুকুন্দির মাথাতেও তেমনি নানা খেয়াল বিজবিজ করে উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। কখনো সে দেখছে, যেন তার নোটো এমে-বিয়ে পাশ করে বেরিয়ে সরকারী জঙ্গলের হেডবাবু হয়েছে আর মুকুন্দি আফিসে যেতেই বড়ো সাহেব তার পিঠ চাপড়ে বলছে—'হ্যালো মুকুন্দি, টোমার বেটা বহুৎ আচ্ছা কাম করিটেছে !' তার পরে খেয়াল হচ্ছে, যেন নোটো রায়-বাহাদুর খেতাব পেয়ে জরীর পোশাক পরে, মাথায় পালকের টুপি এঁটে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে দরবার থেকে বাড়ি এল, পাড়ার লোক

তাকে দেখতে এসেছে, মেয়েরা সব নোটোকে জামাই করবার জন্যে ঘটকী পাঠাচ্ছে, অমনি একজন এক মেয়ের বাপ—রাজা বাহাদুরের জুড়ি গাড়ি এসে দরজায় লাগাল, তিনিও তাঁর মেয়ের জন্যে দরখাস্ত দিতে এসেছেন।

এদিকে নোটোও যে জাহাজের থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে দু-পারের গ্রাম আর বন মাঠ আর আকাশের দিকে চেয়ে কোনো স্বপ্ন না দেখেছিল তা নয়! তার চোখ ছলছল করছিল,—জুমনীর কথা, লছমির কথা, মাচারু, খোঁড়া দাঁড়ী, ছোটো ভাই বোন, সেই বন-গাঁয়ের ঘাটে-বাঁধা পুরোনো কোট্‌রার কথা ভাবতে ভাবতে। সে যেন কোন্ রাজ্যে গিয়ে পড়েছিল,—সেই ছেলেবেলার খেলাধুলো, জলে সাঁতার, ঝিকিমিকি আলোয় বনে বনে ঘোরা, চাঁদের আলোয় বালির চড়ায় ছুটোপাটি, নদী বেয়ে নৌকো নিয়ে আনাগোনা—সব আজ মনে আসছিল। হঠাৎ এ-সব ছেড়ে চলে এসে নোটো যে খুব সুখী হয়েছে তা নয়। কিন্তু এইখানে তার দুঃখু শেষ হল না, জাহাজ-ঘাটে নেমে মুকুন্দি তাকে একটা ঠিকে-গাড়িতে করে শহরের নানা গলি পেরিয়ে মস্ত একটা বাজারে হাজির করলে; সেখানে একটা পালকের টুপি, নতুন সার্ট, গোলাপি মোজা, বার্নিস জুতো, মখমলের উপর জরীর গোটা-বসানো কোর্ট-পেন্টালুন পরিয়ে জুমনীর হাতের সেলাই-করা পুরোনো খালাসির সাজ ছাড়িয়ে দিলে। নোটোর মনে হল যেন পুরোনো কাপড়গুলো ধুলোয় পড়ে তার সঙ্গে চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে কাঁদছে! তারপর অন্ধকার গলির মধ্যে বাসা-বাড়ি। নোটোর সেই-সব দিনের কথা মনে পড়লো যখন দালালনী তাকে দুবেলা দু মুঠো এমন করে দিত যে, কুকুরকেও তেমন কেউ দেয় না। সেখান থেকে ইস্কুলের বেঞ্চি, মাস্টারের বেত, হেড-মাস্টারের চোখ রাঙানি, মোটামোটা বইগুলোর হিজিবিজি হ য ব র ল! তারপর রোজ সন্ধেবেলা হোস্টেলের গরম ঘরে পিদিম জেলে রাত জেগে পড়া-মুখস্থ, নোট লিখতে কেবলি মাথা-ঘামানো। ঘুরে-ফিরে নোটোর মন ছৈ-ঢাকা পুরোনো নৌকোর

pathagar.net

দিকেই টানতে লাগল ; আর পড়বার বইগুলোর পাতায়-পাতায়, নোটোর খাতায় কেবলি সে নৌকো এঁকে চলল—ছৈ-ঢাকা তাদের পুরোনো কোট্‌রা ! কখনো সেটা বইয়ের পাতার ধার দিয়ে ছাপার অক্ষরগুলোতে ধাক্কা খেতে-খেতে উপরে উজিয়ে চলেছে, কখনো উপর থেকে নীচে নামছে ১৮২ পৃষ্ঠার ঘাট ছেড়ে সমাপ্তর দিকে। কোথাও নৌকো এক শক্ত অঙ্কের ঠিক মাঝে এসে কাৎ হয়ে গেছে ; কখনো ম্যাপের আরব্য-উপসাগরে নৌকোটা পাল তুলে নিশেন উড়িয়ে নির্ভয়ে চলেছে। ভূগোলের যেখানে নদীর নাম, সেখানে হাবড়ার পুল এঁকে তার নীচে দিয়ে নোটো নৌকো চালিয়ে দিয়েছে ; পুলের উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে—ধোপার গাধা সারি-সারি। 'নীতি-চর্চা'র সব পাতায় লেখা মাচারু তামুক টানছে ; প্রাণীবৃত্তান্তের বইখানার পাতায় লেখা ছেলেরা ছিপে মাছ ধরছে ; অঙ্কপুস্তকে এ বি সি লেখা একটা জ্যামিতি-সমস্যাকে ঘুড়ির লকে বেঁধে ছেলে ওড়াচ্ছে—করে দিয়েছে ! সংস্কৃত গঙ্গা-স্তোত্র যেখানে, সেখানে কালির চড়া তাতে একটা নোঙর-বসানো, নৌকো নেই ! ক্ষেত্র-তত্ত্ব যেখানে সেখানে পাতায়-পাতায় নোটো জলের ঢেউ টেনে গেছে আর বানে সব মরা গোরু ভেসে যাচ্ছে—লিখেছে। সেকেণ্ড মাস্টার-মশায় একদিন যখন এই বইগুলো ইস্কুলের হেড-মাস্টারের সামনে হাজির করে দিলেন, তখন নোটোর বাপের ডাক পড়ল।

হেড-মাস্টার মুকুন্দিকে বইগুলোর চিত্তির বিত্তির দেখিয়ে বললেন—'এ ছেলের কিছু হবে না, অনর্থক পয়সা নষ্ট করছ, নিয়ে নৌকোর মাঝি করে দাও গে।'

মুকুন্দি মাথা চুলকে বললে—'আর একটা বছর রেখে দেখুন।'

হেড-মাস্টার ঘাড় নেড়ে বললেন—'রাখতে চাও রাখো, ওর লেখাপড়া হবে না।'

লছমির সঙ্গে পাখির গানে সোনার রোদে ভরা বনগ্রামের পাঠশালাখানির পোড়ো সে নোটো, শহরের ইস্কুল-মাস্টারের রুল খেতে খেতে ক্রমে প্রথম শ্রেণী থেকে নামতে-নামতে ইস্কুলের সব

pathagar.net

নীচের শ্রেণীতে এসে বসল। বুড়ো মুকুন্দি মাথায় হাত দিয়ে পড়ল। সরকারি জঙ্গলের হেডবাবু হওয়া দূরে থাক্, বরন-কোম্পানির কেরানী যে হতে পারে নোটো—এমন আশাও নেই। তার স্বপ্নে সরকারি জঙ্গলের হেডবাবু, রায়-বাহাদুর, পাড়া-পড়শী, ঘটক ঘটকী রাজাবাহাদুরের এক মেয়ে নিয়ে—নোটোর ক্লাস-নামার সঙ্গে সঙ্গে মিলোতে-মিলোতে দূরে অদৃশ্য হল। সে নোটোকে ধমকে মিনতি করে খুব দামী প্রাইভেট টিউটারের লোভ দেখিয়ে কিছুই করতে পারলে না। নোটো চেষ্টা করত ভালো পড়তে, কিন্তু মাসে মাসে লছমির হাতের লেখা ছোটো চিঠি যখন পেত তখন মন তার কিছুতে বসতে চাইত না—ইস্কুলের বেঞ্চিতে, পুঁথির পাতায়। প্রত্যেক চিঠিতে লছমি লিখছে—'এ সময় তুমি যদি আমাদের কাছে থাকতে।' একটা নতুন পাখি বনে এসেছে, লছমি লিখলে—'তুমি যদি থাকতে তো ভারি মজা হত। বাবা একটা বড়ো মাছ ছিপে ধরেছে, তুমি থাকলে বেশ হত। ছোটো বোন হাঁটতে শিখেছে, তুমি থাকলে কী মজাই হত। পুরোনো নৌকো ভেঙে প্রায় অচল হয়েছে—এ সময় তুমি থাকলে যা হয় একটা সুরাহা হত।' নোটো চিঠি পড়ে বুঝলে, সে না-থাকাতেই যত গোল বাধছে ; সে যত তাড়াতাড়ি পারে ইস্কুলের পড়া শেষ করে দেশে যাবার জন্যে কোমর-বেঁধে মন দিয়ে এবার পড়ায় লাগল। ছেলে আজকাল ভালো পড়ছে শুনে মুকুন্দির আহ্লাদ ধরে না ; তার মাথায় আবার জঙ্গলের বড়োবাবু দেখা দিলেন—খেয়ালের ফাস্টক্লাস গাড়িতে চড়ে! নোটো এখন আর বই থেকে চোখ তোলে না। এই সময় লছমির শেষ চিঠি এল। সঙ্গে সঙ্গে যেন জলের বাতাস এসে তার ঘরের মধ্যে পৌঁছল ; তার মনের মধ্যে পড়ার-ধমকে-চুপ-করানো বনের পাখি আবার গেয়ে উঠল। নোটো বই বন্ধ করে চিঠিখানি আস্তে আস্তে খুলে দেখলে —লছমি চিঠির উপরে তাদের নৌকোটির একটা আঁকাবাঁকা ছবি দিয়েছে—তার গায়ে একটা টিকিটে লেখা—'পুরাতন কাঠের দরে

pathagar.net

বিক্রয় করা যাইবে।' এই ছবির নীচে লছমি বাঁকাচোরা অক্ষরে লিখেছে—'কোট্‌রা আর জলে-ভাসবে না, সব শেষ! মা বাবা বড়ো দুঃখে আছেন, এ সময় তুমি কাছে নেই, কী আর জানাব, আমাদের কী দশা হবে কোথায় দাঁড়াব! কাল এক কাঠওয়ালা নৌকো দেখে গেছে দরদাম আজ দেবে!'

সে রাতে নোটো স্বপ্ন দেখতে লাগল, যেন জাহাজ তাকে নিয়ে হু হু করে আশাশূন্যির ঘাট পেরিয়ে যাবার জোগাড় করছে। দূর থেকে আরো দূরে তাদের ঘাটে-বাঁধা কোট্‌রা। নোটো দেখলে, সেখানে লছমি দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাকে ডাকছে। নোটো চিৎকার করে বললে—'এই খালাসি, ঘাটে ভেড়াও!' চিৎকার শুনে মুকুন্দি নোটোর ঘরে এসে দেখে, সে বিছানায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বকছে—'ঘাটে ভেড়াও, ঘাটে ভেড়াও, এক বাঁও দুই হাত, এক বাঁও দেড় হাত।' যেন নোটো একটা নৌকো চালিয়ে যাচ্ছে—স্বপ্ন-নদীর উপর দিয়ে। মুকুন্দির ভয় হল। সে নোটোর কপালে হাত দিয়ে দেখলে জ্বর! তার হাতের কাছে চিঠিখানা পড়েছিল, সেটা দেখে মুকুন্দি সব বুঝলে। তারপর ডাক্তার আনতে পাঠিয়ে সে আশাশূন্যির ঠিকানা দিয়ে একটা চিঠি ডাকে ফেলে দিলে।

* * *

অনেকদিন পরে জ্বরবিকার থেকে নোটো সেরে উঠেছে। ডাক্তার তার পড়া বন্ধ করে মুকুন্দিকে হাওয়া-বদলের পরামর্শ দিয়েছেন। মুকুন্দি নোটোকে নিয়ে সুন্দর-বনে আবার ফিরেছে। আজ বনের মধ্যে বাঁশি বাজল,—নোটো আর লছমির বিয়ে। নদীর তীরে বিয়ের আটচালা বাঁধা হয়েছে। পোস্টমাস্টার সেদিন গরদ পরে পৈতে ঝুলিয়ে পুরুত হলেন। বিয়ে হয়ে গেল। আর অমনি সবাই দেখলে—মুকুন্দির কাঠগোলা থেকে পুরোনো কোট্‌রা, নতুন রং নতুন সাজে সাজিয়ে, হলদে ধুতি গোলাপি চাদর পরা খোঁড়া দাঁড়ী, আস্তে আস্তে ঘাটে ভেড়ালে। নৌকোর সবুজ খোলের উপর লাল দিয়ে বড়ো করে লেখা 'নোতোন কোট্‌রা।'

pathagar.net

মুকুন্দি মাচারুকে বললে—'ভাই, নোটোর সঙ্গে তোমার নৌকোটাও ফিরে দিলুম, দুটোই আমার সইল না।'

হাত ধরাধরি করে বর-কনে নিয়ে, আর জুমনী ও ছেলেদের নিয়ে মাচারু নতুন কোট্‌রায় আর একবার চড়ে বসল। পুরোনো কোট্‌রা নতুন করে জলের পরশ পেয়ে, ঘাটে ঘাটে ভিড়তে-ভিড়তে নাচতে-নাচতে হেলতে-দুলতে মাল উঠিয়ে মাল নামিয়ে চলল—জোয়ারের মুখে, ভাঁটার টানে, বান কাটিয়ে নতুনতর ব্যাপার করতে!

সেই সময় বুড়ো মাচারু বুড়ী জুমনীকে বললে—'কী গো দারোগার কাছে ছেলেটাকে দিয়ে আসতে হয় তো এইবেলা বলো।'

জুমনী মুখ-বেঁকিয়ে বললে—'রকম দেখো।' তারপর ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে ফুলুরী ভাজতে বসল।

বারোয়ারি উপন্যাস

[অংশ]

দুর্গামণির পরামর্শমতো সতীশ মৈত্রমশাইকে একটা তার করে উত্তরের অপেক্ষায় রইল ; কিন্তু মৈত্রমশায় তখন যোগেন মিত্তিরকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হয়েছেন, কাজেই সতীশের তার বিনা-উত্তরে কালীগ্রামে যেমন গিয়েছিল তেমনি ফিরে এল। কালীগাঁয়ের পাঁচ ক্রোশ দূরে বেলতলি-স্টেশনের পোস্টমাস্টার সতীশের তারের জবাব লিখলেন—'এড্রেসী নট্ ফাউণ্ড।'

টেলিগ্রাফের তারের মতো রুলটানা নিষ্ফল গোলাপি কাগজটা হাতে করে সতীশকে শুক্‌নো-মুখে আসতে দেখেই দুর্গামণি বুঝলেন, খবর খারাপ ! তিনি আর কোনো কথা না শুধিয়ে সতীশকে বললেন, —'বাবা, আমি একবার দেশে যাব, কোনো গতিকে আমাকে সেখানে পাঠাতে পারিস ?'

সতীশ খানিক ভেবে বললে—'পারি। দারাগঞ্জের সতীশবাবুর স্ত্রীর অসুখ ; দেখতে তাঁর মা কলকাতায় যাচ্ছেন ; তুমি তাঁদের সঙ্গে গেলে জগদীশপুরে তাঁরা তোমায় নামিয়ে পাল্কি চড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তুমি দেশে যাবে কী করতে ? এখানে তো বেশ একরকম—'

দুর্গামণি সতীশের কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—'না না, আমার না গেলে চলবে না। আর-একটি ভালো মেয়ে দেখে তোর আবার বিয়ে দিতে হবে।'

কমলার দুর্নাম রটিয়ে বেনামী চিঠিটা পাওয়া অবধি সতীশের মাথায় সন্ন্যাস-করবার একটা প্ল্যান ক্রমাগত ঘুরছিল ; এবং এই

প্ল্যানটা নিয়ে সে তার গুরুদেব আত্মানন্দ স্বামীজীর সঙ্গেও ইতিমধ্যে দু-একবার খুব গম্ভীরভাবে আলোচনা করে একরকম সংসার ত্যাগ করাই স্থির করেছে ; কিন্তু আজ হঠাৎ তার মা তাকে আর-একবার সংসারের ফাঁস-কলে ফেলার চেষ্টায় আছেন জানতে পেরে সতীশ বিষম ভাবিত হয়ে দুর্গামণিকে কিছু আর না বলে-কয়েই সোজা গুরুজীর আখড়ার মুখে দুপুর-রোদে একটা ভাঙা ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়ল।

গোমতী নদীর ধারেই দিব্বি একটা ছোটোখাটো ইমারতে সতীশের গুরুজী গুরুমাতার সঙ্গে আখড়া বেঁধে অনেকগুলি বাঙালী উকিল আর কেরানী চেলার সেবা নিয়ে সুখে বাস করছেন। দুপুরের রোদে তেতে-পুড়ে সতীশ সেখানে হাজির। গুরুজী তখন আহারের পর মৃগচর্মের আসনে আধ-বসা আধ-শোয়া অবস্থায় ভাগবতের পুঁথিকে বালিশ করে নিত্যনৈমিত্তিক ধ্যানে ছিলেন। কাজেই সতীশকে বাইরে অপেক্ষা করতে হল।

আখড়ার বারাণ্ডার সামনেই গোমতী নদী মস্ত একটা বাঁক টেনে চলে গেছে ; আর ওপারে ধূ ধূ মাঠ ; সেই মাঠে গোটাকতক রোগা গোরু শুক্‌নো ঘাস খুঁজে খুঁজে চরে বেড়াচ্ছে ;—এই ছবিটা দেখতে দেখতে বাংলার একটা গণ্ডগ্রামের ঘরকন্নার গোটা-কতক দিন সতীশের মনের মধ্যে আজ এমন স্পষ্ট হয়ে আনা-গোনা করতে লাগল যে এক সময়ে তার সন্ন্যাসের প্ল্যান গোমতীর স্রোত ধরে কতদূরে ভেসে গেল তার ঠিকানাই নেই। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মোটা গলায় একটা হুংকার শুনে চমকে উঠে সতীশ বুঝলে, গুরুজী জেগেছেন। সে আস্তে আস্তে ছাতা আর জুতো বাইরে রেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। তখন বেলা প্রায় তিনটে।

দূর থেকে গুরুজীকে টিপ করে একটা প্রণাম দিয়ে মাটির উপরে সতীশ সোজা হয়ে বসলে ; গুরুজী ঘুমে-ভারী দুই চোখ সতীশের দিকে ফিরিয়ে বললেন—'বোসো, খবর কী ?'

সতীশ হাতদুটো জোড়া করে, খানিকটা মুঠো করে উদাস

pathagar.net

সুরে বললে—'বড়ো বিপদ স্বামীজী ! মা আবার আমার বিবাহ দেবার জন্যে দেশে চলেছেন—মেয়ে দেখতে ।'

গুরু—'হুঁ !' বলে একটা নিশ্বাস ফেলেই আসন ছেড়ে ওঠবার উপক্রম করছেন দেখে সতীশ একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে বললে—'আমার এখন কী উপায় হবে ঠাকুর ?'

গুরু আকাশের দিকে দুটো ঝাঁকরা ভুরু খুব খানিকটা তুলে বললেন—'বাপু, সংসার মায়াময় । সেখানে আশঙ্কার অন্ত নেই । জ্বালাও অনন্ত । আমি ত বলি তুমি সোজা বেরিয়ে পড়ো ; আর দেরি কোরো না ।'

সতীশ মুখটা অত্যন্ত কাঁচুমাচু করে বললে—'কিন্তু আমি যে দুই সমস্যার মধ্যে পড়লুম ! এদিকে মাতৃ-আজ্ঞা—বিয়ে করতে ; ওদিকে প্রভু বলছেন সংসার ছাড়তে ।'

গুরু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—'তা হলে মাতৃ-আজ্ঞাই পালন করো । মুক্তির আশা ছেড়ে দেও !'

এই 'ছেড়ে দেও' কথাতেই গুরুর বাঙালে রাগ একটুখানি ঝিলিক দিয়ে গেল । সতীশ আরো কাঁচুমাচু হয়ে বললে—'তা কী হয় ? আমি সংসার না করাই স্থির করেছি, কিন্তু—'

গুরুজী মস্ত একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললেন—'ওই কিন্তুই হল সর্বনাশের মূল ! এইটুকু থাকে বলে সাধন করেও তিন জন্মের পূর্বে মুক্তি লাভ করতে কাউকে বড়ো একটা দেখলুম না ।'

সতীশ অবাক হয়ে বললে—'বললে কী ! তিনজন্ম কঠোর সাধন করে তবে ?'

'তিনটে জন্ম আন্দাজ লাগে দেখছি ।'

সতীশ নিশ্বাস ফেলে বললে, 'তাহলে আমার তো কোনো আশাই নেই দেখছি । তিনের উপরে তিন জন্মেও আমার 'কিন্তু' ঘোচে কি না সন্দেহ !'

আত্মানন্দ খুব গম্ভীর হয়ে বললেন—'গুরুতে ভক্তি-নিষ্ঠা রেখে তাঁর আদেশ পালন করে চললে, এই জন্মেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে !'

pathagar.net

সতীশ অত্যন্ত কাতর স্বরে বললে—'মনে যে 'কিন্তু' আপনা আপনি ওঠে! না হলে আপনার আদেশ আমি যথাযথ পালন করছি।'

আত্মানন্দ শুধোলেন,—'কী বিষয়ে তোমার 'কিন্তু' হচ্ছে শুনি?'

সতীশ বলে চলল—'অনেকগুলো বিষয়ে 'কিন্তু' রয়েছে। সর্বপ্রধান হচ্ছে—আমার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে, ওই বেনামী চিঠিটার উপরে। তারপর দ্বিতীয় সংসার করা কি নয়? নির্জন বাসে যাওয়া, কি বাসায় বসে সাধন করা? সবার চেয়ে শক্ত 'কিন্তু'টা হচ্ছে চাকরি ছেড়ে মাকে অনাহারে মারা, এবং কমলাকে ছেড়ে নিজেও মরা কি না?'

সতীশ রোদে তেতে-পুড়ে এসেছিল, আর গুরু ছিলেন ঠাণ্ডা ঘরখানিতে ঘুমিয়ে; কাজেই গুরু অতি কোমল স্বরে ডাকলেন—'সুধীর, বাবা, এদিকে এসো তো।' গেরুয়া-আলখাল্লা-পরা নেড়া মাথা ধীরানন্দ বাবাজী একটা লোটা হাতে উপস্থিত হলেন। আত্মানন্দ সতীশকে দেখিয়ে বললেন—'বাবা সুধীর, এঁকে একটু জলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করে আনো; আমি ততক্ষণ হাত-মুখগুলো ধুয়ে আসি।'

সতীশ গুরুজীর খড়মজোড়াটা এগিয়ে দিলে তিনি খটাস্-খটাস্ করে অন্দরের দিকে চলে গেলেন। একটা বাঁদর খড়মের শব্দে ঘুম ভেঙে গুরুজীর বৈকালি-ভোগের প্রসাদ-কণার লোভে ঝুপ করে ছাদের উপর লাফিয়ে পড়ল।

সতীশ নিশ্বাস ফেলে ধীরানন্দের দিকে চেয়ে বললে—'আমার ভাই মুক্তি নেই! গুরু বললেন, অন্তত তিন জন্ম ফেরাফিরি করতে হবে!'

ধীরানন্দ হেসে বললেন—'আর আমি যদি এমন ওষুধ বাৎলে দিই যাতে এক-জন্মেই মুক্তি, তো কী দিবি?'

সতীশ কাতর হয়ে বললে—'আমার আর কী আছে? জন্ম-জন্ম তোর কেনা-গোলাম হয়ে রইব।'

pathagar.net

ধীরানন্দ সতীশের পিঠ চাপড়ে বললে,—'আরে, এই জন্মেই যদি মুক্তি পেলি তো জন্ম আবার আসে কেমন করে? বৃন্দাবনে চলে যা; সেখানে ময়ূর বানর সব একজন্মে মুক্তি লাভ করছে দেখতে পাবি!'

সতীশ গম্ভীরভাবে বললে,—'কিন্তু গুরু যে বলেন আমাকে হিমালয় গিয়ে নির্জন বাস করতে। আচ্ছা ভাই, তোর কী মনে হয়? কমলাকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে, এখনি যদি চলে যাই, তবে তাদের উপর অবিচার করা হবে না?'

ধীরানন্দ একটু হেসে বললে—'যদি চাকরিতে একবারে ইস্তফা দিয়ে পালাও, তবেই অবিচার হবে, না হলে 'সিক্ লিভ' নিয়ে দিন কতক গা ঢাকা হলে নানা দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি তো পাবিই, আর একটু মাথাটা ঠাণ্ডা হয়েও আসতে পারবি!'

সতীশ উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল—'তোর কথাতেই রাজি! আজ ছুটির দরখাস্ত দিয়ে মাকে বাড়ি পাঠিয়ে আসব।'

ধীরানন্দ হেসে বললে—'যা করতে হয় এইখানে বসে কর! বাসায় গেলে আবার মনটা 'কিন্তু' করতে পারে। চল্ এখন কিছু খাবি!'

সতীশ মাথা নীচু করে ভাবতে ভাবতে সুধীরের পিছনে পিছনে আখড়ার উঠোন পেরিয়ে একটা পোড়ো বাগানের খিড়কির গায়ে সুধীরের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

●

একবার বিয়ে করতেই সতীশের আপত্তি ছিল; কেবল কমলার দেখা পাওয়া গিয়েছিল বলেই সেবার দুর্গামণি সতীশকে বাঁধতে পেরেছিলেন। বাঁধন একটু হালকা হতেই সতীশের বৈরাগ্য রোগটা আবার দেখা দিয়েছে; এবং আত্মারাম স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই সতীশের ধর্মপ্রদীপ ক্রমেই উশকে তুলে যাচ্ছেন, কাজেই দ্বিতীয়বার বিয়েতে সতীশ ঘাড় পাতবে না, দুর্গামণি বেশ জানতেন; কিন্তু তবু

লক্ষ্ণৌয়ের বাসাটায় বসে না থেকে, জগদীশপুরে ফিরে গেলে তিনি যে একটা কিছু উপায় করতে পারবেন, সেটা তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস। আর সেই জন্যেই তুর্গামণি সতীশের গুরুবাড়ি থেকে ফেরার অপেক্ষায় না থেকে নিজের কাপড়-চোপড় বাক্স-পেটরা গোছাতে বসে গেলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল। কাছারির ফেরতা বড়ো-বড়ো দাড়িওয়ালা নাজির আর কাজিরা আলপাকার জোব্বা আর মোড়াসা মাথায় সরু গলিটার মধ্যে নিজের নিজের গরীবখানায় ফিরে আসছে। একাগাড়িগুলো ঝাঁকানি দিতে দিতে পাথরের রাস্তায় খট্‌খট্‌ খটাস্‌ শব্দ করে আর ঝিন্‌-ঝিন্‌ ঘুঙুর বাজিয়ে কোতোয়ালী থেকে বেরিয়ে সোজা শহরের বাইরে চলেছে—টিক্‌টিকির মতো ঝোলা-অবস্থায় তরো-বেতরো সোয়ারি নিয়ে। সতীশদের বাড়ির সামনের বাড়ির লাল কাঠের একটা ছোটো বারাণ্ডায় একটা নাচনী নানা-রঙের ওড়না-ঘঘরায় যেন সবুজ টিয়া পাখিটি সেজে একটা গড়গড়ায় কেবলি টান দিচ্ছে; আর নীচে একটা পানওয়ালার দোকানে চাপকান চুড়িদার-লপেটা-পরা অনেকগুলো মাদ্রাসা থেকে ছুটি পাওয়া খান ও খানানের ভিড় জমেছে। রাস্তার ওধারে নবাবী-আমলের একটা ইমামবারা ধুলো আর সন্ধ্যার আলোর মাঝে একটা ঝাপ্‌সা রঙের গম্বুজ দিয়ে অনেকটা আকাশ ঢেকে রয়েছে। দূর থেকে একটা বিউগিল্‌ ভোঁ ভোঁ করে একটা একঘেয়ে বিজাতীয় সুর শহরের সব গোলমালের উপর ছড়িয়ে বাজতে লেগেছে। তুর্গামণি আপনার বাসার দোতলার গরাদে-দেওয়া জানলার ধারে বসে সতীশের আসার অপেক্ষা করছেন, এমন সময় সুধীর ওরফে ধীরানন্দ বা ধীরেন-বাবাজী এসে বললে—'মা. আপনার কি সমস্ত গোছানো হয়েছে? ও-পাড়ার সতীশবাবুরা স্টেশনে যাচ্ছেন। চলুন, আপনাকেও তাঁদের কাছে দিয়ে আসি।'

তুর্গামণি একটু অবাক হয়ে বললেন, 'আর আমার সতীশ এল না? তার সঙ্গে দেখা না করে—'

pathagar.net

সুধীর আলখাল্লার পকেট থেকে একটা চিরকুট কাগজ বার করে দুর্গামণির হাতে দিয়ে বললে—'পড়ে দেখুন, সতীশ কী লিখেছে।'

দুর্গামণি বললেন—'তুমি পড়ে শোনাও বাবা, আমি পড়তে পারিনে। সে ভালো আছে তো?'

সুধীর চিঠি পড়তে লাগল। চিঠির মর্মটা এই—

'মা, আমি বুঝেছি, তুমি কেন দেশে যাচ্ছ। স্থির জেনো আমি আর সংসার করব না। তোমার আদেশে আমি প্রথম-সংসার পেতেছিলেম—শুধু তোমার আদেশ বললে মিথ্যে বলা হয়, সেবারে আমারও একটু তাড়া ছিল সত্যি—কিন্তু বিধির ইচ্ছা অন্যরকম। তিনি আমাকে পাকে-চক্রে মুক্ত করে দিয়েছেন। এ কটা দিন যেন নভেলের কটা পরিচ্ছেদ উল্টে-পাল্টে পড়ে গিয়েছি। এখন স্বাধীনভাবে জীবনের আসল লক্ষ্য-সাধন করবার আমার সময় এসেছে, বুঝছি। আর গুরুদেবও এই কথা বলেন। সুতরাং তাঁরি আদেশ শিরোধার্য করে আমি কিছুদিনের জন্যে হিমালয়ের কোনো নির্জন বাসে সাধন-ভজন করতে চললেম। আমাকে ক্ষমা করো। এই আমার গুরু-ভাই ধীরানন্দ, ইনি তোমায় সতীশবাবুদের কাছে পৌঁছে দেবেন। সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ঠিক করে দিয়েছি। ইতি সেবাকাধম সতীশ।'

অত বড়ো চিঠিখানার মধ্যে কেবল হিমালয় আর সাধন-এই দুটি কথা দুর্গামণি বুঝলেন। আর বুঝলেন, তাঁকে দেশে যেতে হবে, সতীশ আসবে না। এমন করে সতীশ পালাবে, দুর্গামণি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তিনি আঁচলে চোখ মুছে চললেন। ধীরেন-বাবাজী পোঁটলা-পুঁটলি মুটের মাথায় চাপিয়ে একাগাড়ির পর্দাটা নামিয়ে দিয়ে সতীশের মাকে স্টেশনে ওঠাতে সঙ্গে চলল।

সতীশের স্বভাবটা বরাবরই কেমন-একটু বৈরিগী-গোছের। হঠাৎ কমলাকে দেখবামাত্র রূপের নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল; এবং কমলা আসা অবধি সতীশের বৈরাগ্য-বারিধি প্রেমবারিধি হয়ে একেবারে উছলে উঠেছিল এবং ক্রমেই সংসারের কূলের দিকে তার

মনের ঢেউগুলোও এগিয়ে আসছিল, এটা দুর্গামণি যেমন লক্ষ করেছিলেন, এমন আর কেউ নয়। কিন্তু আজ তাঁর লক্ষ্মী-বৌ কমলার চাঁদমুখটি সরে গেছে; সতীশকে নিয়ে তার বৈরাগ্য আর-একবার অকূলের দিকে ফেরবার উপক্রম করছে। ছেলের গলায় আর-একটি সংসার না ঝুলিয়ে দিলে সে পালাবে, এটা দুর্গামণি বুঝেই কমলার শূন্য আসনটি আর একটি লক্ষ্মী-বৌ দিয়ে ভর্তি করবার চেষ্টায় দেশের মুখে ছুটলেন—সতীশকে বোঝবার বা দেখবার অপেক্ষা না রেখেই।

ওদিকে সতীশ কমলা-সম্বন্ধে নিদারুণ চিঠিটা পেয়েও বিশ্বাস করেনি, কমলা এতটা করবে। সে মনে-মনে ব্যথা পাচ্ছিল, কিন্তু তবু এক-এক-সময় তার ভিতর থেকে কে যেন বলছিল—যা হবার তা তো হয়ে গেল; এখন আর কেন? বেরিয়ে পড়াই ভালো। সাধের বাঁধন যখন ছিল, তখন ছিল; কিন্তু এখন যখন সেটা আপনা হতেই খসল, তখন বুঝতে হবে সেটা গুরুকৃপা বলেই ঘটেছে; অতএব এই মহা সুযোগ; আর সংসারে ফেরা নয়। আবার মনে হয়, কমলা কি সত্যি দোষী? একটা বেনামী চিঠির উপরে নির্ভর করে তাকে চিরকালের মতো ভাসিয়ে দেওয়া কি উচিত হয়? এক-একবার সতীশ মনে করে, সবিশেষ তদন্ত করার জন্যে একবার তার কালীগাঁয়ে যাওয়াটা হিমালয় যাওয়ার চেয়ে বেশী দরকারি, কিন্তু তখনি মনে একটা ত্রাস জাগে—গুজবটা যদি সত্যি হয়।

সতীশ এমনি হিমালয় ও কালীগাঁ দুটোর মধ্যে দুলছে; আর একবার আফিস, একবার খালি বাসা, একবার গুরুর আখড়ায় যাতায়াত করছে।

ও-মার-আর গাড়ি পাঞ্জাব-মেলে রূপান্তরিত হয়ে দুর্গামণিকে বেলতলিতে নামিয়ে কলকাতায় পৌঁছে যাবার হপ্তাখানেক হয়ে গেলেও সতীশ-ছোকরা যেখানকার সেইখানেই রইল—এক-পাও হিমাচলের দিকে গেল না। কিন্তু মনটি তার মুক্তির জন্যে ধড়ফড় করছে, সেটা তার মুখ দেখেই আখড়া ও আফিসের সবাই বুঝলে।

ছুটিটা মঞ্জুর হয়ে এলে সতীশ কোন্ দিকে নড়বে—উত্তর-পূর্বে, না দক্ষিণ-পূর্বে সেটা নিয়ে তার পরিচিতদের মহলে বাজি খেলাও চলতে শুরু হয়ে গেল—সতীশের সামনে এবং আড়ালে।

●

সতীশ যখন এইরকম দোদুল্যমান অবস্থায়, সেই সময় এধারে অরুণ সকালে উঠে কমলার চিঠি বুকের পকেটে নিয়ে ক্ষিতীশের চায়ের টেবিলে এসে বসল। এ-আলাপ, সে-আলাপ, খবরের কাগজ, চায়ের পেয়ালা, সিগারেটের ধোঁয়া আর বাইরের গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি ও সার্সি-বন্ধ ঘরের ভ্যাপ্‌সা গরমের মধ্যে একসময় ক্ষিতীশ অরুণকে শুধোলে, 'এই বৃষ্টিতেই কি অরুণ দেশে যাবে ?' অরুণ ঘাড় নেড়ে বললে—'না, একবার সতীশের সঙ্গে দেখা করে তবে দেশে যাব।'

ক্ষিতীশ বলে উঠল—'লক্ষ্ণৌ যাবে নাকি ? সেখানে তো সতীশবাবু নেই। আমরা সেদিন খোঁজ নিয়ে এলেম, তিনি স্ত্রীর অসুখের ছুতো করে তাঁর মাকে নিয়ে জগদীশপুরে চলে গেছেন।'

অরুণ চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলে উঠল—'না, আমি জগদীশপুরে যাচ্ছি—সাতটা উনপঞ্চাশের গাড়িতে। দিদিকে একবার বলে আসি।'

কমলার সঙ্গে দেখা করে অরুণ ফিরে এল—একটা সিগারেট ধরিয়ে মুখে দিয়ে, আর গোটা-আষ্টেক মায় দেশালায়ের বাক্সটা ডোরাটানা টুইলের কোট্‌টার পকেটে ফেলে। হরেনকে বললে—'হরেনদা চললুম।' তারপর চটি-জুতোটা চটাস্-চটাস্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ক্ষিতীশ খানিক চুপ করে থেকে বললে—'অরুণ কি সতীশবাবুর দেখা পাবেন ?'

হরেন বললে—'পেতেও পারে।'

pathagar.net

ক্ষিতীশ খানিক অন্যমনস্ক থেকে বলে উঠল—'আমার কেমন মনে হচ্ছে, এ যাত্রায় অরুণও নিরাশ হবে।'

হরেন কোনো জবাব না দিয়ে আপনার মনে কী ভাবতে লাগল।

সকাল সাতটা উনপঞ্চাশের প্যাসেঞ্জার বেলা একটায় বেলতলিতে অরুণকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। অরুণ তার ব্যাগ আর ছাতাটা প্ল্যাটফর্মের শাদা কাঠের রেলিঙের গায়ে ঠেসিয়ে রেখে একখানা গাড়ির সন্ধান করতে ফটকের দিকে চলেছে, দেখলে, একদল যাত্রাওয়ালা স্টেশনের দুটো কেরাঞ্চি আর চারখানা গোরুর গাড়ি দখল করে কাগজের ফুল, সাজ-ঘরের তোরঙ্গ, হারমোনিয়াম বাক্স ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে ফ্লুট বাজাতে-বাজাতে পান চিবোতে-চিবোতে রৈ রৈ করে চলল। সব-শেষে অরুণের চেনা একটা মুটে দুটো এ্যাসেটিলেন গ্যাসের বাতি মাথায় করে যাচ্ছিল; সে অরুণকে ডেকে বললে—'কালীগাঁয়ে যাবে নাকি বাবু? দেন আমার হাতে ব্যাগটা। গাড়ি পাওয়া যাবে না।'

'জগদীশপুরে যেতে হবে।' বলে অরুণ মুটেকে ব্যাগটা দিয়ে বললে—'সতীশের বাসায় চল্।'

'সতীশবাবু তো নেই। বাসায় মাঠাকরুন একলা আছেন।' বলে মুটে হন্‌হন্ করে এগিয়ে চলল।

অরুণ একবার ভাবলে—তবে আর গিয়ে কী লাভ? আবার বললে—'তাই চল্; মা-দুর্গাকে দেখে না হয় কালীগাঁয়েই যাব একবার '

ভাদরের আকাশ মেঘলা হলেও বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। তার উপর সামনে যাত্রাওয়ালাদের চলতি গাড়িগুলো মেটে রাস্তায় বিষম ধুলো উড়িয়েছে। অরুণ একটার পর একটা সিগারেট পোড়াচ্ছে আর যাত্রার অধিকারীকে অভিশাপ দিতে দিতে চলেছে। তার মুটে সদর-রাস্তা ছেড়ে হাঁটা-পথে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যে গেছে, তার আর দেখা নেই। এমন সময় সামনের একখানা কেরাঞ্চি গাড়ি চাকা ভেঙে হঠাৎ রাস্তার মাঝে কাৎ হয়ে পড়ল।

pathagar.net

গাড়ির ছাদ থেকে গোটাকতক ফ্লুট ক্লারিওনেট আপনার-আপনার বাক্স ছেড়ে এবং গাড়ির মধ্যে থেকে নিজেদের আসন ছেড়ে গোটা-ছয়েক ছোকরা এবং আধা-বয়সী যাত্রার দলের বাবু পানের পিক্-মাখা সার্ট আর পম্‌সু নিয়ে ছিট্‌কে ধুলোয় পড়ল। অরুণ এই দুর্ঘটনার দিকে দৃকপাত না করে হন্‌হন্ করে সোজা বেরিয়ে গেল। তারপর আর-এক-সময়ে অরুণ দেখলে, রাস্তার ধারে আর-একটা ঠিকে-ঘোড়া যোত ছিঁড়ে কেবলি লাথ্ ছুঁড়ছে আর গাড়ির মধ্যেকার লোকগুলো কেবলি ঘোড়া আর গাড়োয়ান্‌কে গাল পাড়ছে ; কেউ বা গাও ধরেছে। এমনি নানা ঘটনার মাঝ দিয়ে, ধুলোয় আর ঘামে মিলিয়ে একটা আধ-শুক্‌নো আধ-ভিজে চেহারা নিয়ে অরুণ গ্রামে পৌঁছল—বেলা সাড়ে চারটেয়।

গ্রামের একটিমাত্র রাস্তা ; তারি দুধারে ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, পঞ্চাননতলা, ঠিকে-গাড়ির আস্তাবল, ইস্কুল-বাড়ি, ডাক্তার-খানা সমস্তই—মায় একটা চেরিটেবেল্ ডিস্পেনসারি—যেখানে কুইনাইনের বদলে ময়লা ময়দার গুঁড়ো দেওয়া হয় ; আর একটা 'জগদীশ হল ও পবলিক্ লাইব্রেরি এণ্ড ক্লব !' সেখানে প্রবন্ধ পাঠ, বারোয়ারি পুজো, করপোরেশন মিটিং, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গলায় মাল্যদান ও ওইদিন থিয়েটার যাত্রা বা বায়োস্কোপ স্ত্রীস্বাধীনতাও কখনো-কখনো হয়ে থাকে।

অরুণ তেতে-পুড়ে এই লাইব্রেরির গায়ে সতীশের বাড়ির সদর দরজায় এসে দেখলে তার মুটে দাঁড়িয়ে আছে। অরুণ একবার দরজাটায় নাড়া দিয়ে একটা হাঁক দিলে—'মা-দুর্গা ঘরে আছেন ?'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'তিন বার হেঁকেও যখন কারু সাড়া পেলে না, তখন মুটের দিকে চেয়ে অরুণ বললে—'তুই যে বললি, মা ঘরে আছেন ?'

মুটের উত্তর হল—'আছেন, কিন্তু সকাল থেকে জ্বরে বেহোঁস !'

pathagar.net

'এতক্ষণ বলতে হয় রে গাধা।' বলে অরুণ দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে, বাড়ির মধ্যে দাওয়ার উপরে ব্যাগটা রেখে, ভাড়ার পয়সা মুটের হাতে দিয়ে, লোকটাকে একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে পাঠিয়ে ঘরে ঢুকল।

অন্ধকার ছোটো ঘরটির মধ্যে দুর্গামণি শুয়েছিলেন। অরুণ গিয়ে আস্তে-আস্তে তাঁর পায়ে হাত দিতে চম্‌কে উঠে দুর্গামণি বলে উঠলেন—'কে সতীশ?'

অরুণ তাঁর কাছে সরে বসে বসলেন—'সতীশ তো নয়, আমি এসেছি, মা-দুর্গা।'

'অরুণ।'—বলে দুর্গামণি তাঁর রোগা হাতছানি অরুণের কোলে ফেলে শুধোলেন—'বাড়ির সব ভালো? আমার—'বলেই সতীশের মা চুপ করলেন। একফোঁটা জল চোখের কোণে গড়িয়ে এল।

অরুণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'তোমার বৌমা ভালো আছেন. ভেবোনা। গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল; হরেনদাদা ছাখে—রাস্তায় বসে কাঁদছে। সে আর তার বন্ধু ক্ষিতীশ তাকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে তাকে ভয়ানক অসুখ থেকে বাঁচিয়েছে।'

দুর্গামণি অরুণের দিকে চেয়ে শুধোলেন—'এখন বৌমা?'

'এখন দিদি আমারি কাছে আছে।' বলেই অরুণ চাদরে একবার নিজের মুখটা বেশ করে মুছে নিলে।

দুর্গামণি একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে সে গুজবটা?'

'সবই মিথ্যা!' বলেই চট করে অরুণ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—'আমি একবার বাইরে দেখি, ডাক্তার এল বুঝি।'

দুর্গামণির সামনে বসে থাকা আর নিরাপদ নয় বুঝে অরুণ ডাক্তারকে সঙ্গে করে তবে ঘরে ঢুকল এবার। ডাক্তারের মুখে অরুণ শুনলে, দুর্গামণির টাইফয়েড; কেউ নর্স না করলে চলবে না। এটুকুও ডাক্তার বললেন যে একটু দুর্নামের দরুণ পাড়ার মেয়েরা কেউ এঁর সেবা করতে রাজি নয়। ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়ে

অরুণ বলে উঠল—'সে কথা থাক। আজ রাতটার মতো আপনি আপনার হিন্দুস্থানী দাসীটাকে এঁর কাছে পাঠিয়ে দিন আমি আজই কলকাতা থেকে নর্স আনতে চললুম। আমার আসা পর্যন্ত আপনি এঁকে দেখবেন কিনা বলুন?'

'নিশ্চয় দেখব।' বলে ডাক্তার চলে গেলেন।

ডাক্তারকে বিদায় করে অরুণ দুর্গামণির কাছে এসে বললে—'মা, সতীশের ঠিকানাটা কী? তাকে তার করতে হবে।'

দুর্গামণি বললেন—'সে তো তার পাবেনা: বিবাগী হয়ে কোথায় হিমালয় গেছে।'

অরুণ বললে—'তবে উপায়? আমি তোমার জন্যে কলকাতা থেকে নর্স আনিগে।'

নর্সের কথা শুনেই দুর্গামণি ভুরু কুঁচকে বললেন—'না, না, নর্স কাজ নেই। তোরা কেউ—'

অরুণ দুর্গামণির মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুধোলে—'দিদিকে আনব মা-দুর্গা?'

'সেই ভালো।' বলে দুর্গামণি চোখ বন্ধ করে আস্তে বললেন—'বৌমাকে বলিস, আমি গুজব-কথা, বেনামী-চিঠিতে একটুও বিশ্বাস করিনি, করবও না। সতীলক্ষ্মী আমার বৌ।'

অরুণের চোখ ছল্-ছল্ করে এল। সেই সময় ডাক্তারের দাসী রামদাসিয়া এসে উপস্থিত দেখে অরুণ বললে—'আজ রাতের মতো এই দাসীটাকে তোমার কাছে রেখে যাই; কাল দিদিকে এনে দিচ্ছি। আমার ব্যাগটা এইখানেই রইল।'

দুর্গামণির পায়ের ধুলো নিয়ে অরুণ বেরোবে, দুর্গামণি রামদাসিয়াকে বললেন—'ও ঘরে বাতাসা আর ডাব আছে, অরুণকে খেয়ে যেতে বল্।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অরুণ দু-খানা বাতাসা চিবিয়ে ডাবের সমস্তটা গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে সোজা আবার স্টেশনের দিকে চলল।

pathagar.net

পাবলিক লাইব্রেরির কাছটায় অরুণের বন্ধু যতীন একটা এসেটি-লিনের হাঁড়া খাটাতে ব্যস্ত ছিল ; অরুণকে দেখে বলে উঠল—'কীরে কোথায় চলেছিস্? শুক্‌নো দেখি যে। খবর কী? পড়াশুনা চলছে কেমন ? আজ রাতে বারোয়ারি পুজো ; যাত্রা হবে ; আসিস্ —বুঝলি।' এমনি নানা প্রশ্নের অরুণ একটি-মাত্র উত্তর দিয়ে গেল —'মা-তুর্গার বড়ো অসুখ।'

pathagar.net

আলো-আঁধারে

১

যে-কালের কথা বলছি, সেকালের সঙ্গে আজকের এই তফাৎটা নজরে পড়ছে ; এ চৌরাস্তাটার ঐ-কোণে সমাজ-বাড়িটা তখন আশপাশের চেয়ে আয়তনে বিষম ফেঁপে উঠে আমার এই ছোটো ঘরটার মধ্যেকার অন্ধকার দূর করবার পথটুকু একেবারে বন্ধ করেনি ; রাস্তার দুসারি বাসা-বাড়িগুলোর সঙ্গে সে-সময়ে লম্বাই-চওড়াই রং-ঢং কোনো দিক দিয়েই ঐ সমাজ-বাড়িটা ভিন্ন ছিল না ; আর ওর ভিতরকার মতভেদটাও তখন এতটা সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি—ওই বাজ-পড়া শিক-বসানো চূড়োটার মতো। ডাইনে বাঁয়ে বিলিতি-মাটির সরু দাওয়া. তার মাঝে খুব নীচু গেরিমাটির রং-লেপা সদর-দরজাটি, তারই মাঝ দিয়ে তখন ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা, আচার্য-উপাচার্য, এমন-কী হিন্দু-আমরাও আনাগোনা করতেম ; আর কখনো-কখনো খুব গরমের দিনে সদর-দরজার উপরের সরু একটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো যুবক-যুবতী এক-সঙ্গে চায়ের পেয়ালা হাতে, কলেজের অব্রাহ্ম ছাত্র ও পাড়ার হিন্দু প্রতিবেশীদের কাছে উন্নতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতার সজীব দৃষ্টান্ত প্রচার করতেম। ঠিক ঐ সমাজ-বাড়িটার সামনেই সাবেকী যে মস্ত বাড়িটা দেখা যায়, সেটা ভেঙে পড়েছে ; কিন্তু আজও হুজুগের মুখে লাখ-দুলাখ টাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে না। সেইখানে থাকত, যে-মেয়েটির কথা বলব— সে আর ঐ চৌমাথার মোড়েই যে-বাড়িটার চিহ্নও দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা সেইখানে থাকত শ্যামাচরণ। এ ছাড়া পাড়ার অনেক আইবুড়ো মেয়ে, বিয়ের যোগ্য ছেলেরও অভাব ছিল না, যারা ঐ

pathagar.net

ব্রাহ্ম-সমাজের ঘরে-বাইরে ছুটির দিনে উন্নতদলের আচার্য-উপাচার্যদের ওখানে চা-পার্টিতে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলন-সভায় এসে যোগ না দিত। এ বিষয়ে শ্যামাচরণও বাদ যায়নি। উপাচার্যের মেয়ে মিনির সঙ্গে শ্যামাচরণের আলাপ-পরিচয় বেশ জমে উঠেছিল—যদিও শ্যামাচরণ নামে যেমন, আসলেও তেমনি ঘোরতর শাক্ত এক বাঙাল-জমিদারের একটি ছেলে। অবশ্য নব-ধর্মে দীক্ষা না নিলে মিনিকে পাওয়া শ্যামাচরণের শক্ত, যদিও সে সবদিক দিয়ে মিনির যোগ্য। কাজেই শ্যামাচরণ শীঘ্র দীক্ষা নেবেই—এইটে আমরা আশা করেছিলাম।

সেই সময়ে একদিন, মনে নেই পূব-অঞ্চলের কোন্ গ্রাম থেকে শ্রীমতী মালতীলতা এসে ঐ মস্ত বাড়িটায় দেখা দিলেন। আর তার কিছুদিন পরেই শ্যামাচরণের মুখেই শুনলেম, তাঁরা হিন্দু; কিন্তু চাল-চলন আশ্চর্য-রকম স্বাধীন-উন্নত-ধরনের। একদিন চোখেও তাঁকে দেখলেম :—পাড়ার নত, উন্নত সুন্দরী ও সুরূপা যতগুলি ছিল, কেউ লাগল না মালতীর কাছে। আর ঠিক তারই জোড়া দেখলেম আমাদের শ্যামাচরণ। কেবল একটি বিষয়ে শ্যামাচরণের সঙ্গে মালতীর মিল হল না। মালতী এসেই ব্রাহ্মসমাজের সব-কটা উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করলে, আর আমার বন্ধু তখন থেকে ঠিক তার উল্টো সুর ধরে ছিপ, বন্দুক, কুস্তি, যাত্রা—ফুটবল তখন ছিল না—এমনি সব অত্যন্ত অনিত্য জিনিস নিয়ে দিন কাটাতে লাগল।

মালতীর বাড়িতে নিত্য উপাসনার সঙ্গে উপাচার্য-আচার্য ভাই-ভগিনীদের যাতায়াত ক্রমেই বাড়ছে; প্রায়ই নিমন্ত্রণ হয়; আমিও বাদ যাইনে, শ্যামাচরণও নয়; আমি যাই, কিন্তু শ্যামাচরণ যায় দরজা পর্যন্ত, তারপর নয়। অথচ অন্যদিন দেখছি, শ্যামাচরণ কলেজে যাবার সময় মস্ত বাড়িটায় ঢুকল, একটা বন্ধ-গাড়ি চড়ে মালতীর সঙ্গে কালীঘাটের দিকে চলে গেল; কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি তখন বন্ধু বাসায় ফেরেনি। এটা যে আমিই লক্ষ্য

pathagar.net

করেছিলুম তা নয়। তখনকার দিনের সেই ছোটোখাটো ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নত দলটিও, খুব উপর থেকে বাজ-পাখির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে এই পিতৃ-মাতৃ-হীনা স্বাধীনা জমিদার-কন্যা ও শাক্তবংশীয় তার একান্ত অনুগত ভক্তটিতে বেশ করে বুঝে নেবার চেষ্টা করছিল। মালতী ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যাতায়াত করছে; স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে হিঁদুয়ানির আগড়টা সে বেশ সহজে খুলে বেরিয়ে এসেছে—অন্দর পেরিয়ে অনেকখানি; বেশ বোঝা যাচ্ছে তার চোখ একটা যেন নতুন আলোর মুখে মুগ্ধভাবে চেয়ে রয়েছে—দিন রাত; যেন কী-একটা পাবার জন্যে তার মধ্যে ব্যাকুলতার অন্ত নেই। বাইরেটা যেমন, তেমনি অন্তরটাও তার যেন মুক্তির মাঝে ফুটে-ওঠার চেষ্টায় ছোটো পাখির সবে-ওঠা ডানাদুটির মতো আবেগে থরথর করে কাঁপছে; অথচ এও দেখছি নবধর্মে দীক্ষা না নিয়ে উন্নতসমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে কালীঘাটে যাওয়া-আসা করছে মালতী—তাও আবার ঐ ভিতরে-বাইরে সম্পূর্ণ হিঁদু কিন্তু সম্পূর্ণ উদার এবং মিনির বিষয়ে উদাসীন না হলেও ব্রাহ্ম এবং তাদের সমাজ ও ধর্মবিষয়ে সহসা একেবারেই বিমুখ শ্যামাচরণের সঙ্গে। এটা উন্নতসমাজের আচার্য উপাচার্য থেকে আরম্ভ করে মিনির পর্যন্ত ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল।

এখানে যখন এই অবস্থা, ঠিক সেই সময় একদিন, সমাজের প্রধান-প্রচারক, বুড়ুলী-গ্রামে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও সেই সঙ্গে বুড়ুলী থেকে একশো ক্রোশের মধ্যে যে যেখানে ছিল সবাইকে—স্ত্রী-পুরুষ ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে—মায় বুড়ুলীর জমিদারের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলেটিকে পর্যন্ত নবধর্মে দীক্ষিত করে, সদর সমাজে এসে দর্শন দিলেন। বলা বাহুল্য, মালতীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হল। প্রথম দিনেই প্রচারক বুঝলেন, যে-মহাবাণী তিনি প্রচার করতে চান, সেটি সমস্ত হৃদয় দিয়ে যদি কেউ ধারণ করতে পারে তো সে মালতী। এবং উন্নতসমাজের দল-বলেরাও বুঝলে মালতীকে পূর্ণ জ্ঞানালোকে যদি কেউ আনতে পারে তো সে তাদেরই প্রচারক-মহাশয়।

pathagar.net

সেদিন রবিবারে প্রধান-প্রচারকের বক্তৃতার জন্য একটা বিশেষ-নিমন্ত্রণ নিয়ে উপাচার্য মালতীর ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমি আর শ্যামাচরণ তখন সেখানে বসে চা খাচ্ছি। উপাচার্য নিমন্ত্রণ দিতেই মালতী খুব উৎসাহের সঙ্গে বললে—'যাব নিশ্চয়ই, যতবার তাঁর বক্তৃতা হবে আমাকে বলতে ভুলবেন না। এঁদেরও বলে যান, ওঁরাও যাবেন।'

শ্যামাচরণ আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু মালতী বাধা দিয়ে বললে—'না, না, যেতেই হবে, আমার বিশেষ অনুরোধ।'

বন্ধু বিনা-আপত্তিতে নিমন্ত্রণ নিলেন। উপাচার্য আমাকেও ঐ সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানিয়ে চলে যেতে-যেতে হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে মালতীকে কাছে ডেকে বললেন—'সেদিন প্রচারক-মশায় অনেককে দীক্ষা দেবেন, সেই সঙ্গে মা তোমারও দীক্ষাটা—'

'সে পরে হবে। আমি অত লোকের মাঝে দীক্ষা নিতে পারব না। আমি যখন দরকার বুঝব দীক্ষা নেব।'

'করুণাময় পিতায় চরণতলে তোমাকে যেন শীঘ্র দেখতে পাই!' বলে উপাচার্য বিদায় হতেই শ্যামাচরণ হোহো-করে খুব খানিকটা হেসে উঠল। আমি দেখলেম লজ্জায় মালতীর কানদুটো রাঙা হয়ে উঠেছে, সে আস্তে-আস্তে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে—'উনি তো যাবেন না, আপনাকে আজ সন্ধ্যার সময় আমাকে নিয়ে সমাজে যেতে হবে।'

শ্যামাচরণ হঠাৎ চৌকি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—'আমি তো বলিনি যাব না। যাব। তুমি ঠিক সময় প্রস্তুত থেকো।'

ডাগর চোখদুটিতে অনেকখানি বিস্ময় নিয়ে মালতী একবার বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখলে। কৌতুক কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা তিন মিলে একটা যেন বিদ্যুৎ ঘরের মধ্যে খেলে গেল। আমি চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বিদায় হলেম।

pathagar.net

২

সন্ধ্যার পূর্বেই আমি মালতীর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখলেম মিনিও এসেছে—মালতীকে নিতে। কিন্তু শ্যামাচরণ অন্যদিনের মতো সেদিনও ফাঁকি দিলে। সে যে এতটা অভদ্রতা করতে পারে তা আমার বিশ্বাস ছিল না। আমার ভারি রাগ হল কিন্তু মালতী দেখলেম বেশ সহজে শ্যামাচরণের না-আসার একটা কারণ আবিষ্কার করে নিয়ে মিনিকে ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে সমাজ-বাড়িটায় গিয়ে উপস্থিত হল এবং প্রচারকের বক্তৃতা খুব মন দিয়ে শুনে বাড়ি ফিরে এল।

প্রায় একমাস ধরে সমাজ-বাড়িতে প্রচারকের প্রচার চলেছে। দিনের পর দিন প্রতি-সন্ধ্যায় মালতীকে দেখতেম বেদীর ডান-পাশে তার বাঁধা জায়গাটিতে বসে উপদেশ শুনছে। প্রায় সবাইকে দেখতেম মাটির দিকে চোখ নামিয়ে রয়েছে, কেবল মালতী—সে যেন তার ডাগর চোখের সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে প্রচারকের বুকের ভেতর যে-ভাব গুম্‌রে উঠছে তা পর্যন্ত ধরতে চাচ্ছে। এক-একবার মনে হত তার দৃষ্টি এই সমাজ-বাড়ির দেওয়াল পর্যন্ত ভেদ করে এক স্বর্গলোকের সন্ধান করে করে দূর সুদূরে চলে গেছে। প্রচারকের বক্তৃতায় শহর তখন টলমল! আমি যে আমি—আমিও একদিন দীক্ষা নিয়ে নিলেম। কাজেই কালীঘাট ছিপ ও বন্দুক-ভক্ত শ্যামাচরণের কাছ থেকে তার মালতীকে যে এরা একদিন সরিয়ে নিয়ে সমাজের মধ্যে টেনে নেবে তাতে আমার একটুও সন্দেহ রইল না। উল্টে বরং মনে হত ধর্ম-বিশ্বাসে দুজনের যখন কিছুতেই মিল হবে না তখন দুজনের কাছ থেকে সরাই ভালো। কিন্তু এক-জায়গায় আমার গোলমাল ঠেকত। ঐ মিনি, সেও তো ব্রাহ্মমেয়ে, শ্যামাচরণের সঙ্গে তারও তো ধর্মগত তফাৎ অনেকখানি, তবু কেমন করে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাদের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতা

pathagar.net

চলছিল—সব জেনেও ? বাস্তবিক বলছি, আমার বন্ধুর উপর একটা অশ্রদ্ধা তখন মনের এককোণে আমি পুষছিলেম ; এবং প্রার্থনা করছিলেম মালতী যেন ওই কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকটার হাতে না পড়ে। পরমপিতার কাছে নিজের জন্যে করুণা-ভিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে মালতী যে শ্যামাচরণেরও জন্যে একটুখানি প্রার্থনা জানাতে পারে—বেদীর পাশে তার নিজের আসনটিতে বসে, সেটা আমার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু হয়তো শ্যামাচরণ সেটা কোনো অদ্ভুত শক্তিতে জেনেছিল, কাজেই সে মালতীর ভালোবাসার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে আনন্দে বাস করছিল—একেবারে নির্ভর। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রচারক, তিনিও হয়তো সে-রহস্যটা ধরেছিলেন ; আর সেইজন্যে তাঁর সমস্ত শক্তি ও একটা প্রকাণ্ড আহ্বান নিয়ে তিনি এই দিনের পর দিন এসে দাঁড়াতে লাগলেন। —একমাত্র যেন মালতীর জন্যেই সেই ব্রহ্মমন্দিরে তাঁর প্রচার চলেছে—এইটেই আমার বোধ হত।

জানিনে এই আহ্বান মালতীর মনে গিয়ে পৌঁছবে কিনা, কিন্তু যেদিন পৌঁছবে সেদিন—শ্যামাচরণের পাঙাস মুখটাই আমার চোখের উপরে ভেসে উঠত। আর আমি যেন শুনতেম সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ—ছেলেবুড়ো-মেয়ে ঐ এতটুকু মালতী লতাকে উদ্দেশ করে বলছে—'এসো অন্ধকার থেকে আলোয়। পিতা কোল পেতে দাঁড়িয়ে আছেন, একটি পা এগোও, ঝাঁপিয়ে পড়ো কৃপাময়ের চরণ-তলে! আসবে না ? ফিরবে না সেদিকে, যেদিক থেকে আলো আনছে তাঁর সংবাদ, বাতাস বইছে তাঁর বাণী ? যাত্রী চলবে না সেই অনন্ত-ধামের দিকে ? পাপী ফিরবে না সেই পাপহারী পবিত্র আশ্রমে ? দেখছ না পিতা চেয়ে রয়েছেন!'

সে এক রবিবার, এমনি একটা বক্তৃতা, উৎসাহ আর উন্মাদনার মুখে আমি দেখলেম মালতী ভেসে গেল। একটা অদ্ভুত আকর্ষণে সে উঠে গিয়ে বেদীর উপরে প্রচারকের পায়ের তলায় গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। এটা আমি চক্ষে দেখলেম। আর খুব স্পষ্ট করে শুনলেম যা, তা বলি। প্রচারক মন্দিরের ছাতের দিকে দুই হাত

pathagar.net

তুলে বললেন—'ধন্য জগদীশ তুমি। ধন্য তোমার করুণা! অসীম তোমার শক্তিঃ শান্তি। শান্তিঃ!'

দু-তিন জন ধরাধরি করে মালতীকে বাইরে নিয়ে গেল। মহা-উৎসাহে ধর্মসংগীত চলল। ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সবাই—যার সুর আছে সেও, যার সুর নাই সেও, গানে যোগ দিলে। বেসুরো বেতালা হলেও সেদিন আমার মনে সবটা খুব গম্ভীর শোনাল। প্রাণেশ্বর, প্রিয়তম, হৃদয়নাথ, বন্ধু, প্রাণনাথ, সখা—এম্‌নি সব কথা-গুলোকে খুব খানিক টেনে-টেনে কখনো কান্না, কখনো মিনতি—এমনি নানাভাবের জালের মধ্যে বুনে-বুনে টানা একটা লম্বা বক্তৃতা হল যা, তা বলবার নয়। আর্গিন-যন্ত্রের প্যাঁচ কসে দিলে যেমন আপনি তা থেকে নানারকম সুর-সার বার হতে থাকে, তেমনি কেউ করতে থাকল অনুতাপ, কেউ চাইতে লাগল পরিত্রাণ। এ বলে—'উদ্ধার করো!' ও বলে—'শান্তি, শান্তি!' হঠাৎ কোনো ভক্ত দাঁড়িয়ে উঠে আকাশের দিকে চোখ তুলে কাতরস্বরে ডাক দিতে থাকল—'প্রভু, প্রভু, আমি সন্দিহান! আমার সংশয় দূর করো, আমাকে পথ দেখাও, আলো দাও প্রভু আলো দাও।' কেউ বা দশা-পেয়ে গুম্‌রে-গুম্‌রে কাঁদতে থাকল। 'প্রভু, প্রভু, চরণে স্থান দাও!'—ব'লে আমারি পানে একজন বুড়ো ঝুঁকে পড়ে কেবলি মাটি হাতড়াচ্ছে দেখলেম। প্রধান-আচার্য এতক্ষণ কী একটা যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একেবারে সপ্তমে শুরু করলেন ধর্মসংগীত—

> তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি ধাতা,—
> আমাদের পার করো হে—
> তোমার ধর্ম-তরী ভরিভরি
> পাপীদের পার করো হে—
> ধর্মতরী-ই-ই
> আমাদের ধর্মতরী ভরি ভরি
> ধর্মতরী-ই-ই-ঈ

pathagar.net

খুব টানা হ্রস্ব-ইকার থেকে আরম্ভ করে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘঈকারে গিয়ে গান শেষ হল। দেখলাম তাওয়ার উপরে কতকটা বালির তাত পেয়ে খৈগুলো যেমন একটার পর একটা ক্রমাগত ফুটে উঠতে থাকে, তেমনি সংগীত আর বক্তৃতার উত্তাপ পেয়ে একটির পর একটি এমন কত যে পাপী, তাপী, অনুতাপী আমার চারিদিকে সেদিন ফুটে উঠল তার সংখ্যা নেই। আমার এক-একবার মনে হতে লাগল, বুঝি আমিই একমাত্র জগতের মধ্যে একটি সাধু বেঁচে আছি!

সভা-ভঙ্গের পরে প্রচারক স্বয়ং এবং আরো দুচারজন কাঁচা-বয়সের ব্রাহ্মভ্রাতা-ভগিনী মালতীকে ঘিরে রাস্তার ওপারের মস্ত বাড়িটায় পৌঁছে দিলেন। আমি আর সেদিন আমল পেলেম না। আর শ্যামাচরণ, সে যখন আমার মুখে শুনলে আজকের সমাজের কাণ্ডটা, তখন হো-হো-করে খানিকটা হেসে বললে—'গেলে তো হত আমারও!' আমি রেগে বললেম—'মালতীকে আমি বুঝতে পারি, কিন্তু তুই যে কী, তা আমি আজও ঠিক করতে পারলাম না। তুই বেরো!' শ্যামাচরণ হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনার পরদিন ভোরে মালতীর বুড়ো চাকর এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বললে - 'আপনাকে আর শ্যামবাবুকে একবার ওখানে যেতে হবে। দিদিমণির শরীর ভালো নেই।' আমি তাড়াতাড়ি শ্যামাচরণকে ডাক দিতে ছুটলেম। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর শ্যামাচরণের বাসার ঝিটা ঘুম ভেঙে চোখ মুছতে মুছতে এসে বললেন 'বাবু তো কাল রাতের গাড়িতেই চলে গেছে!' কোথায় যে গেছে শ্যামাচরণ, তা কেউ জানে না। মালতীর বাড়িতে ঢুকছি, দেখলেম প্রচারক বেরিয়ে আসছেন। আমার কেমন ভয় হল, শুধোলেম—'মালতীর খবর ভালো তো?' প্রচারক সোনার চশমাজোড়াটা সিল্কের চাদরে মুছতে-মুছতে গম্ভীরভাবে বললেন,—'শরীর মন্দ নেই কিন্তু মনটা এখন সম্পূর্ণ ওলট-পালট অবস্থায় রয়েছে। মিনির সঙ্গে ওঁকে আমি কিছুদিন কার্সিয়াং পাহাড়ে আমাদের ব্রহ্মাবাসে

কাটিয়ে আসতে উপদেশ দিয়েছি। ওঁরও ইচ্ছা দেখলেম সেইখানেই গিয়ে দীক্ষা নেওয়া। আপনার সঙ্গে শ্যামবাবু নেই যে?' লোকটার চোখ-মুখের মোড়লি-আনা ভঙ্গী এবং শ্যামাচরণের সম্বন্ধে প্রশ্নের ধরনটা আমার মোটেই ভালো লাগল না। আমি কোনো জবাব না দিয়ে সোজা উপরে উঠে গেলাম। মালতীর কাছে মিনি বসে ছিল, আমি যেতেই দুজনে বলে উঠল—'আপনাকে আর শ্যামবাবুকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

আমি হেসে বললেম—'কার্সিয়াং পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত যেতে পারি, তার উপর নয়।' 'আর শ্যামবাবু?'—বলেই মিনি আমার দিকে একবার কটাক্ষ করলে।

শ্যামাচরণ রাত থেকে অদৃশ্য শুনে মিনি একটু মন-মরা হল, কিন্তু মালতী দেখলেম বেশ সহজ সুরে বললে—'আপনি তো আমাদের সঙ্গে আসবেন, তা হলেই হল।'

কী জানি হঠাৎ কী কারণে মিনি তার মত বদলালে। স্টেশনে যাবার ঘণ্টাখানেক আগে তার ছোটো ভাই এসে বলে গেল—'মিনির কলেজের পড়ার ব্যাঘাত হবে, তাই সে এখন পাহাড়ে যেতে পারবে না।' কাজেই একা মালতীর সঙ্গে আমি রওনা হলেম। যাবার পূর্বে শ্যামাচরণের বাসায় আর-একবার খোঁজ নিয়ে জানলেম, তখনও সে ফেরেনি, বোধহয় ফিরবে না শীঘ্র, কেননা কাপড়-চোপড় নিয়ে গেছে।

৩

পাহাড়-অঞ্চলে আমরা দুজনেই প্রথম যাত্রী, কাজেই বিছানা-পত্র প্যাঁটরা-বাক্স ইত্যাদি ছাড়া আর-কোনো-কিছু পদার্থ উপার পর্যন্ত আমার মাথায় একেবারেই ঢুকতে পারেনি। জিনিসপত্রগুলো একবার জাহাজে তোলা, গাড়িতে ওঠানো, আবার সেখান থেকে অন্য গাড়িতে চালান দেওয়া এবং নিজেকে ও মালতীকে সামলে

pathagar.net

চলা—এম্‌নি নানা গোলযোগের মধ্যে দিয়ে চলে আমার মনটা এমন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল যে, মেঘের উপরে অনেক হাজার ফুট কেমন করে যে উঠে এলেম তা দেখবার অবকাশ মোটেই পাইনি। হঠাৎ একসময় মেঘ আর বৃষ্টির মাঝে টিনের ছাত আর কাঁচ আর ভিজে-ভিজে কালো তক্তা-মোড়া একটা বাজারের ধারে অত্যন্ত স্যাঁৎসেতে ও অত্যন্ত ছোটো অন্ধকার একটা জায়গায় নেমে দেখলেম, বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা কার্সিয়াং—অর্থাৎ সেকালের কার্সিয়াং! এই মেঘ আর অন্ধকারের মধ্যে ব্রহ্মাবাসটা খুঁজে নিতে হবে ভাবছি, মালতী একখানা লাল শাল মুড়ি দিয়ে একটা বাক্‌সের উপরে বসে মস্ত একটা ধোঁয়া আর কুয়াশার দিকে চেয়ে আছে, এমন সময় একখানা ট্রলি আর তার উপরে দু-চারটে বন্দুকধারী কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ ষ্টেশনে এসে ঢুকল। তারপরেই শ্যামাচরণের গলা পেলুম—'এ কুলি চ'লাও জলদি!' 'শাম যে!' —বলেই আমি মালতীকে জিনিসগুলো একটু আগলে থাকতে বলে যেখানে ট্রলিটা লেগেছিল সেদিকে দৌড়লেম। ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে একটি ওয়াটার-প্রুফ মুড়ি দিয়ে দু-তিন জন কুলি আর শিকারীর সাহায্যে মস্ত একটা মরা বাঘ গাড়িটা থেকে নামাচ্ছে—আমাদের শ্যামাচরণ। 'কী হে!—বলে তার পিঠে একটা থাবড়া বসাতেই শ্যামাচরণ কট্‌মট্‌ করে আমার দিকে চেয়েই তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'একী! তুমি এখানে একা না কি?' আমি দুটো আঙুল তার নাকের সামনে উঠিয়ে বললেম—'দুজন। কিন্তু জিনিসপত্র অনেক, তাই মালতী সেগুলো ওখানে বসে আগলাচ্ছে!' শ্যামাচরণ ঠোঁট ফুলিয়ে বললে—'আমাকে তো আগে খবর দিলেই হত! হঠাৎ এরকম করে অচেনা জায়গায় আসাটা তো ভালো হয়নি! বাসা ঠিক হয়েছে তো? চলো, চলো, দেখি!' বলেই মরা বাঘটা কুলিদের জিম্মায় রেখে শ্যামাচরণ আমাকে টানতে-টানতে মালতী যেখানে একটি লাল পুঁটুলি মতো নানা রঙের সতরঞ্চ-জড়ানো বিছানাপত্রের মধ্যে বসে আছে একেবারে সেখানে উপস্থিত

pathagar.net

হয়ে বললে—'আসুন, ওয়েটিং রুমে কিছু খেয়ে নেবেন।' কুলির সর্দার এসে আমাদের জিনিসপত্র খালাস করবার, চালান করবার ডাণ্ডি ডেকে আমাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেবার সব ভার নিজের কাঁধে নিয়ে শ্যামাচরণের দিকে মস্ত একটা সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। আমি হাঁপ্ ছেড়ে একটা চুরুট ধরাতে সময় পেলেম। আর ঠিক সেই সময় কুয়াশাও কেটে সামনের পাহাড়ে আলো এসে পড়ল—জলে-ধোয়া চমৎকার দিনের পরিষ্কার আলো।

মালতী বলে উঠল—'আঃ, আলো পেয়ে বাঁচা গেল!'

আমরা কজন ওয়েটিং রুমে ঢুকছি এমন সময় চশমা-চোখে কালো বনাতের কোটপরা এক ভদ্রলোক কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া দাড়ির মধ্যে থেকে খানিকটা উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে—'মশায়রা কি কলকাতা হইতে আইছেন? ওনার নাম কি মালতী?'

শ্যামাচরণ খানিক ভুরু কুঁচ্‌কে বললে—'আপনি?'

লোকটা একটা ময়লা রুমালে মুখ মুছে বললে—'আমি এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি, শ্রীমতী মালতীকে লইতে আইলাম।'

শ্যামাচরণ একবার মালতীর দিকে চাইলে। মালতী অমনি এগিয়ে এসে সে লোকটাকে বললে—'আমার নাম মালতী, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বাড়িতে থাকতে আমার ইচ্ছা নেই, এখানে অন্য বাড়ি কি পাওয়া যাবে?'

'বাড়ি তো পাওয়া মুস্কিল!' বলে লোকটা আর-একবার ময়লা রুমালটা মুখে ঘসতে লাগল। আমি শ্যামাচরণের দিকে ফিরে বললেম—'উপায় কী?' খানিক ভেবে শ্যামাচরণ বললে—'আমাদের এখানে একটা ছোটোখাটো বাড়ি আছে, একটু দূরে, প্রায় বনের মধ্যে, বড়োই নির্জন। সেটায় যদি সুবিধে হয় তো থাকতে পারো, আমি তো আজই নেমে চললেম।'

বলা বাহুল্য আমরা শ্যামাচরণের পরিষ্কার ছোটোখাটো বাংলাটাতে

pathagar.net

গিয়েই উঠলেম। শ্যামাচরণের শিকার-করা বাঘটা কলকাতায় নেমে গেল; কিন্তু শ্যামাচরণ নিজে আর তার পকেটের মস্ত-একটা বাঘের নখওলা চেনে-লটকানো ঘড়িটা ঠিক নিয়মিত সময়ে আমাদের খাওয়া বেড়ানো যাতে হয় সেইজন্যে রয়ে গেল কার্সিয়াং পাহাড়ে—আলোয়-অন্ধকারে দিনে-রাতে শীতে-গরমে! তারপর আষাঢ় মাসে পাঁজিতে ছাপানো শুভ-বিবাহের এক প্রশস্ত দিনে সানাইয়ের সুরেভরা রোশ-নাইকরা গোধূলিতে আমি তাদের দুজনকে নামিয়ে আনলেম। আর মিনি? সে—

pathagar.net

বিশ্বকর্মা পাকা কারিগর—এতকাল জীবন্ত মাটি, এক আঁজলা জীবন্ত জল নিয়ে কী একটা গড়বার উদ্যোগ করছিলেন, হঠাৎ ইন্দ্রের জন্যে মেঘের রথ আর বাজ গড়বার ডাক পড়ল। তিনি কারখানা ছেড়ে নন্দনবনের দিকে ছুটলেন চতুর্মুখের হাতে স্টুডিয়োর চাবি দিয়ে।

সুচতুর চতুর্মুখ সৃষ্টকর্ম তখন একটু একটু শিখেছেন, কাজে উৎসাহ খুব—পৃথিবী গড়বার কল্পনা মাথায় এল চতুর্মুখের। হাতের কাছে জীবন্ত জল ছিল, তার গায়ে ফুঁ দিয়ে বললেন—যাঃ তুই সমুদ্র হলি।

আকাশ বেয়ে ঢল সমুদ্র নামল।

জীবন্ত মাটির তাল নিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে চতুর্মুখ বললেন—যাঃ, তুই মাটি হলি—জলের সঙ্গে গিয়ে গোলা খেল।

তাল মাটি টুপ করে জলে এসে পড়ল।

চতুর্মুখ জল ও ডাঙার খেলা দেখতে চার জোড়া চোখ মেলে আকাশে চেয়ে রইলেন। সময় যেতে লাগল।

জলের সঙ্গে খেলায় মাটি কাদা হয়ে এমন মিশে গেল, মাটির গোলায় জল এমন ঘোলা হয়ে উঠল যে দুজনকে আর চেনাই যায় না। চতুর্মুখের তখন একটু ভয় হল বিশ্বকর্মা এসে এই অনাসৃষ্টি দেখে কী বলেন।

বিশ্বকর্মা খানিক মেঘ আর বজ্র নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দুটোকে একটা সিন্দুকে বন্ধ করে চেয়ে দেখলেন সমস্ত কারখানাটার কাদা প্যাচ প্যাচ করছে, তার মধ্যে চতুর্মুখ হাবুডুবু খাচ্ছেন। বিশ্বকর্মা

বাচ্চা চতুর্মুখের কান ধরে টেনে তুলে কারখানার টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বললেন—হচ্ছিল কী ?

চতুর্মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন—ডাঙা আর জলে মিলিয়ে পৃথিবী গড়ছিলেম।

বিশ্বকর্মা হেসে বললেন—তারপর ?

চতুর্মুখ চোখ মুছে বললেন—এখন থই পাচ্ছিনে।

বিশ্বকর্মা কড়া সুরে বললেন—থই পেতেই হবে, জল থেকে মাটিকে পৃথক করো।

চতুর্মুখ চালুনি দিয়ে মাটি চালতে যান, মাটি পান না, শুধু কাদা। ঘণ্টা দু'চার খেটে চতুর্মুখ যখন হাঁপিয়ে পড়েছেন, তখন বিশ্বকর্মা এক আঁজলা কাদা নিয়ে জল মাটি দুজনের উপর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে বললেন—মাটি, শক্ত হয়ে বোস জলের সঙ্গে আড়ি দিয়ে। জল, তুই স্বচ্ছ হ' মাটির সঙ্গে আড়ি দিয়ে।

ডাঙা আর জল দুই ঠাঁই হল। জল ফুলে গর্জাতে থাকল, মাটি চটে লাল হয়ে চেয়ে রইল জলের দিকে। খুব শক্ত আড়ি, কিন্তু জলের প্রাণ কেঁদে বললে—মাটি ভাই! মাটির প্রাণ কেঁদে বললে—জল কই!

বিশ্বকর্মা চতুর্মুখকে ঘাড় ধরে স্টুডিয়োর বার করে দিয়ে বললেন—যাও চট্ করে সূর্যকে ডাকো।

সূর্য আসতে বিশ্বকর্মা তাঁকে বললেন—মাটি জল ঝগড়া করছে, এদের মেলাও।

সূর্য এক কৌটা জলের চোখের জল নিয়ে তাওয়ায় চড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকর্মাকে নমস্কার করে চলে গেলেন।

চতুর্মুখ বুঝতেই পারলেন না সূর্য কী করতে এলেন, কী করে গেলেন।

---

pathagar.net

গ্রন্থ পরিচয়

pathagar.net

পথেবিপথে

আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ষট্‌ত্রিংশ গ্রন্থ হিসেবে 'পথেবিপথে'র প্রথম প্রকাশ ১৩২৫ সালের চৈত্র মাসে। প্রকাশক ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৩৫৩ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয় এ বইটির বিশ্বভারতী সংস্করণ। 'অবরোহণ' নামের ছোটো অংশটি বিশ্বভারতী সংস্করণের সময় থেকে স্বতন্ত্র রচনাকারে মুদ্রিত হচ্ছে, এ ছাড়া এ দুই সংস্করণে অন্য কোনো প্রভেদ নেই। বানান এবং মুদ্রণ পদ্ধতিতে অবশ্য কিছু ভিন্নতা আছে।

গ্রন্থভুক্ত হবার আগে বইটির অন্তর্গত রচনাগুলি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

মোহিনী	ভারতী ১৩২৩ চৈত্র
অস্থি	ভারতী ১৩২৪ শ্রাবণ
গুরুজি	ভারতী ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ
টুপি	ভারতী ১৩২৪ ভাদ্র
দোশালা	ভারতী ১৩২৪ আশ্বিন
মাতু	ভারতী ১৩২৪ বৈশাখ
শেমুষি	ভারতী ১৩২৪ আষাঢ়
ইন্দু	ভারতী ১৩২৪ কার্তিক
অরোরা	ভারতী ১৩২৪ অগ্রহায়ণ
পর-ঈ-তাউস	ভারতী ১৩২৪ পৌষ
ছাইভস্ম	ভারতী ১৩২৪ মাঘ
লুকিবিহ্নে	ভারতী ১৩২৪ ফাল্গুন
গমনাগমন	সবুজপত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ
নিষ্ক্রমণ	ভারতী ১৩২২ চৈত্র
আরোহণ	ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ
বিচরণ	ভারতী ১৩২৩ আষাঢ়
অবরোহণ	ভারতী ১৩২৩ আষাঢ়

লক্ষণীয় যে গ্রন্থে রচনাগুলির বিন্যাস সর্বত্র প্রকাশকাল অনুযায়ী নয়। নদীনীরে,

pathagar.net

সিন্ধুতীরে এবং গিরিশিখরে, এই তিন শিরোনামে রচনাগুলির পর্যায়ভাগ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই পরিকল্পিত।

শ্রীমতী রানী চন্দের কাছে বর্ণিত তাঁর স্মৃতিকথায় অবনীন্দ্রনাথ 'পথেবিপথে'র পটভূমি বিষয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত হল:

> গঙ্গার উপরে সে বয়সে কত হৈ-চৈই না করতুম। সঙ্গীসাথীও জুটে গেল। গাইয়ে-বাজিয়েও ছিল তাতে। ভাবলুম, এ তো মন্দ নয়। গানবাজনা করতে করতে আমাদের গঙ্গা ভ্রমণ জমবে ভালো। যেই-না ভাবা, পরদিন বাঁয়া-তবলা হারমোনিয়ম নিয়ে তৈরি হয়ে উঠলুম স্টিমারে। বেশির ভাগ স্টিমারে যারা বেড়াতে যেত তারা ছিল রুগির দল। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন গঙ্গার হাওয়া খেতে হবে, কোনোরকমে বসে থাকেন—স্টিমার ঘণ্টা কয়েক চলে ফিরে ঘুরে এসে লাগে ঘাটে, গঙ্গার হাওয়া খেয়ে তারাও ফিরে যায় যে যার বাড়িতে। আর থাকত আপিসের কেরানিবাবুরা, কলকাতার আশপাশ থেকে এসে আপিস করে ফিরে যায় রোজ। সেই একঘেয়েমির মধ্যে আমরা দুচারজন জুড়ে দিলুম গানবাজনা। কী উৎসাহ আমাদের, দুদিনেই জমে উঠল খুব। রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠ বোস মশায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তিনিও আসেন স্টিমারে বেড়াতে। সম্প্রতি অসুখ থেকে উঠেছেন, খুব ভালো বাঁয়া তবলা বাজাতে পারতেন এক কালে, তিনিও জুটে পড়লেন আমাদের দলে বাঁয়া তবলা নিয়ে। কানে একদম শুনতে পেতেন না, কিন্তু কি চমৎকার তবলা বাজাতেন। বললুম, 'কী করে পারেন?' তিনি বললেন, 'গাইয়ের মুখ দেখেই বুঝে নিই।' গানও হত, নিধুবাবুর ঠপ্পা, গোপাল উড়ের যাত্রা, এইসব। গানবাজনায় হৈ হৈ করতে করতে চলেছি—এ দিকে গঙ্গা দেখছি। এ খেয়ায় ও খেয়ায় স্টিমার থেমে লোক তুলে নিচ্ছে, ফেরি বোটও চলেছে যাত্রী নিয়ে। মাঝে মাঝে গঙ্গার চর—সে চরও আজকাল আর দেখিনে। ঘুষুড়ির চড়া বরাবর দেখেছি। বাবামশায়দের আমলেও তাঁরা যখন পলতার বাগানে যেতেন, ওই চরে থেমে স্নান করে রান্নাবান্নাও হত কখনো কখনো চরে, সেখানেই খাওয়া দাওয়া সেরে আবার বোট ছেড়ে দিতেন। বরাবরের এই ব্যবস্থা ছিল। এবারে ছেলেদের জিজ্ঞেস করলুমও 'ওরে! সেই চর কোথায় গেল? দেখছি নে যে। গঙ্গার কি সবই বদলে গেল। এ যে সেই গঙ্গা বলে আর চেনাই দায়।'

তা, সেই তখন একদিন দেখলুম। সে যে কী ভালো লেগেছিল। স্টিমার চলেছে খেয়া থেকে যাত্রী তুলে নিয়ে। সামনে চর, যেন 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর, তার মাঝে বসে আছে শিব্ সদাগর।' ও পাশের ঘাটে একটি ডিঙি নৌকা। ছোট্ট গ্রামের ছায়া পড়েছে ঘাটে। ডিঙিনৌকায় ছোট্ট একটি বউ লাল চেলি পরে বসে—শ্বশুরবাড়ি যাবে, কাঁদছে চোখে লাল আঁচলটি দিয়ে, পাশে বুড়ি দাই গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে, নদীর এপার বাপের বাড়ি, ওপার শ্বশুরবাড়ি—ছোট্ট বউ কেঁদেই সারা ওইটুকু রাস্তা পেরোতে। সে যে কী সুন্দর দৃশ্য, কী বলব তোমায়। মনের ভিতর আঁকা হয়ে রইল সেদিনের সেই ছবি, আজও আছে ঠিক তেমনটিই। এমনি কত ছবি দেখেছি তখন। গঙ্গার দুদিকে কত বাড়িঘর, মিল, ভাঙা ঘাট, কোথাও বা দ্বাদশ মন্দির, চৈতন্যের ঘাট, বটগাছটি গঙ্গার ধারে ঢুকে পরেছে, তারই নিচে এসে বসেছিলেন চৈতন্যদেব—গদাধরের ঘাট, এইসব পেরিয়ে স্টিমার চলতে এগিয়ে। গান হৈ-হল্লার ফাঁকে ফাঁকে দেখাও চলত সামনে। এই দেখার জন্য ছেলেবেলার এক বন্ধুকে কেমন একদিন তাড়া লাগিয়েছিলুম। বলাই, ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়েছি—অসুখে ভোগের পর একদিন দেখি সেও এসেছে স্টিমারে, দেখে খুব খুশি। খানিক কথাবার্তার পর সে পকেট থেকে একটি বই বের করে পাতা খুলে চোখের সামনে ধরলে, দেখি একখানি গীতা। এক মনে পরেই চলল, চোখ আর তোলে না পুঁথির পাতা থেকে। বললে, মা বলে দিয়েছেন গীতা পড়তে, আমায় বিরক্ত কোরো না।' বললুম, 'বলাই, ও বলাই, বইটা রাখ্-না ; কী হবে ও-বই পড়ে, চেয়ে দেখ দেখিনি কেমন দুপাতা খোলা রয়েছে সামনে, আকাশ আর জল, এতেই তোর গীতার সবকিছু পাবি। দেখ-না, একবার চেয়ে দেখ ভাই।' বলাই মুখ তোলে না। মহা মুশকিল !

ধম্মকম্ম আমার সয় না। কোনোকালে করিও নি। ওসব দিকই মাড়াই নে। প্রথম-প্রথম যখন আসি স্টিমারে, একদিন পিছনে সেকেণ্ড ক্লাসে বসে কেরানিবাবুরা এ ওর গায়ে ঠেলা মেরে চোখ ইশারা করে বলছে, 'কে রে, এ কে এল ?' একজন বললে, 'অবন ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির ছেলে।' আর একজন বললে, 'ও, তাই, বয়েসকালে অনেক অত্যাচার করেছে, এখন এসেছে পরকালের কথা ভেবে গঙ্গায় পুণ্যি করতে।' শুনে হেসেছিলুম আপন মনেই। কিন্তু কথাটা মনে ছিল।

অবিনাশ ছিল আমাদের মধ্যে ষণ্ডাগুণ্ডা ধরনের। আমার সঙ্গে আসত

pathagar.net

গানবাজনার আড্ডা জমাতে। তাকে ঠেলা দিয়ে বললুম, 'দেখো-না অবিনাশ, ওদিকে যে গীতার পাতা থেকে চোখই তুলছে না বলাই আর কোনো দিকে।' শুনে অবিনাশ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, বলাই বই পড়ছে ঘাড় গুঁজে তার ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বইটি ছোঁ মেরে নিয়ে একেবারে তার পকেটজাত করলে। বলাই চেঁচিয়ে উঠল, 'কর কী, কর কী, মা বলে দিয়েছেন সকাল বিকেল গীতা পড়তে। আর গীতা! অবিনাশ বললে, 'বেশি বাড়াবাড়ি করো তো গীতা জলে ফেলে দেব।' বলাই আর কী করে, সেও শেষে আমাদের গানবাজনায় যোগ দিলে। কেরানিবাবুরা দেখি উৎসুখ হয়ে থাকেন আমাদের গানবাজনার জন্য। যে কেরানিবাবু আমাকে ঠেস দিয়ে সেদিন ওই কথা বলেছিলেন তিনি একদিন স্টিমারে উঠতে গিয়ে পা ফসকে গেলেন জলে পড়ে, আমরা তাড়াতাড়ি সারেঙকে বলে তাকে টেনে তুলি জল থেকে। পরে আমার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হয়ে যায়। তখন যে-কেউ আসত, আমাদের ওই দলে যোগ না দিয়ে পারত না। একবার এক—যাকে বলে ঘোরতর বুড়ো—নাম বলব না—শরীর সারাতে স্টিমারে এসে হাজির হলেন। দেখে তো আমার মুখ শুকিয়ে গেল। অবিনাশকে বললুম, 'ওহে অবিনাশ, এবারে বুঝি আমাদের গান বন্ধ করে দিতে হয়; টপ্পা খেয়াল তো চলবে না আর ধর্মসংগীত ছাড়া।' সবাই ভাবছি বসে, তাই তো। আমাদের হারমোনিয়াম দেখে তিনি বললেন, 'তোমাদের গানবাজনা হয় বুঝি? তা চলুক-না চলুক।' মাথা চুলকে বললুম, 'সে অন্য ধরনের গান।' তিনি বললেন, 'বেশ তো, তাই চলুক, চলুক-না।' ভয়ে ভয়ে গান আরম্ভ হল। দেখি তিনি বেশ খুশি মেজাজেই গান শুনছেন।···তাঁর উৎসাহ দেখে আমাদের আর পায় কে—দেখতে দেখতে টপাটপ টপাটপ টপ্পা জমে উঠল!

শুধু গানেই নয়, নানারকম হৈ চৈও করতুম, সমস্ত স্টিমারটি সারেঙ থেকে মাঝিরা অবধি তাতে যোগ দিত। জেলে নৌকো ডেকে ডেকে মাছ কেনা হত—ইলিশ মাছ, তপ্‌সে মাছ। একদিন ভাই রাখালি অনেকগুলি তপ্‌সে মাছ কিনে বাড়ি নিয়ে গেল। পরদিন জিজ্ঞেস করলুম, 'কী ভাই কেমন খেলি তপ্‌সে মাছ?' সে বললে, 'আর বোলো না দাদা, আমায় আচ্ছা ঠকিয়ে দিয়েছে। তপ্‌সে নয়, সব ভোলা মাছ দিয়ে দিয়েছিল। ভোলামাছ দিয়ে ভুলিয়ে ঠকিয়ে দিলে।' আমরা সব হেসে বাঁচিনে। সেই রাখালি বলত, 'অবনদাদা, তুমি যা করলে! দিল্লিতে মেডেল পেলে, খেতাব পেলে,

ছবি এঁকে হিস্ট্রিতে তোমার নাম উঠে গেল।' এতেই ভায়া আমার খুশি। আমাদের স্টিমারযাত্রীদের সেই দলটির নাম দিয়েছিলুম 'গঙ্গাযাত্রী ক্লাব।' এই গঙ্গাযাত্রী ক্লাবের জন্য স্টিমার কোম্পানির আয় পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। দস্তুরমতো একটি বিরাট আড্ডা হয়ে উঠেছিল। একবার ডার্বির লটারির টিকিট কেনা হল ক্লাবের নামে। সকলে এক টাকা করে চাঁদা দিলুম। টাকা পেলে সবাই সমান ভাগে ভাগ করে নেব। বৈকুণ্ঠবাবু প্রবীণ ব্যক্তি, তাঁকেই দেওয়া হল টাকাটা তুলে। তিনি ঠিকমতো টিকিট কিনে যা যা করবার সব ব্যবস্থা করলেন। ওদিকে রোজই একবার করে সবাই জিজ্ঞেস করি, 'বৈকুণ্ঠবাবু, টিকিট কিনেছেন তো ঠিক?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, ভেবো না। টাকাটা পেলে ঠিকমতোই ভাগাভাগি হবে।' তা তো হবে, কিন্তু মুখে মুখে কথা সব, লেখাপড়া তো হয় নি কিছুই। অবিনাশকে বললুম, 'অবিনাশ, এই তো ব্যাপার, কী হবে বলো তো?' অবিনাশ ছিল ঠোঁটকাটা লোক, পরদিন বৈকুণ্ঠবাবু স্টিমারে আসতেই চেপে ধরলে, 'বৈকুণ্ঠবাবু, আপনাকে উইল করতে হবে।' বৈকুণ্ঠবাবু দারুণ ঘাবড়ে গেলেন,—বুঝতে পারছেন না কিসের উইল। অবিনাশ বললে, 'টাকাটা পেলে শেষে যদি আপনি আমাদের না দেন বা মরেটরে যান, টিকিট তো আপনার কাছে, তখন কী হবে? আজই আপনাকে উইল করতে হবে।' বৈকুণ্ঠবাবু হেসে বললেন, 'এই কথা? তা বেশ তো কাগজকলম আনো।' তখনই কাগজকলম জোগাড় করে বসল সবাই গোল হয়ে। কী ভাবে লেখা যায়, উকিল চাই যে। উকিল ছিলেন একজন সেখানে—তিনিও গঙ্গাযাত্রী ক্লাবের মেম্বার, ডিসপেপসিয়ায় ভুগে ভুগে কঙ্কালসার দেহ হয়েছে তাঁর। তাঁকেই চেপে ধরা গেল, তিনি মুসাবিদা করলেন—উইল তৈরি হল, 'গঙ্গাযাত্রী ক্লাবের টিকিটে যে টাকা পাওয়া যাবে তা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমান ভাগে পাবে ও আমার অবর্তমানে আমার ভাগ আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী অমুক পাবেন' বলে নিচে বৈকুণ্ঠবাবু নাম সই করলেন। উইল তৈরি। কিছুদিন বাদে ডার্বির খেলা শুরু হল। রোজই কাগজ দেখি আর বলি, 'ও বৈকুণ্ঠবাবু। ঘোড়া উঠল?' জানি যে কিছুই হবে না, তবু রোজই সকলের ওই এক প্রশ্ন। একদিন এইরকম 'ও বৈকুণ্ঠবাবু, ঘোড়া উঠল' প্রশ্ন করতেই বৈকুণ্ঠবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঘোড়া উঠেছে, ঘোড়া উঠেছে, ওই দেখুন, সামনে।' চেয়ে দেখি বরানগরের পরামানিক ঘাটের কাছ বরাবর একজোড়া কালো ঘোড়া জল থেকে উঠছে। স্নান করাতে জলে নামিয়েছিল তাদের। অমনি রব উঠে গেল, আমাদের

pathagar.net

ঘোড়া উঠেছে, ঘোড়া উঠেছে। গঙ্গাযাত্রীদের কপালে ঘোড়া ওইজল থেকেই উঠে রইল শেষ পর্যন্ত।

কী দুরন্তপণা করেছি তখন মা গঙ্গার বুকে। কত রকমের লোক দেখেছি, কত রকমের ক্যারেক্‌টার সব। একদিন এক সাহেব এসে ঢুকল স্টিমারে। গঙ্গাপারের কোন্ মিলের সাহেব, লম্বা-চওড়া জোয়ান ছোকরা, হাতে টেনিস ব্যাট, দেখেই মনে হয় সন্থ এসেছে বিলেত থেকে। সাহেব দেখেই তো আমরা যে যার পা ছড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বসলুম সবাই, মুখে চুরুট ধরিয়ে। সাহেব ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতেই সেই ডিসপেপটিক উকিল তাড়াতাড়ি তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সাহেব বসে পড়ল সেখানে। আড়ে আড়ে দেখলুম, এমন রাগ হল সেই উকিলের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের চাপরাশিও এসে জায়গার জন্য ঠেলাঠেলি করতে লাগল ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট হাতে নিয়ে—টিকিট আছে তো এখানে সে বসবে না কেন? অবিনাশ তো উঠল রুখে, 'ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট আছে তো নিচে যা, সেখানে কেবিনে বোস গিয়ে—এখানে আমাদের সমান হয়ে বসবি কি?' ব'লে জামার হাতা গুটোতে লাগল। দেখি একটা গোলযোগ বাধবার জোগাড়। গোলযোগ শুনে সাহেবও উঠে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারছে না কিছু। সাহেবকে বললুম, 'চাপরাশি এখানে ঢুকিয়েছ কেন, তাকে পিছনে যেতে বলো।' বিলিতি সাহেব, এ দেশের হালচাল জানে না, ব্যাপারটা বুঝে চাপরাশিকে পিছনে পাঠিয়ে দিলে। সাহেবটি লোক ছিল ভালো। খানিক বাদে সে নেমে গেল চাপরাশিকে নিয়ে। উকিলকে বললুম, 'সাহেব তোমাকে কী জিজ্ঞেস করছিল হে?' সে বললে 'সাহেব জানতে চাইল তুমি কে।' বললুম, 'নাম দিয়ে দিলে বুঝি?' সে বললে, 'হ্যাঁ।' বললুম, 'বেশ করেছ, এত লোক থাকতে তুমি আমারই নাম দিতে গেলে কেন? এবার আমার নামে কেস করলেই মারা পড়েছি।'

'পথেবিপথে'র জাহাজী গল্পগুলি আমি তখনই লিখি। স্টিমারের সেইসব ক্যারেকটারই গেঁথে দিয়েছি তাতে।

[জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ ২৯৭-৯৮]

'গমনাগমন' অংশটিরও রচনাসূত্র মেলে এই স্মৃতিকথারই অন্যত্র (পৃ ৩১৯-২০):

একদিন রওনা হলুম কোনারকে, চারখানা পালকিতে লাঠি লণ্ঠন

pathagar.net

লোকজন স্ত্রীপুত্রকন্যা সব সঙ্গে নিয়ে। 'পথেবিপথে' বইয়ে আছে এই বর্ণনা। কুড়ি মাইল পথ বালির উপর দিয়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি, সারারাত। পান, তামাক, খাবার জলের কুঁজো পালকির ভিতরে তাকে ঠিক ধরা ; মিষ্টান্নের ভাঁড়ও একটি ; পাশে লাঠিখানা। পালকি চলেছে 'হুম্পা হুয়া'। পুরী ছাড়িয়ে সারারাত চলেছি—ভয়ও হচ্ছে, কী জানি যদি বালির মাঝে পালকি ছেড়ে পালায় বেয়ারারা। আমার আগে আগে চলেছে তিনখানা পালকি। মাঝে মাঝে হাঁক দিচ্ছি, 'ঠিক আছিস সবাই ?' সুনসান বালি, কোথায় যে আছি—বাতাসে না পৃথিবীতে কিছু বোঝবার উপায় নেই। থেকে থেকে ধপাস ধপাস শব্দ, বেহারাদের আটদশটা পা পড়ছে বালিতে। এক জায়গায় শুনি ঝপ্, ঝপ্, ঝপ্, ঝপ্, শব্দ।

'কী হল রে ?'

'বাবু নিয়াখিয়া নদী আসি গেলাম।'

মাসি

১৩৬১ সালের আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'মাসি'। প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। গ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলি বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হয় নিম্নোক্ত ক্রমে :

মাসি	১৩৪৯ শ্রাবণ-ভাদ্র
বনলতা	১৩৪৯ চৈত্র
হাতেখড়ি	১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ

পত্রিকায় প্রকাশকালে 'মাসি' অংশটির নাম ছিল 'মাসিমা'।

গ্রন্থটির চিত্রালংকরণ করেন শ্রীপরিতোষ সেন।

'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' বইটিতে (পৃ ১৮৫) শ্রীমতী রানী চন্দ লিখেছেন :

'জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। 'বেলঘরিয়ার গুপ্তনিবাস বাড়ি নেওয়া হল। বাগান, পুকুর—সব নিয়ে মস্ত সেই বাড়ি। দোতলায় প্রায় তেমনি চওড়া দক্ষিণের বারান্দা।

অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'সারাদিন বারান্দায় রোদের তাতে বসে রেলগাড়ি যাচ্ছে আসছে দেখি। আমার বাড়িমুখো গাড়ি আর আসবে না আমাকে নিয়ে যেতে।

'এই বাড়ির পুকুরধারটি ঠিক আমাদের জোড়াসাঁকোর বাল্যকালের পুকুরধারের

pathagar.net

মতো দেখায়। এক-একবার ভুল হয়ে যায় যেন ছেলেবেলার দিনগুলো এসেছে। এই মজাটুকুই যথেষ্ট মনে করি।

'গল্পের দিন কি আর ফিরবে? বোধহয় তো আর সে বারান্দাও পাব না, সে হাওয়াও পাবে না মনের খেয়া নৌকোটা!'

গুপ্তনিবাসে এসে 'মাসি' নামে একটি গল্প লিখলেন অবনীন্দ্রনাথ। মার বাড়ি থেকে মাসির বাড়ি এসেছেন. মার বাড়ি ছেড়ে আসার দুঃখ মাসির আদরে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে আসার বেদনা অনেকখানি ঢেলে দিয়েছেন এই লেখাতে। দিয়ে যেন খানিক হালকা হলেন। 'মাসি'কে আমাদের পড়তে দিয়ে তিনি কুটুমকাটাম গড়তে মন দিলেন। দিন কয়েক পর লিখলেন, 'মাসিমাকে তোমাদের কাছে পরিচিত করে দিয়ে আমি খালাস। মাসিকে তোমাদের ভালো লাগছে জেনে সুখী হলাম।'

সংযোজন

অবনীন্দ্রনাথের কোনো বইতে নেই, এমন কয়েকটি গল্প সাময়িকপত্রে ছড়ানো আছে। এই অংশে সেগুলি সংগৃহীত হল। রচনাগুলির প্রকাশকাল :

দেবীপ্রতিমা	ভারতী ১৩০৫ শ্রাবণ
গঙ্গাযমুনা	ভারতী ১৩১৬ পৌষ
কোটরা	ভারতী ১৩২৬ আশ্বিন
বারোয়ারি উপন্যাস	ভারতী ১৩২৭ কার্তিক
আলোআঁধারে	ভারতী ১৩২৮ কার্তিক
সূর্য কী করতে এলেন	সমকালীন ১৩৬১ শারদীয়

সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কথাগুচ্ছ' বইটিতে সংকলিত হয়েছিল 'দেবীপ্রতিমা'। 'সূর্য কী করতে এলেন' রচনাটির ভিন্ন রূপ 'জলে স্থলে' ছাপা হয়েছিল বুধবার (১৩২৯, ২৬ পৌষ) এবং প্রাচী (১৩৩০ ভাদ্র) পত্রিকায়।

আমাকে রবিকাকা বললেন, অবন, তোমাকেও কিছু লিখতে হবে। কিছুতেই ছাড়বে না। আমি খামখেয়ালিতে প্রথম পড়ি 'দেবীপ্রতিমা' বলে একটি গল্প। পুরানো 'ভারতী'তে যদি থেকে থাকে খোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে। রবিকাকা আমাকে প্রায়ই বলতেন, অবন, তোমার সেই লেখাটি কিন্তু বেশ হয়েছিল।

[ঘরোয়া, অবনীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃঃ ১৪৫]

pathagar.net

'দেবীপ্রতিমা' গল্পটির দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, একটি অবনীন্দ্রনাথের এবং অন্যটি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায়। গল্পটিতে কি তবে রবীন্দ্রকৃত কোনো পরিমার্জনা আছে? সম্ভাব্য এই সংশয় বিষয়ে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন[১] :

> অবনীন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি দুটি বেশ খুঁটিয়ে আমি compare করেছিলুম—দুটির মধ্যে কোনো তফাৎ পাইনি। ভারতীর পাঠও অবিকল এই দুটি পাণ্ডুলিপির অনুরূপ। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে লেখাটি তবে কার?
>
> দাদামশায় কোথাও এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা অথবা এই লেখায় রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট হাত আছে এমন কথা স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ কখনো এই লেখা সম্বন্ধে তাঁর নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করেন নি যেমন তিনি পুত্রযজ্ঞ সৎপাত্র প্রভৃতি গল্প সম্বন্ধে করেছেন। আমার আরো মনে আছে দাদামশায় বলতেন 'ঐ রকম style-এ লেখা ঐ একটাই লিখেছিলুম। নাটোরের খুব পছন্দ হয়েছিল, আমাকে প্রায়ই বলত—অবনদা তোমার ঐ styleটা বড়ো চমৎকার—ঐরকম ভাবে আমাকেও লিখতে হবে।' এই-রকম সংস্কৃতবহুল ভাষায় নাটোরের মহারাজা বোধ হয় কিছু কিছু লিখেও-ছিলেন।

প্রসঙ্গত, দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের এই অপ্রকাশিত পত্রালাপটির (২ শ্রাবণ ১৩০৪) উল্লেখ করেছেন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় :

'লোকেশ্বরী' যে গল্প
আপনার দ্বারা গঠিত
গত রবিবারে যেটি সেই
খামখেয়ালিতে পঠিত
'সাহিত্যে' সেটি প্রকাশে
যদি কোন বাধা নাহি গো
প্রকাশ করিতে সেটিকে
আপনার কাছে চাহি গো
সুরেশচন্দ্র দিনরাত
ক্রমাগত পীড়াপীড়িয়া

pathagar.net

---

১. পুলিনবিহারী সেনকে লিখিত চিঠি, ১১ মে, ১৯৭৯।

সেটির জন্য আমাকে

খাইছেন যেন ছিঁড়িয়া

ক্রমাগত আর পারি না

এই খেঁচাখেঁচি সহিতে

হইল এ ছোট অনুরোধ

মুখ মুঠে তাই কহিতে।

*

চেয়েছেন মোর রচনা

সেজন্য আমি গর্বিত

কিন্তু কাগজে ছাপালে

হয়ে যায় সেটা চর্বিত

তাছাড়া এসব লেখাতে

খামখেয়ালেরই অধিকার

লেখক কেবল উপলক্ষ্য

কি বলিব আমি অধিক আর।

দিয়েছি যা খামখেয়ালে

ফিরে নেওয়া মোর কার্য না

অতএব আজ দয়া করে

করিবেন মোরে মার্জনা।

এই পত্রালাপ বিষয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

আপাতদৃষ্টিতে এটি রবীন্দ্রনাথকে লেখা বলে মনে হয়। কিন্তু, 'লোকেশ্বরী' 'খামখেয়ালী সভায় পঠিত' এ সব তো রবীন্দ্রনাথকে লেখা হতে পারে না—এ তো অবনীন্দ্রনাথের 'দেবীপ্রতিমা'র সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এই চিঠি থেকেই 'গত রবিবারে'র হিসেব করে দেখা যাচ্ছে 'দেবীপ্রতিমা' লেখাটি পড়ার তারিখ হচ্ছে—রবিবার ২৮ আষাঢ় ১৩০৪—সভায় নিমন্ত্রণ-কর্তা সমরেন্দ্রনাথ—পরিহার্য বিষয় দাঙ্গা ভূমিকম্প ও পুণা হত্যাকাণ্ড! ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। সুতরাং একরকম নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে দ্বিজুবাবুর এই চিঠিটি অবনীন্দ্রনাথকে লেখা এবং উত্তরটি অবনীন্দ্রনাথের বকলমে রবীন্দ্রনাথ লিখে দেন। তখনকার মতো 'সাহিত্যে'র হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এক বছর পরে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ভারতী শ্রাবণ ১৩০৫ সালে ছাপা হয়।

'বারোয়ারি উপন্যাস' বারোজন লেখকের সম্মিলিত রচনার একটি অংশ-বিশেষ। ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে ভারতী পত্রিকায় এই উপন্যাসের সূচনা করেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সেই সংখ্যার পাদটীকায় (পৃ, ৭২) ঘোষণা করা হয়:

এই উপন্যাস আগাগোড়া একজন না লিখিয়া প্রতি মাসে বিভিন্ন লেখক ইহাকে অগ্রসর করিতে থাকিবেন। প্রতিবার নূতন হাতের ইঙ্গিতে চালিত হইয়া ইহা কত বিচিত্র পথে ঘুরিবে এবং কোথায় কীভাবে সমাপ্ত হইবে, তাহা এখন কাহারো অনুমান করিবার যো নাই :—না লেখক,না পাঠক। লেখকদের মধ্যে আমরা কয়েকজন নামজাদা ঔপন্যাসিককে পাইয়াছি। তাঁহাদের নাম ক্রমশ প্রকাশ্য।

আগামী সংখ্যায় লিখিবেন—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পর পর বারোটি সংখ্যায় যথাক্রমে লেখেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রমথ চৌধুরী। উপন্যাসটির অষ্টাদশ থেকে বিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লেখেন অবনীন্দ্রনাথ, ১৩২৭ সালের কার্তিক মাসে। ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে, উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (১৯২১) ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

অবনীন্দ্রনাথের আগে-পরে অন্য লেখকরা এ কাহিনীর যে-অংশটুকু লিখে-ছিলেন, পাঠকদের সাহায্য হতে পারে ভেবে এখানে তার চুম্বক দেওয়া হল।

পরিচ্ছেদ ১-২। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

কালীগ্রামের হরনাথ মৈত্রের মেয়ে কমলা হঠাৎ দলছাড়া হয়ে পড়ল কলকাতায় গঙ্গাস্নানে এসে। অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না আর তাকে। বিমূঢ় মা-বাবা গ্রামে ফিরে গেলে এ নিয়ে শুরু হল কুৎসা। জমিদার যোগেন মিত্রের কর্মচারী শশী মুখুজ্যের রাগ ছিল মিত্রমশাইয়ের উপর ; এই সুযোগে সে রটিয়ে দিল যে জমিদারপুত্র হরেনের সঙ্গেই পালিয়ে গেছে কমলা। বছর কয়েক আগে একদিন যখন স্বামীর চিঠি পড়ছিল কমলা, হরেন সেই চিঠি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল বাগানে। এই দৃশ্যটিই ছিল শশীর দুষ্ট-কল্পনার ভিত্তি।

কমলার কলঙ্ককথা নিয়ে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে নানারকম তামাশা শুরু হল বলে তার ছোটো ভাই অরুণ একদিন দিদিকে খুঁজতে চলে গেল কলকাতায়, পড়াশোনা ছেড়ে।

pathagar.net

জমিদারগিন্নী উমাসুন্দরীর কানে পৌঁছলেও এই কুৎসা-প্রসঙ্গ যোগেন কিন্তু জানতে পারেন নি অনেকদিন। পড়া নিয়ে কলকাতায় মগ্ন আছে হরেন, এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। লোকের কথায় অতিষ্ঠ হরনাথ একদিন যখন যোগেন মিত্রকে অভিযোগ জানালেন তাঁর ছেলের বিষয়ে, খেপে উঠলেন সেই রাশভারি জমিদার।

পরিচ্ছেদ ৩-৫। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

উমাসুন্দরী তাঁর ক্রুদ্ধ স্বামীকে জানালেন, মাতাল আর দুশ্চরিত্র শশীর কথায় বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। হরেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে এই কথাটা যেন মনে রাখেন যোগেন।

কলকাতার পটলডাঙায় থেকে লেখাপড়া করছে আরেক জমিদারনন্দন, ক্ষিতীশ চৌধুরী। বন্ধু আর মোসাহেবদের কাছে আর্টিস্ট নামে তার পরিচয়। শ'-ইবসেন-পড়া ক্ষিতীশ প্রেম না করে বিয়ে করবে না কিছুতেই। প্রতিবেশীর মোটরগাড়ির বিশ্রী আওয়াজ শুনে নিজেই সে কিনে ফেলেছে একটি গাড়ি। আর এই গাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে পথে একদিন সে দেখল এক অচৈতন্য সুন্দরী কিশোরী, শুশ্রূষার জন্যে হাসপাতালে না দিয়ে তাকে সে নিয়ে এল বাড়িতে। নার্সে ডাক্তারে ভরে গেল তার বিজন বাড়ি। চেতনা ফিরে পেয়ে মেয়েটি জানাল, তার নাম কমলা।

মেয়েটির যে স্বামীও আছে, এ খবরটা বুকে এসে বিঁধল ক্ষিতীশের। এখন কথা হল, এ অবস্থায় মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিতে গেলে কোনো কলঙ্কের কথা উঠবে না তো? এই নিয়ে ক্ষিতীশ যখন দুর্ভাবিত, কমলা জানাল কলকাতায় আছে তার স্বজনতুল্য হরেনদা, তাকে একটা খবর দেওয়া ভালো।

পরিচ্ছেদ ৬-৮। নরেন্দ্র দেব।

কমলার স্বামীর নাম সতীশ। কলকাতায় সদাগরি অপিসের এক কেরানি। মা দুর্গামণির ইচ্ছেতেই বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হয় তাকে, তবে বিয়ের পর বেশ বিভোরভাবেই কেটে গেছে দুটো বছর। মা কিন্তু এখন পছন্দ করছেন না তাদের নিঃসন্তান দশা। এমন সময়ে মোটা মাইনের চাকরি পেয়ে সতীশ গেল লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে, অসুস্থ হয়ে পড়ল সেখানে গিয়ে কমলাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দুর্গামণিকে যেতে হল ছেলের কাছে। এর পরই গঙ্গাস্নানের সেই দুর্ঘটনা। লক্ষ্ণৌতে বসে একটি বেনামী চিঠিতে সতীশ

জানল, তার স্ত্রী কুলত্যাগিনী। মা অবশ্য বললেন, এ নিশ্চয় কোনো শত্রুর কারসাজি। কাজেই মৈত্রমশাইকে টেলিগ্রাম করে সতীশ জানতে চাইল খাঁটি খবর।

এদিকে কলকাতায় ক্ষিতীশের যত্নে, দাসদাসীদের সেবায় অভিভূত আর কৃতজ্ঞ কমলা যেন ক্ষিতীশের মনেরও একটা আঁচ পেতে থাকে তাদের নিভৃত আলাপনে। খোঁজ চলছে হরেনের। অনেক চেষ্টায় ধরাও গেল তাকে, দেখা গেল যে একই কলেজের ছাত্র ক্ষিতীশ আর হরেন। দুজনের পরামর্শ শুরু হল, কী এখন করা উচিত।

পরিচ্ছেদ ৯-১১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাড়িতে এনে হরেনকে বিস্তর আপ্যায়ন করার পর তাকে নিয়ে ক্ষিতীশ গেল গড়ের মাঠে, পরিস্থিতিটা ভালোমতো বিচার করবার জন্য। অনেক ভেবে ঠিক হল যে সতীশের চেয়ে হরনাথবাবুকে খবর দেওয়াই বরং ভালো। কেননা, অপরিচিত এক যুবার সঙ্গে এতদিন কাটানোটা বাবা হয়তো ক্ষমা করতেও পারেন, কিন্তু স্বামী নিশ্চয় ঈর্ষ্যাবশে ভুলই বুঝবেন। যতদিন হরনাথ না আসেন ততদিন ক্ষিতীশের কাছেই থাকবে কমলা, হরেনের এই পরামর্শে বেশ খুশি হল ক্ষিতীশ, আরো কয়েকটা দিন কমলার সান্নিধ্য মিলবে তাহলে।

কমলা জানল সব সিদ্ধান্ত। এবার সে আশ্বস্ত। ক্ষিতীশের সঙ্গে সম্পর্কটাকেও স্বাভাবিক করে নেবার জন্য তাকে দাদা বলে ডাকবার অধিকার চাইল সে।

খবর দেওয়া হয়েছে হরনাথকে। কিন্তু মাস কেটে যায়, উত্তর আসে না কোনো। ডেড লেটার্স অফিস থেকে ফিরে আসে চিঠি। অগত্যা ঠিক হল যে দুজনে মিলে তারা সতীশের কাছেই নিয়ে যাবে কমলাকে। স্টেশনে যাবার পথে ক্ষিতীশের ট্যাক্সির সঙ্গে ঈষৎ সংঘর্ষ হল অন্য এক গাড়ির। ওই গাড়ির আরোহাদের নাম-ঠিকানা জানলেও ক্ষিতীশ ধরতে পারল না যে এঁরাই সেই যোগেন মৈত্র আর হরনাথ মিত্র। কমলা-হরেনকে এঁরা ধরতে এসেছেন কলকাতায়। হরেনের মেসে গিয়ে হতাশ হয়ে জানলেন তাঁরা, আসামী উধাও।

পরিচ্ছেদ ১২-১৩। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ট্রেনে বসে কমলা ভাবছে তার অতীত-ভবিষ্যৎ। আরো কী অমঙ্গল হতে পারে পরে, এই ভেবে উদ্বেগ তার। ক্ষিতীশের কাছে গাড়ির

pathagar.net

সংঘর্ষের বিবরণ শুনে কমলা-হরেন দুজনেই বুঝতে পারে কী ঘটেছে। এতদিনে হরেন একটু ভয় পেল এই ভেবে যে তাদের আচরণের একটা বিশ্রী অর্থ হতে পারে। ক্ষিতীশ ভাবছে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা। তার ব্যথা টের পায় কমলা।

শহরে পৌঁছে একটা মুশকিল হল এই যে সেখানে সতীশ বাগচী নামে আছে দুজন লোক। খবর মিলল যে সতীশ নাকি চলে গেছে তার স্ত্রীর অসুস্থতার খবর পেয়ে, আর মাঠাকরুনও নেই। আবার এদের ফিরতে হল কলকাতায়। সেখানে ফিরে হরেন জানল যে তার জিনিসপত্র নিয়ে আর টাকা মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছেন তার বাবা, মেসে তার দুয়ার বন্ধ। পথে পথে ঘুরে বেড়ায় হরেন। বাবার উপর ভরসা না রেখে স্বাবলম্বী হবার ইচ্ছেয় সে চাকরি চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয় একটা।

পরিচ্ছেদ ১৪-১৭। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বন্ধুরা মিলে একদিন তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে চাকরি করবে না কেউ। সেই চাকরিরই উমেদার হতে হল বলে হরেন বড়ো বিষণ্ণ এখন। এমন সময়ে পথচলতি একদিন সে ধরা পড়ে গেল অরুণের হাতে। দিদিকে এ নষ্ট করেছে ভেবে অরুণ তাকে আক্রমণ করতেই এসেছিল। কিন্তু পরে তার ভুল বুঝতে পেরে হরেনের সঙ্গে এল সে ক্ষিতীশের বাড়িতে। পথেই হরেন জানল যে তাদের দুজনেরই বাবা-মা বিশ্বাস করেছেন কুৎসায়, কলঙ্কে। কেমন করে বাঁচবে এবার কমলা? কেমন করেই বা অপ্রমাণ করা যাবে এ কলঙ্ক? এমন কী সতীশও না কি বিশ্বাস করেছে, গুজব, তার না কি আবার বিয়ে।

কমলার সঙ্গে দেখা হল অরুণের। হল অনেক আবেগবিনিময়। পরিচয় হল ক্ষিতীশের সঙ্গে। হৈ হৈ হল বিস্তর। এরই মধ্যে ক্ষিতীশের মনে হল যেন বিজয়া আসন্ন, বিদায় দিতে হবে তার কমলাকে এবার!

হরেনের কথামতো অরুণকে পাঠানো হল দেশে, খবর দেবার জন্য। ওই সঙ্গে কমলা একটি চিঠি লিখল তার স্বামীকে, অনেকদিন পর।

পরিচ্ছেদ ১৮-২০। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্রষ্টব্য. পৃ ২২৯—২৪২

পরিচ্ছেদ ২১-২২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অরুণের মুখে নিরুদ্দেশ সতীশ আর অসুস্থ দুর্গামণির বৃত্তান্ত শুনে শ্বশুরের

pathagar.net

ভিটেয় যাবার জন্য উতলা হয়ে উঠল কমলা। ক্ষিতীশের কিন্তু একেবারেই মত হল না এই যাবার প্রস্তাবে। পাড়াগাঁয়ের সমাজে অপমানিত হবে কমলা, এই ছিল তার ভয়। কিন্তু কমলা আজ মরিয়া। সে আজ বলে যে এদের উপর নির্ভর না করে অনেক আগেই যদি চলে যেত সে, এত দুর্ভোগ ঘটত না তবে। এমন একটা অভিযোগ শুনে চমকে ওঠে হরেন আর ক্ষিতিশ।

যাওয়াই ঠিক হল। সঙ্গে যাবার ইচ্ছে ছিল হরেনের, কিন্তু তাতে রাজী নয় কমলা। ক্ষিতীশের মনে হল তার গোপন ব্যথা ধরা পড়ে গেছে বলেই এমন করে পালাতে চাইছে কমলা। বিদায়ের সময়ে তাই আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে সে, গোপনে অরুণের হাতে জোর করে তুলে দেয় কিছু টাকা, আর নিজে সে চলে যাবার আয়োজন করে পশ্চিমে কোথাও।

গ্রাম থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরলে কী করতে হবে, এসব বিষয়ে হরেনের পরামর্শ আর শুনতে চায় না কমলা, আজ আর সে 'তার নিজের এবং স্বামীর মধ্যে তৃতীয় মধ্যস্থ মানবে না', এতদিনকার ভুলের কথা ভেবে লজ্জাই হল তার।

কিন্তু গাঁয়ে পৌঁছে দেখল যে, অরুণের ধারণা ঠিক নয়। গুজবে অবিশ্বাস করেন নি দুর্গামণি। তাঁর ছোঁয়া লাগবে বলে তিনি ত্রস্ত। এ অপমান মাথায় নিয়ে ভাইবোন আবার বেরিয়ে পড়ল পথে। যাবার সময়ে বলে গেল কমলা 'এমন অপরাধ আজও করিনি যাতে এ বাড়িতে আমাকে দোরের উনুনে রেঁধে খেতে হয়।'

পরিচ্ছেদ ২৩-২৫। হেমেন্দ্রকুমার রায়।

ওদিকে, কয়েকদিন বৃন্দাবনে কাটিয়েই সতীশের বৈরাগ্যের শখ এল মিটে। এখন সে লক্ষ্ণৌতে ফিরে যাবে? না জগদীশপুরে? না কালীগ্রামে? শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল সে আগ্রায়। তাজমহলের আঙিনায় এক পূর্ণিমার রাত্রে বাঁশি বাজাচ্ছিল ক্ষিতীশ। সতীশের সঙ্গে সেখানে আলাপ হল তার, টেনে নিল কাছে।

কালীগ্রামে হরনাথকে নিয়ে মশকরা চলছে শশী চৌধুরী আর তার দলবলেরা। তাদের কাছে হরনাথ শুনলেন হঠাৎ তাঁর হারানো মেয়ে নাকি ফিরেছে ঘরে। ক্ষিপ্ত হরনাথ ঘরে এসে দেখেন যে আদরভরে ছেলে-মেয়েকে খাওয়াবার আয়োজন করছেন গৃহিণী। 'কুলটা' বলে তিনি ভৎর্সনা করলেন কমলাকে। তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল কমলা। আবার

pathagar.net

এরই মধ্যে হরেন এসে পৌঁচেছে এ-বাড়ির উঠোনে। ছেলেটির স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে গেলেন হরনাথ।

পরিচ্ছেদ ২৬-২৮। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্ষিতীশের কাছে সমস্ত কাহিনী জেনে সতীশ ব্যাকুল হল কমলাকে ফিরে পাবার জন্য। তার অসুস্থ মায়ের সেবা করতে গেছে কমলা, আর সে কিনা এখানে! এমনই তাড়াহুড়ো যে যাবার সময়ে হোটেলের টাকা দিতেও ভুলে যাচ্ছিল সে।

ওদিকে হরনাথবাবুর বাড়িতে হাজির হয়েছেন যোগেন মিত্র। সেখানে হরেনের গলা শুনে তিনি মারমুখী। কমলাও তাঁকে সংবৃত করতে পারছে না। ওঁদের সকলেরই যে মস্ত ভুল হচ্ছে সেটা সবিস্তারে বলতে চাইল কমলা। এতটা আর সহ্য করতে পারলেন না হরনাথ। মেয়ের থিয়েটারি ঢঙ দেখে গলাধাক্কা দিয়ে তাকে বার করে দিলেন বাড়ি থেকে। অন্য পথে হরেনও গেছে বেরিয়ে।

বাড়ির পিছনে জঙ্গলে বসে আকাশপাতাল ভাবছে কমলা। সামনে পুকুর। তবে কি সে আত্মহত্যাই করবে? শব কখন ভেসে উঠবে এই আশায় শশী চৌধুরী তখন দাঁড়িয়ে আছে পুকুরের অন্য ধারে।

সতীশ ফিরে আসছে। ট্রেনে তার আলাপ হল এক বিধবার সঙ্গে। ইনি যে সতীশের কোনো আত্মীয়া, কথা থেকে বোঝা গেল সেটা। সতীশের কলঙ্কিনী স্ত্রী বিষয়ে বিস্তর বিলাপ করছেন ইনি। নিজেকে যেন আয়নায় দেখতে পেল সতীশ এই মহিলার বিলাপ থেকে।

বাড়ি ফিরে সতীশ দেখল যে কুলত্যাগিনী বলে বৌকে আশ্রয় দেন নি তার মা। শুনেই আবার বেড়িয়ে পড়ল সে। হাঁটতে হাঁটতে টলতে টলতে চলছে অনেক দূর। হঠাৎ, ওই কি একটি মেয়ে? কে ওখানে? কমলা? ডাক শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়ল মেয়েটি।

পরিচ্ছেদ ২৯-৩৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মূর্ছা ভাঙবার পর সতীশ-কমলার মধুর মুহূর্তগুলি ফিরে এল আবার, আবিষ্ট আর বাসনাময়। কমলা জানল যে সতীশ তার কলঙ্কের কথা বিশ্বাস করে না। তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায় সতীশ। চাঁদের আলোয় হাঁটতে শুরু করল তারা। মনে হচ্ছে যেন সেই পুরোনো বিয়ের রাতের জ্যোৎস্না। গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান। গাড়িতে উঠে বসে দুজনে।

Pathagar.net

ওদিকে হরেন তার বাবার এত অবিচারে ক্রুদ্ধ এখন। এসবের মূল কে? মনে পড়ল তার শশী চৌধুরীকে। শিক্ষা দিতে হবে একে। শশীকে খুঁজতে গিয়ে দেখা হল তার অরুণের সঙ্গে, জানা হল যে আবারও হারিয়ে গেছে কমলা, হয়তো সে আত্মঘাতী এবার।

কমলাকে খুঁজতে খুঁজতে ওরা স্টেশনের ধারে পৌঁচেছে যখন, সেখানে তখন চলছে অন্য এক নাটক। একজন স্ত্রীলোক বেঁধে রেখেছে শশীকে, ডাকা হয়েছে পুলিশ। এর বোনকে নাকি খুন করেছে শশী, এরও মাথা দিয়েছে ফাটিয়ে। কৈবর্ত এই নারীদুটির সঙ্গে ব্যভিচারের জন্যই শশীকে অপছন্দ করত হরনাথ, আর তারই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শশী এত কুৎসা রটিয়েছে তার মেয়ের নামে। এখন কমলার মৃত্যু হয়েছে অনুমান করে শশীর বড়ো আহ্লাদ। সেই উপলক্ষ্যেই এখানে এসে সে মেতে উঠেছে মদে। এ নিয়ে আস্ফালন করতেই ওই স্ত্রীলোকেরা আপশোস করে যে অকারণে 'বেহ্মহত্যে' হল। এই নিয়ে বচসারই পরিণামে খুন। কেননা, শশী একটি চিঠি ফেরত চেয়েছিল এদের কাছে যে-চিঠিতে বিবরণ ছিল তার সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রের।

যোগেন মিত্র ফিরছিলেন স্টেশন থেকে, পথে পেয়ে গেলেন হরনাথকেও। লোকমুখে এঁরা দুজন শুনলেন শশী চৌধুরীর কীর্তিকথা। এতদিনে তাঁরা জানলেন গোটা ষড়যন্ত্রের আদলটা, বুঝতে পারলেন তাঁদের ভুল।

পরিচ্ছেদ ৩৪-৩৭। প্রমথ চৌধুরী

ক্ষিতীশের কাছে যা শুনেছিল সতীশ, কমলার কাছেও শুনল সেই একই কাহিনী। মন ভরে গেল তার। কিন্তু বাড়িতে ফিরে দুর্গাসুন্দরীর [দুর্গামণি এখানে হঠাৎ দুর্গাসুন্দরী হয়ে উঠলেন] কাছে আশ্রয় পায়নি তারা। কেননা, দুর্গা না কি ধর্মত্যাগ করবার পরিবর্তে বরং পুত্রত্যাগ করবেন। শুনে, দেশ ছেড়ে সমাজ ছেড়ে আবার দুজন বেড়িয়ে পড়ল পথে।

কমলা ভাবল তার বাবা-মাকে একটা খবর দিতে হবে যে সে বেঁচেই আছে, আছে স্বামীর আশ্রয়ে। হরেনকে দিয়ে খবর পাঠানোর ইচ্ছেয় তারা এল কলকাতায়। কিন্তু হরেন তো সেই তার পুরোনো ডেরায়। গেল তারা ক্ষিতীশের বাড়িতে ক্ষিতীশের সঙ্গে আরেকবার দেখা হবে ভেবে খুশি হয়ে উঠল কমলার মন।

এদিকে, ও-বাড়িতেই কমলার খোঁজে এসেছিল অরুণ, এসেছেন

pathagar.net

যোগেনবাবু আর হরনাথবাবু। অরুণের কাছে কমলা এবার জানল যে শশী চৌধুরীর জাল ছিঁড়েছে। সত্য এখন প্রকাশিত, অনুতপ্ত সবাই।

এতদিনে এবার মিলন হল সবার। কথা উঠল, এত সব দুর্ঘটের জন্য কে দায়ী। যোগেনবাবু বলেন, ওল্ড ফুলেরা। ক্ষিতীশ বলে, ইয়ং ফুলেরা। হরেন বলে, আমাদের হতভাগা সমাজ। আর সতীশ বলে, 'দোষ সমাজেরও নয়। দোষ আমাদের স্বভাবের। আমরা যৌবনকে ভয় করি আর স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিনে।'

কমলাকে নিয়ে সতীশ ফিরে গেল লক্ষ্ণৌ, আর শূন্যঘরে ক্ষিতীশ পড়ে রইল একা। মনের এই অবসাদ দূর করবার জন্য সে তখন ভিড়ে গেল গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে, কেননা কোনো কাজের মধ্যে ডুবে না গেলে অশান্তি থেকে তার কোনো মুক্তি নেই।

Book No 386
Date 4.6.2005

pathagar.net